সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

আসমাউল হুসনা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

সংকলনে

আবদুল ওয়াকীল আলভী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ৩২৪

১ম প্রকাশ

রবিউল আউয়াল	১৪২৫
জ্যৈষ্ঠ	১৪১১
মে	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ASMAUL HUSNA by Sayeed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 100.00 Only.

আমাদের কথা

রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি সেগুলো আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ হাদীস বুখারী, মুসলিম, তিরমিযীসহ বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে। হাদীসে এক কম এক'শ বা নিরানব্বই কথাটি 'অনেক' বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। কুরআনে উল্লেখিত এবং বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত নামসমূহ একত্র করলে তা এক শতের অনেক বেশী হয়। তাছাড়া সমার্থবোধক নামসমূহকে একটি করে ধরেও নিরানব্বইটি গণনা করা হয়ে থাকতে পারে।

সে যাই হোক, কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র নামসমূহ সুন্দরতম, সেসব নাম ধরে তাঁকে ডাকো।

তাই কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ্‌র নামসমূহ জেনে নেয়া এবং সেগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করে সেসব নামে আল্লাহ্‌কে ডাকা মু'মিনদের কর্তব্য।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) তাঁর অমূল্য তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে আল্লাহ্‌র সুন্দরতম নামসমূহের অর্থ, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন দারুণ হৃদয়গ্রাহী ভাষায়।

খ্যাতনামা আলেমে দীন আবদুল ওয়াকীল আল্‌ভি তাফহীমুল কুরআন থেকে আল্লাহর নামসমূহের অর্থ ও ব্যাখ্যা খুঁজে খুঁজে বের করে সংকলন করেছেন একটি অমূল্য গ্রন্থে। 'আসমাউল হুসনা' উর্দু ভাষায় সংকলিত তাঁর সেই গ্রন্থটিকে আমরা বাংলা ভাষীদের উপহার দিতে চেয়েছি।

এজন্য আমাদের বেশী কষ্ট করতে হয়নি। আমরা বাংলায় অনূদিত তাফহীমুল কুরআন থেকে আল্‌ভী সাহেবের বাছাই করা অংশগুলোকে খুঁজে খুঁজে একত্র করে দিয়েছি।

আমরা আশা করি এ গ্রন্থটি মহান আল্লাহ্‌র সঠিক পরিচয় জানার জন্যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা এ গ্রন্থ থেকে আমাদের সবাইকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিচার্চ একাডেমী, ঢাকা।

সূচীপত্র

❑ অসমাউল হুসনা ১৫

১. আল্লাহ্ ঃ اَللّٰهُ ২৫

২. আল ইলাহ্ ঃ اَلْإِلٰهُ ৩০

৩. আর রাহমানু ঃ اَلرَّحْمٰنُ ৩৯

৪. আর রাহীমু ঃ اَلرَّحِيْمُ ৪১

৫. আল মালিকু, আল মালীকু ঃ اَلْمَلِكُ ، اَلْمَلِيْكُ ৪৬

৬. আল কুদ্দূসু ঃ اَلْقُدُّوْسُ ৫৩

৭. আস সালামু ঃ اَلسَّلَامُ ৫৪

৮. আল মু'মিনু ঃ اَلْمُؤْمِنُ ৫৫

৯. আল মুহাইমিনু ঃ اَلْمُهَيْمِنُ ৫৬

১০. আল আযীযু ঃ اَلْعَزِيْزُ ৫৭

১১. আল জাব্বারু ঃ اَلْجَبَّارُ ৬২

১২. আল মুতাকাব্বিরু ঃ اَلْمُتَكَبِّرُ ৬৩

১৩. আল খালিকু ঃ اَلْخَالِقُ ৬৪

১৪. আল খাল্লাকু ঃ اَلْخَلَّاقُ ৭৩

১৫. আল বারিয়্যু ঃ اَلْبَارِئُ ৭৬

১৬. আল মুসাব্বিরু ঃ اَلْمُصَوِّرُ ৭৭

১৭. আল গাফ্‌ফারু ঃ اَلْغَفَّارُ ৭৮

১৮. গাফিরুয যানবি ঃ غَافِرُ الذَّنْبِ ৮১

১৯. আল কাহ্‌হারু ঃ اَلْقَهَّارُ ৮২

২০. আল কাহিরু ঃ اَلْقَاهِرُ ৮৫

২১. আল ওয়াহ্‌হাবু ঃ اَلْوَهَّابُ ৮৬

২২. আর রায্‌যাকু ঃ اَلرَّزَّاقُ ৮৮

২৩. আর রাযিকু ঃ اَلرَّازِقُ ৯০

২৪. আল ফাত্‌তাহু, আল ফাতিহু ঃ اَلْفَتَّاحُ، اَلْفَاتِحُ ৯২

২৫. আল আলীমু, আল আল্লামু ঃ اَلْعَلِيْمُ ، اَلْعَلَّامُ ৯৩

২৬. আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি ঃ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ১০০

২৭. আল কাবিদু ঃ اَلْقَابِضُ ১০৯

২৮. আল বাসিতু ঃ اَلْبَاسِطُ ১১১
২৯. আল খাফিদু ঃ اَلْخَافِضُ ১১৪
৩০. আর রাফীউ ঃ اَلرَّافِيْعُ ১১৪
৩১. আল মু'য়িয্যু ঃ اَلْمُعِزُّ ১২০
৩২. আল মুযিল্লু ঃ اَلْمُذِلُّ ১২২
৩৩. আস সামীউ, আস সামি'উ ঃ اَلسَّمِيْعُ اَلسَّامِعُ ১২৩
৩৪. আল বাসীরু ঃ اَلْبَصِيْرُ ১২৬
৩৫. আল হাকামু, আল হাকিমু اَلْحَاكِمُ ، اَلْحَكَمُ ১২৯
৩৬. আল আদলু ঃ اَلْعَدْلُ ১৩০
৩৭. আল লাতীফু ঃ اَللَّطِيْفُ ১৩২
৩৮. আল খাবীরু ঃ اَلْخَبِيْرُ ১৩৪
৩৯. আল হালীমু ঃ اَلْحَلِيْمُ ১৩৭
৪০. আল আযীমু ঃ اَلْعَظِيْمُ ১৪০
৪১. আল গাফুরু ঃ اَلْغَفُوْرُ ১৪১
৪২. আশ্ শাকূরু ঃ اَلشَّكُوْرُ ১৪৩
৪৩. আশ্ শাকিরু ঃ اَلشَّاكِرُ ১৪৫
৪৪. আল আলীয়্যু ঃ اَلْعَلِيُّ ১৪৭
৪৫. আল আ'লা ঃ اَلاَعْلٰي ১৪৮
৪৬. আল কাবীরু ঃ اَلْكَبِيْرُ ১৫০
৪৭. আল হাফীযু ঃ اَلْحَفِيْظُ ১৫২
৪৮. আল হাফিযুঃ اَلْحَافِظُ ১৫৪
৪৯. আল মুকীতু ঃ اَلْمُقِيْتُ ১৫৬
৫০. আল হাসীবু ঃ اَلْحَسِيْبُ ১৫৮
৫১. আল জালীলু ঃ اَلْجَلِيْلُ ১৬০
৫২. আল কারীমু ঃ اَلْكَرِيْمُ ১৬১
৫৩. আল আকরামু ঃ اَلاَكْرَمُ ১৬৪
৫৪. আর রাকীবু ঃ اَلرَّقِيْبُ ১৬৫
৫৫. আল মুজীবু ঃ اَلْمُجِيْبُ ১৬৭
৫৬. আল ওয়াসি'উ ঃ اَلْوَاسِعُ ১৭০
৫৭. আল হাকীমু ঃ اَلْحَكِيْمُ ১৭১
৫৮. আল ওয়াদূদু ঃ اَلْوَدُوْدُ ১৮১

৫৯. আল মাজীদু ঃ اَلْمَجِيْدُ ১৮২
৬০. আল বাঈছু ঃ اَلْبَاعِثُ ১৮৩
৬১. আশ্ শাহীদু ঃ اَلشَّهِيْدُ ১৯১
৬২. আল হাক্কু ঃ اَلْحَقُّ ১৯৬
৬৩. আল ওয়াকীলু ঃ اَلْوَكِيْلُ ২০০
৬৪. আল কাবিয়্যু ঃ اَلْقَوِىُّ ২০৩
৬৫. আল মাতীনু/যুল কুওয়্যাতিল মাতীন ঃ اَلْمَتِيْنُ/ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ২০৪
৬৬. আল ওয়ালিয়্যু ঃ اَلْوَلِىُّ ২০৫
৬৭. আল মাওলা ঃ اَلْمَوْلٰى ২০৯
৬৮. আল হামীদু ঃ اَلْحَمِيْدُ ২১১
৬৯. আল মুহসী ঃ اَلْمُحْصِىْ ২১৪
৭০. আল মুবদিয়্যু ঃ اَلْمُبْدِئُ ২১৬
৭১. আল মু'য়ীদু ঃ اَلْمُعِيْدُ ২১৯
৭২. আল মুহ্য়ী ঃ اَلْمُحْيِ ২২৫
৭৩. আল মুমীতু ঃ اَلْمُمِيْتُ ২২৮
৭৪. আল হাইয়্যু ঃ اَلْحَىُّ ২৩২
৭৫. আল কাইয়্যুমু ঃ اَلْقَيُّوْمُ ২৩৩
৭৬. আল ওয়াজিদু ঃ اَلْوَاجِدُ ২৩৪
৭৭. আল মাজিদু ঃ اَلْمَاجِدُ ২৩৫
৭৮. আল ওয়াহিদু ঃ اَلْوَاحِدُ ২৩৬
৭৯. আল আহাদু ঃ اَلأَحَدُ ২৪০
৮০. আস্ সামাদু ঃ اَلصَّمَدُ ২৪৩
৮১. আল কাদিরু ঃ اَلْقَادِرُ ২৪৭
৮২. আল কাদীরু ঃ اَلْقَدِيْرُ ২৫১
৮৩. আল মুকতাদিরু ঃ اَلْمُقْتَدِرُ ২৫৫
৮৪. আল মুকাদ্দিমু ঃ اَلْمُقَدِّمُ ২৫৭
৮৫. আল মুওয়াখ্খিরু ঃ اَلْمُؤَخِّرُ ২৫৮
৮৬. আল আউয়ালু ঃ اَلأَوَّلُ ২৬০
৮৭. আল আখিরু ঃ اَلاٰخِرُ ২৬১
৮৮. আয্ যাহিরু ঃ اَلظَّاهِرُ ২৬২
৮৯. আল বাতিনু ঃ اَلْبَاطِنُ ২৬৩

৯০. আল ওয়ালী ঃ اَلْوَالِى ২৬৪
৯১. আল মুতাআলী ঃ اَلْمُتَعَالُ ২৬৫
৯২. আল বাররু/আল বারু ঃ اَلْبَرُّ، اَلْبَارُ ২৬৬
৯৩. আত্ তাওয়াবু ঃ اَلتَّوَّابُ ২৭০
৯৪. আল মুনতাকিমু ঃ اَلْمُنْتَقِمُ ২৭৮
৯৫. আল আফুউয়্যু ঃ اَلْعَفُوُّ ২৮২
৯৬. আর রাউফু ঃ اَلرَّؤُفُ ২৮৫
৯৭. মালিকাল মুল্ক ঃ مَلِكَ الْمُلْكِ ২৮৭
৯৮. যুল জালালি ওয়াল ইকরাম ঃ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ২৯০
৯৯. আল মুকসিতু ঃ اَلْمُقْسِطُ ২৯১
১০০. আল জামি'উ ঃ اَلْجَامِعُ ২৯২
১০১. আল গানিয়্যু ঃ اَلْغَنِىُّ ২৯৬
১০২. আল মুগনী ঃ اَلْمُغْنِىْ ২৯৯
১০৩. আল মানি'উ ঃ اَلْمَانِعُ ৩০১
১০৪. আদ্ দাররু ঃ اَلضَّارُّ ৩০২
১০৫. আন্ নাফি'উ ঃ اَلنَّافِعُ ৩০৫
১০৬. আন নূরু, আল মুনীরু, নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ঃ
اَلنُّوْرُ - اَلْمُنِيْرُ - نُوْرُ السَّموتِ وَالْاَرْضِ ৩০৭
১০৭. আল হাদিয়্যু ঃ اَلْهَادِىُّ ৩১১
১০৮. আল বাদী'উ, বাদী'উস সামাওয়াতি
ওয়াল আর্দ ঃ اَلْبَدِيْعُ، بَدِيْعُ السَّموتِ وَالْاَرْضِ ৩২২
১০৯. আল বাকী ঃ اَلْبَاقِىْ ৩২৪
১১০. আল ওয়ারিসু ঃ اَلْوَارِثُ ৩২৬
১১১. আর রাশীদু, আর রাশিদু ঃ اَلرَّشِيْدُ، اَلرَّشِدُ ৩২৮
১১২. আস্ সাবূরু ঃ اَلصَّبُوْرُ ৩২৯
১১৩. আর্ রাব্বু ঃ اَلرَّبُّ ৩৩০
১১৪. আল কাফী ঃ اَلْكَافِىْ ৩৪১
১১৫. আল ফাতিরু ঃ اَلْفَاطِرُ ৩৪২
১১৬. আশ্ শাদীদু, শাদীদুল ইকাবি ঃ اَلشَّدِيْدُ، شَدِيْدُ الْعِقَابِ ৩৪৪
১১৭. আল কারীবু ঃ اَلْقَرِيْبُ ৩৪৫
১১৮. আল মুগীসু ঃ اَلْمُغِيْثُ ৩৪৬

১১৯. আল কায়িমু, আল কায়িমু
বিল কিস্‌তি ঃ اَلْقَائِمُ، اَلْقَائِمُ بِالْقِسْطِ ৩৪৯
১২০. আল মান্নানু ঃ اَلْمَنَّانُ ৩৫০
১২১. আল কাফীলু ঃ اَلْكَفِيْلُ ৩৫৩
১২২. আল মুহীতু ঃ اَلْمُحِيْطُ ৩৫৫
১২৩. আর রাফী'উ, রাফী'উদ দারাজাতি ঃ اَلرَّفِيْعُ، رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ ৩৫৭
১২৪. আন নাসীরু ঃ اَلنَّصِيْرُ ৩৫৮
১২৫. যুত্ তাওলি ঃ ذُو الطَّوْلِ ৩৬০
১২৬. আল মুবীনু ঃ اَلْمُبِيْنُ ৩৬১
১২৭. আস সারী'উ, সারী'উল হিসাবি ঃ اَلسَّرِيْعُ، سَرِيْعُ الْحِسَابِ ৩৬২
১২৮. আল মু'য়ীনু, আল মুসতা'আনু ঃ اَلْمُعِيْنُ، اَلْمُسْتَعَانُ ৩৬৫
১২৯. আল গালিবু ঃ اَلْغَالِبُ ৩৬৬
১৩০. আল হাফিয়্যু ঃ اَلْحَفِيُّ ৩৬৮
১৩১. আল কাবিলু, কাবিলুত তাওবি ঃ اَلْقَابِلُ، قَابِلُ التَّوْبِ ৩৬৯
* টীকা ৩৭০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আসমাউল হুসনা

❐ হাদীসে তাঁর পবিত্র সত্তার ৯৯টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে তিরমিযী ও ইবনে মাজা এসব নাম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। কেউ যদি কুরআন ও হাদীস থেকে এসব নাম গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়ে তাহলে সে অতিসহজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় যদি আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে হয় তাহলে সে জন্য কি ধরনের শব্দ উপযুক্ত হবে।[১]

○

❐ আল্লাহকে এমন নামে স্মরণ করতে হবে যা তাঁর উপযোগী। তাঁর মহান সত্তার সাথে এমন নাম সংযুক্ত না করা উচিত যা অর্থের দিক দিয়ে তাঁর অনুপযোগী এবং তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। অথবা যে নামে তাঁর জন্য কোনো ত্রুটি, অমর্যাদা বা শিরকের চিহ্ন পাওয়া যায়। অথবা যাতে তাঁর সত্তা, গুণাবলী বা কার্যাবলী সম্পর্কে কোনো ভুল বিশ্বাস পাওয়া যায়। এজন্য কুরআন মাজীদে আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য যেসব নাম ব্যবহার করেছেন অথবা অন্য ভাষায় এ নামগুলোর সঠিক অনুবাদ যে শব্দগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করাই হবে সবচেয়ে বেশি সংরক্ষিত পদ্ধতি। দুই ঃ সৃষ্টির জন্য যেসব নাম নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা অথবা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত নামগুলো সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যাবে না। আর যদি এমন কিছু গুণবাচক নাম থাকে যেগুলো শুধু আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত না হয়ে থাকে বরং বান্দার জন্যও সেগুলোর ব্যবহার বৈধ হয় যেমন রউফ (পরম স্নেহশীল), রহীম (পরম করুণাময়), করীম (মেহেরবান), সামী (সবকিছু শ্রবণকারী), বাসীর (সর্বদ্রষ্টা) ইত্যাদি, তাহলে এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য এ শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহার করা হয় বান্দার জন্য ঠিক সেভাবে ব্যবহার করা যাবে না। তিন ঃ পরম শ্রদ্ধা ভক্তি ও মর্যাদাসহকারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। এমন কোনো পদ্ধতিতে বা এমন কোনো অবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা যাবে না, যা তাঁর প্রতি মর্যাদাবোধের পরিপন্থী। যেমন হাসি-ঠাট্টা করতে করতে, মলমূত্র

ত্যাগকালে অথবা কোনো গোনাহ্ করার সময় তাঁর নাম উচ্চারণ করা। অথবা এমন লোকদের সামনে তাঁর নাম উচ্চারণ করা যারা তা শুনে বেআদবী করতে থাকবে। এমন মজলিসেও তাঁর নাম বলা যাবে না, যেখানে লোকেরা অশালীন কাজে লিপ্ত থাকে এবং তাঁর নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথে তারা বিদ্রূপ করতে থাকবে। আবার এমন অবস্থায়ও তাঁর পবিত্র নাম মুখে আনা যাবে না যখন আশংকা করা হবে যে, শ্রোতা তাঁর নাম শুনে বিরক্তি প্রকাশ করবে। ইমাম মালেক (র)-এর জীবনেতিহাসে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, কোনো প্রার্থী তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি যদি তাকে তা দিতে না পারতেন তাহলে সাধারণ লোকদের মতো "আল্লাহ্ তোমাকে দেবেন" একথা না বলে অন্য কোনোভাবে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, প্রার্থীকে কিছু না দিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করলে আসলে তার মনে বিরক্তি ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ অবস্থায় আল্লাহর নাম নেয়া আমি সংগত মনে করি না। কারণ সে বিরক্তি ও ক্ষোভের সাথে আল্লাহর নাম শুনবে।[২]

○

❑ মানুষের ভাষায় প্রচলিত যতগুলো শব্দ আল্লাহর জন্য বলা হয়ে থাকে সেগুলো তাদের আসল মৌলিক অর্থের দৃষ্টিতে বলা হয়ে থাকে, তাদের বস্তুগত অর্থের দৃষ্টিতে বলা হয় না। যেমন আমরা তাঁর জন্য দেখা শব্দটি ব্যবহার করি। এর অর্থ এ হয় না যে, তিনি মানুষ ও পশুর মতো চোখ নামক একটি অংগের মাধ্যমে দেখেন। আমরা তাঁর জন্য শোনা শব্দ ব্যবহার করি। এর মানে এ নয় যে, তিনি আমাদের মতো কানের সাহায্যে শোনেন। তাঁর জন্য আমরা পাকড়াও ও ধরা শব্দ ব্যবহার করি। এ অর্থ এ নয় যে, তিনি হাত নামক একটি অংগের সাহায্যে ধরেন। এসব শব্দ সবসময় তাঁর জন্য একটি প্রায়োগিক মর্যাদায় বলা হয়ে থাকে এবং একমাত্র একজন স্বল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এ ভুল ধারণা করতে পারে যে, আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায়, শোনা, দেখা ও ধরার যে সীমাবদ্ধ ও বিশেষ আকৃতি রয়েছে তার বাইরে এগুলোর অন্য কোনো আকৃতি ও ধরন হওয়া অসম্ভব।[৩]

○

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

قُلِ ادْعُوْا اللّٰهَ اَوِدْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّامًا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ

"হে নবী! এদের বলো, তোমরা আল্লাহ্ বলে ডাক কিংবা রহমান, যে নামেই ডাক তাঁরই জন্য সুন্দরতম নামসমূহ।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০

সূরা ত্বা-হায় বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ط لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ

"তিনি আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই।"–সূরা ত্বা-হা ঃ ৮

আল কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ

"তিনি আল্লাহ, তিনিই সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী এবং তা বাস্তবায়নকারী এবং সে অনুযায়ী আকৃতি দান করেন আর সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই।"–সূরা আল হাশর ঃ ২৪

এ আয়াতগুলোর তাফসীর প্রসংগে সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় আল্লাহ্র এমন ৯৯ (নিরানব্বই)টি নাম আছে যেগুলো আয়ত্ত করলে মানুষ জান্নাতে পৌঁছে যাবে। হাদীসগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ اَحْصَيْنَاهُ وَحَفِظْنَاهُ ـ

১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। 'রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, আল্লাহ্র নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশটি নাম আছে। যে ব্যক্তি সেগুলো আয়ত্ত করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমরা সেগুলো গুণে গুণে মুখস্ত করেছি।'–সহীহ বুখারী, তাওহীদ অধ্যায়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ اِسْمًا، مِائَةٌ اِلاَّ وَاحِدًا لاَيَحْفَظُهَا اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ـ

২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ 'আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, যে কেউ সেগুলো মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' আল্লাহ্ বেজোড় আর তিনি বেজোড়কেই পসন্দ করেন।'–সহীহ বুখারী

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعُوْنَ اِسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ یُحِبُّ الْوِتْرَ ـ

৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি সেগুলো মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ্ বেজোড়, তিনি বেজোড়কেই ভালবাসেন।'–সহীহ মুসলিম

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِیْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, 'আল্লাহ্র এক কম একশত তথা নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি সেগুলো গুণে গুণে আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"–সহীহ মুসলিম

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِیْنَ اِسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি সেগুলো গুণে গুণে আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'–তিরমিযী

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِیْنَ اِسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি সেগুলো গুণে গুণে আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। নামগুলো হলো ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوْسُ

اَلسَّلَامُ اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيْزُ اَلْجَبَّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ

اَلْخَالِقُ اَلْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرُ اَلْغَفَّارُ اَلْقَهَّارُ اَلْوَهَّابُ

اَلرَّزَّاقُ اَلْفَتَّاحُ اَلْعَلِيْمُ اَلْقَابِضُ اَلْبَاسِطُ اَلْخَافِضُ

اَلرَّافِعُ اَلْمُعِزُّ اَلْمُذِلُّ اَلسَّمِيْعُ اَلْبَصِيْرُ اَلْحَكَمُ

اَلْعَدْلُ اَللَّطِيْفُ اَلْخَبِيْرُ اَلْحَلِيْمُ اَلْعَظِيْمُ اَلْغَفُوْرُ

اَلشَّكُوْرُ اَلْعَلِىُّ اَلْكَبِيْرُ اَلْحَفِيْظُ اَلْمُقِيْتُ اَلْحَسِيْبُ

اَلْجَلِيْلُ اَلْكَرِيْمُ اَلرَّقِيْبُ اَلْمُجِيْبُ اَلْوَاسِعُ اَلْحَكِيْمُ

اَلْوَدُوْدُ اَلْمَجِيْدُ اَلْبَاعِثُ اَلشَّهِيْدُ اَلْحَقُّ اَلْوَكِيْلُ

اَلْقَوِىُّ اَلْمَتِيْنُ اَلْوَلِىُّ اَلْحَمِيْدُ اَلْمُحْصِىْ اَلْمُبْدِئُ

اَلْمُعِيْدُ اَلْمُحْىِ اَلْمُمِيْتُ اَلْحَىُّ اَلْقَيُّوْمُ اَلْوَاجِدُ

اَلْمَاجِدُ اَلْوَاحِدُ اَلصَّمَدُ اَلْقَادِرُ اَلْمُقْتَدِرُ اَلْمُقَدِّمُ

اَلْمُؤَخِّرُ اَلْاَوَّلُ اَلْاٰخِرُ اَلظَّاهِرُ اَلْبَاطِنُ اَلْوَالِىْ

اَلْمُتَعَالِىْ اَلْبَرُّ اَلتَّوَّابُ اَلْمُنْتَقِيْمُ اَلْعَفُوُّ اَلرَّؤُفُ

مَالِكُ اَلْمُلْكِ ذُوْ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَلْمُقْسِطُ اَلْجَامِعُ

اَلْغَنِىُّ اَلْمُغْنِىْ اَلْمَانِعُ اَلضَّارُّ اَلنَّافِعُ اَلنُّوْرُ

اَلْهَادِىْ اَلْبَدِيْعُ اَلْبَاقِىْ اَلْوَارِثُ اَلرَّشِيْدُ اَلصَّبُوْرُ

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে আল্লাহ্‌র নামসমূহের যে বর্ণনা এসেছে সেগুলোতে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সবগুলো বর্ণনার নামসমূহের সমন্বয় করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৬টি। সেগুলোর বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ

১. ইমাম তিরমিযী সফওয়ান ইব্‌নে সালেহ্‌র সূত্রে যে নিরানব্বইটি নাম বর্ণনা করেছেন, সেগুলোতে এমন ২৬টি নাম আছে যেগুলোর কথা ইব্‌নে মাযা এবং মাল মুস্তাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ নেই।

২. ইবনে মাযা যহীর ইব্‌নে মুহাম্মাদের সূত্রে যে নিরানব্বইটি নাম উল্লেখ করেছেন তাতে এমন ২৬টি নাম আছে যেগুলো তিরমিযী এবং আল মুসতাদরাকে উল্লেখ নেই।

৩. ইমাম হাকেম তাঁর আল মুসতাদরাকে আব্দুল আযীয ইবনে হুসাইনের সূত্রে যে নামগুলো উল্লেখ করেছেন তাতে এমন ২০টি নাম আছে যা তিরমিযী এবং ইবনে মাযায় উল্লেখ নেই।

৪. এ তিনটি গ্রন্থের তিনটি সূত্রের বাইরেও আরও যেসব সূত্রে আল্লাহর নামসমূহ উল্লেখ রয়েছে সেগুলো অনুসন্ধান করলে আরও ১১টি নাম পাওয়া যায়।

৫. কিছু কিছু নাম এমন আছে যেগুলো একই মূল শব্দ থেকে উদ্‌গত হয়েছে বটে কিন্তু বিভিন্ন ক্রিয়া বিশেষ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। এগুলোর অর্থ প্রায় একই রকম। এ ধরনের নামগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১- اَللّٰهُ ঃ আল্লাহ

٢- اَلرَّحْمٰنُ ঃ আররাহমানু

٣- اَلْمَلِكُ ঃ আলমালিকু

٤- اَلْكَبِيْرُ ঃ আল কাবিরু

٥- اَلْغَفَّارُ ঃ আল গাফ্‌ফারু

٦- اَلْقَهَّارُ ঃ আল কাহ্‌হারু

٧- اَلرَّزَّاقُ ঃ আর রায্‌যাকু

٨- اَلْعَلِيْمُ ঃ আল আলিমু

٩- اَلسَّمِيْعُ ঃ আস সামি'উ

١٠- اَلْحَكِيْمُ ঃ আল হাকীমু

١١- اَلْجَلِيْلُ ঃ আল জালিলু

١٢- اَلْحَىُّ ঃ আল হাইয়্যু

١٣- اَلْبَرُّ ঃ আল বার্‌রু

١٤- اَلشَّكُوْرُ ঃ আশ শুকুরু

١٥- اَلْعَلِىُّ ঃ আল আলিয়ুউ

١٦- اَلْحَفِيْظُ ঃ আল হাফিযু

١٧- اَلْمَجِيْدُ ঃ আল মাজিদু

١٨- اَلْقَوِىُّ ঃ আল কাউয়্যু

١٩- اَلْوَلِى ঃ আল উলা

٢٠- اَلْقَيُّوْمُ ঃ আল কাউয়ুম

٢١- اَلْوَاحِدُ ঃ আল ওয়াহেদু

٢٢- اَلْقَادِرُ ঃ আল কাদিরু

٢٣- اَلْغَنِىُّ ঃ আল গানিয়্যু

٢٤- اَلنُّوْرُ ঃ আন নূরু

٢٥- اَلرَّشِيْدُ ঃ আর রাশিদু

٢٦- اَلْكَرِيْمُ ঃ আল কারিমু

٢٧- اَلرَّفِيْعُ ঃ আর রাফিউ

٢٨- اَلْخَالِقُ ঃ আল খালিকু

৬. কিছু কিছু নাম এমন আছে যেগুলো কুরআন মজীদে বর্ণিত আল্লাহ্‌র কোনো কোনো কর্মকে ভিত্তি করে ক্রিয়া বিশেষ্যরূপে তৈরি করে নেয়া হয়েছে। যেমন ঃ

١- اَلْمَنَّانُ ঃ আল মান্নানু

٢- اَلْمُمَيِّتُ ঃ আল মুমাইয়্যাতু

٣- اَلْبَاعِثُ ঃ আল বায়েসু

٤- اَلْبَاقِىُ ঃ আল বাকিউ

٥- اَلْقَابِضُ ঃ আল কাবিদু

٦- اَلْبَاسِطُ ঃ আল বাসিতু

٧- اَلرَّافِعُ ঃ আর রাফিউ

٨۔ اَلْمُعِزُّ : আল মুয়াজ্জু

٩۔ اَلْمُذِلُّ : আল মুজিল্লু

١٠۔ اَلْمُحْصِيُ : আল মুহসিউ

١١۔ اَلْمُعِيْنُ : আল মুঈনু

١٢۔ اَلْمُبْدِئُ : আল মুবদিউ

١٣۔ اَلْمُعِيْدُ : আল মুয়িদু

١٤۔ اَلضَّارُّ : আদ দাররু

١٥۔ اَلسَّامِعُ : আস্ সামিউ

৭. কিছু কিছু নাম কোনো না কোনো কর্মের সাথে সংযুক্ত হয়ে বর্ণিত হয়েছে এ নামগুলোকে সে কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধরনের নামগুলো হলো ঃ

١۔ اَلْغَافِرُ : আল গাফিরু

٢۔ اَلْقَابِلُ : আল কাবিলু

٣۔ اَلسَّرِيْعُ : আস্ সারিউ

٤۔ اَلشَّدِيْدُ : আশ্ শাদীদু

٥۔ اَلرَّفِيْعُ : আর রাফি'উ

٦۔ اَلْفَاطِرُ : আল ফাতিরু

٧۔ اَلْعَلاَّمُ : আল আল্লামু

٨۔ اَلْعَالِمُ : আল আলিমু

٩۔ اَلْبَدِيْعُ : আল বাদি'উ

١٠۔ اَلْمُحْيِيُ : আল মুহিইউ

١١۔ اَلنُّوْرُ : আন্ নূরু

١٢۔ اَلْجَامِعُ : আল জামি'উ

١٣. اَلْقَاهِرُ : আল কাহিরু

١٤. اَلْقَائِمُ ঃ আল কায়িমু

١٥. اَلْغَالِبُ ঃ আল গালিবু

١٦. اَلْكَافِىْ ঃ আল কাফিউ

١٧. اَلْجَلِيْلُ ঃ আল জালিলু

١٨. اَلْقَوِىُّ ঃ আল কাউইয়ু

١٩. اَلْمُحِيْطُ ঃ আল মুহিতু

٢٠. اَلْوَارِثُ ঃ আল ওয়ারেসু

٢١. اَلرَّازِقُ ঃ আর রাজিকু

৮. এ গ্রন্থে প্রথমত ইমাম তিরমিযী ইমাম সফ্ওয়ান ইব্নে সালেহ্র সূত্রে বর্ণিত নিরানব্বইটি নাম ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে। বাকী নামগুলো অন্যান্য সূত্র ও গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

١. اَلْبَرُّ ঃ আল বার্রু

٢. اَلْخَافِضُ ঃ আল খাফিদু

٣. اَلْعَدْلُ ঃ আল আদলু

٤. اَلْوَاجِدُ ঃ আল ওয়াজিদু

٥. اَلْمَانِعُ ঃ আল মানি'উ

٦. اَلنَّافِعُ ঃ আন নাফি'উ

٧. اَلصَّبُوْرُ ঃ আস সাবুরু

٨. اَلْمُنِيْرُ ঃ আল মুনিরু

اَلْمُغِيْثُ ঃ আল মুগীসু

اَلْمُقِيْتُ ঃ আল মুকীতু

اَلْمُنِيْبُ ঃ আল মুনিবু

১

আল্লাহ ঃ اَللّٰهُ

ব্যাখ্যা ঃ আরবদের জন্য "আল্লাহ" শব্দটি কোনো নতুন ও অপরিচিত শব্দ ছিল না। প্রাচীনতম কাল থেকে বিশ্বজাহানের স্রষ্টার প্রতিশব্দ হিসেবে তারা আল্লাহ শব্দটি ব্যবহার করে আসছিল। নিজেদের অন্য কোনো মাবুদ ও উপাস্য দেবতার জন্য এ শব্দটি প্রয়োগ করতো না। অন্য মাবুদদের জন্য তারা "ইলাহ" শব্দ ব্যবহার করতো। তারপর আল্লাহ সম্পর্কে তাদের যে আকীদা ছিল তার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছিল আবরাহার মক্কা আক্রমণের সময়। সে সময় কাবা ঘরে ৩৬০টি উপাস্যের মূর্তি ছিল। কিন্তু এ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য মুশরিকরা তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিল। অর্থাৎ তারা নিজেরা ভালোভাবে জানতো, এ সংকটকালে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্তাই তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। কাবাঘরকেও তারা এসব ইলাহের ঘর মনে করে বায়তুল আ-লিহাহ (ইলাহ-এর বহুবচন) বলতো না বরং আল্লাহর ঘর মনে করে একে বলতো 'বায়তুল্লাহ'।[৪]

○

সূরা ইখলাসে আল্লাহ তাআলা নিজের পরিচয় পেশ করেছেন এ ভাষায় ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

"বলো, তিনি আল্লাহ, একক। আল্লাহ কারো ওপর নির্ভরশীল নন বরং সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

এছাড়া কোথাও কোথাও এ বিষয়কে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন মানুষ প্রকৃত সত্যকে পূর্ণরূপে বুঝতে পারে। যেমন ঃ

اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ ـ النساء : ١٧١

“আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ। কেউ তাঁর পুত্র হবে, তিনি এর অনেক ঊর্ধে। পৃথিবী ও আকাশের সবকিছুই তাঁর মালিকানাধীন।”

–সূরা আন নিসা ঃ ১৭১

اَلَا اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ○ وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

“ভালো করেই শুনে রাখো, আসলে তারা তো মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহর সন্তান আছে এবং যথার্থই তারা মিথ্যাবাদী।”

–সূরা আস্ সাফ্‌ফাত ঃ ১৫১–১৫২

সারা বিশ্বজাহানে আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তাঁর সমপর্যায়ে উন্নীত হতে পারে এমন কেউ কোনো দিন ছিল না এবং কোনো দিন হতেও পারবে না।[৫]

○

বিশ্বজাহানের এই যে বিশাল কারখানা মানুষের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত সক্রিয়, মানুষ যদি তাকে নিছক নির্বোধ জন্তু-জানোয়ারের দৃষ্টিতে না দেখে বুদ্ধি বিবেকের সাহায্যে বিচার বিশ্লেষণ করে তার সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সকল প্রকার হঠকারিতা পরিহার করে পক্ষপাতহীন-ভাবে মুক্ত মনে চিন্তা করে তাহলে চতুর্দিকে যেসব নিদর্শন সে প্রত্যক্ষ করেছে সেগুলো তাকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য যথেষ্ট যে, বিশ্বজাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা একজন অসীম ক্ষমতাধর জ্ঞানবান সত্তার বিধানের অনুগত।

সমস্ত ক্ষমতা কর্তৃত্ব সেই একই সত্তার হাতে কেন্দ্রীভূত। এ ব্যবস্থাপনায় অন্য কারো স্বাধীন হস্তক্ষেপ বা অংশীদারিত্বের সামান্যতম অবকাশই নেই। কাজেই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্বজগতের তিনিই একমাত্র প্রভু ইলাহ ও আল্লাহ। তাঁর ছাড়া আর কোনো সত্তার কোনো বিষয়ে সামান্যতম ক্ষমতা নেই। কাজেই খোদায়ী কর্তৃত্ব ও উপাস্য হবার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে আর কারো কোনো অংশ নেই।[৬]

○

সার্বভৌম কর্তৃত্বের যে বিশেষ গুণাবলী একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত তারা তার মধ্য থেকে কোনো কোনোটাকে অন্যদের সাথে সম্পর্কিত করে। আর আল্লাহ হিসেবে বান্দার ওপর তাঁর যে অধিকার

রয়েছে তার মধ্য থেকে কোনো কোনোটা তারা তাদের এসব বানোয়াট মাবুদদের জন্যও আদায় করে। যেমন—বিশ্বজগতের যাবতীয় কার্যকারণ পরম্পরার ওপর কর্তৃত্ব, অভাব দূর করা ও প্রয়োজন পূর্ণ করা, সংকট মোচন, অভিযোগ ও প্রার্থনা শ্রবণ, দৃশ্য-অদৃশ্য নির্বিশেষে সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়া—এ গুণগুলো একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। বান্দা একমাত্র আল্লাহকেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন বলে মানবে, একমাত্র তার সামনে বন্দেগীর স্বীকৃতি সহকারে মাথা নোয়াবে, নিজের অভাব-অভিযোগ প্রয়োজন পূরণের জন্য তাঁরই দিকে এগিয়ে যাবে, তাঁরই কাছে সাহায্যের আবেদন জানাবে, তাঁরই ওপর ভরসা ও নির্ভর করবে, তাঁরই কাছে আশা করবে এবং একমাত্র তাঁকেই ভয় করবে বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবেও—এগুলো হচ্ছে বান্দার ওপর আল্লাহর হক। অনুরূপভাবে সমগ্র বিশ্বজগতের একচ্ছত্র মালিক হবার কারণে মানুষের জন্য হালাল হারামের সীমা নির্ধারণ করার, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণের, তাদের আদেশ নিষেধের বিধান দান করার এবং তিনি মানুষকে যেসব শক্তি ও উপায় উপকরণ দান করেছেন সেগুলো তারা কিভাবে, কোন্ কাজে এবং কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে তা জানিয়ে দেয়ার ও নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর আছে। এছাড়া বান্দার ওপর আল্লাহর যে অধিকার সে অনুযায়ী বান্দা একমাত্র আল্লাহকেই সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী বলে স্বীকার করে নেবে। তাঁর নির্দেশকে আইনের উৎস হিসেবে মেনে নেবে। তাঁকেই যে কোনো কাজের আদেশ করার ও তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দান করার একচ্ছত্র অধিকারী মনে করবে। নিজের জীবনের সকল ব্যাপারেই তাঁর নির্দেশকে চূড়ান্ত গণ্য করবে। দুনিয়ায় জীবনযাপন করার জন্য বিধান ও পথনির্দেশনা লাভের ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর এ গুণাবলীর মধ্য থেকে কোনো একটি গুণকেও অন্যের সাথে সম্পর্কিত করে এবং তাঁর এ অধিকারগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি অধিকারও অন্যকে দান করে, সে আসলে তাকে আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বা যে সংস্থা এ গুণাবলীর মধ্য থেকে কোনো একটি গুণেরও দাবীদার সাজে এবং মানুষের কাজ ঐ অধিকারগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি অধিকার দাবী করে সেও মুখে খোদায়ী কর্তৃত্বের দাবী না করলেও আসলে আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ সাজে।[৭]

○

সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ .... : ال عمران : ١٨

"আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই ....।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮

অর্থাৎ যে আল্লাহ্ বিশ্বজাহানের সমস্ত তত্ত্ব, সত্য ও রহস্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান রাখেন, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আবরণহীন অবস্থায় দেখছেন এবং যাঁর দৃষ্টি থেকে পৃথিবী ও আকাশের কোনো একটি বস্তুও গোপন নেই—এটি তাঁর সাক্ষ্য এবং তাঁর চাইতে আর বেশী নির্ভরযোগ্য চাক্ষুষ সাক্ষ্য আর কে দিতে পারে ? কারণ সমগ্র সৃষ্টিজগতে তিনি ছাড়া আর কোনো সত্তা খোদায়ী গুণে গুণান্বিত নয়। আর কোনো সত্তা খোদায়ী কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং আর কারো খোদায়ী করার যোগ্যতাও নেই।[৮]

○

আল্লাহর অস্তিত্ব নিছক কাল্পনিক নয়। কতিপয় বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতা দূর করার জন্য এ ধারণা গ্রহণ করা হয়নি। তিনি নিছক দার্শনিকদের চিন্তার আবিষ্কার, অনিবার্য সত্তা ও সকল কার্যকারণের প্রথম কারণই (First cause) নয় বরং তিনি প্রকৃত স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তা, যিনি প্রতি মুহূর্তে নিজের শক্তিমত্তা, সংকল্প, জ্ঞান ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব-জাহান ও এর প্রতিটি বস্তু পরিচালনা করেছেন।[৯]

○

কোনো ব্যক্তি যখনই কোনো প্রকার শির্কে লিপ্ত হয় তখন সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার কোনো না কোনো গুণকে অস্বীকার করে। কেউ যদি বলে অমুক ব্যক্তি আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। তাহলে প্রকৃতপক্ষে তার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ্ রোগ আরোগ্যকারী নন, বরং সেই ব্যক্তিই রোগ আরোগ্যকারী। কেউ যদি বলে, অমুক বুযুর্গ ব্যক্তির অনুগ্রহে আমি রুজি লাভ করেছি। তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে যেন বললো, আল্লাহ তাআলা রিযিকদাতা নন বরং সেই বুযুর্গ ব্যক্তি রিযিক দাতা। কেউ যদি বলে, অমুক আস্তানা থেকে আমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে, তাহলে সে যেন বললো, পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুম চলছে না, বরং ঐ আস্তানার হুকুম চলছে। মোটকথা প্রতিটি শির্কমূলক আকীদা ও শির্কমূলক কথাবার্তা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আল্লাহর গুণাবলীর অস্বীকৃতির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে।

শির্কের অর্থই হচ্ছে ব্যক্তি অন্যদের সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী, অদৃশ্য জ্ঞাতা, স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদনকারী, সর্বশক্তিমান এবং খোদায়ীর অন্য সবগুণে গুণান্বিত বলে আখ্যায়িত করছে এবং এককভাবে আল্লাহই যে এসব গুণে গুণান্বিত তা অস্বীকার করছে।[১০]

○

(২)

আল ইলাহ ঃ اَلْاِلٰهُ

অর্থ ঃ (১) যে ব্যক্তি বা বস্তু ইবাদাত, উপাসনা ও আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য নয়। তথাপি তার ইবাদাত ও আনুগত্য করা হয়। (২) যে মূলত ইবাদাত ও আনুগত্য পাওয়ার উপযুক্ত ও অধিকারী, চাই তার ইবাদাত কার্যত করা হোক বা না হোক।-দেখুন ঃ তাফহীম, সূরা নাস, টীকা ঃ ১।

শব্দটির মূল অক্ষর আলিফ-লাম-হা (ا - ل - ه)। এ মূল অক্ষর থেকে অভিধানে যেসব শব্দ পাওয়া যায়, তার বিবরণ এই ঃ

اله : اِذَا تَحَيَّرَ –সে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

اَلِهْتُ اِلٰى فُلاَنَ اَىْ سَكَنْتُ اِلَيْهِ –তার আশ্রয়ে গিয়ে বা তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে আমি শান্তি এবং তৃপ্তি লাভ করেছি।

اَلِهَ الرَّجُلُ يَاْلَهُ : اِذَا فَزِعَ مِنْ اَمْرٍ نَزَلَ بِهٖ فَالَهَهُ غَيْرُهٗ -

"কোনো দুঃখ-কষ্টে পড়ে লোকটি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছে, অতঃপর অপর কোনো ব্যক্তি তাকে আশ্রয় দান করেছে।"

اَلِهَ الرَّجُلُ يَاْلَهُ : اِتَّجَهَ اِلَيْهِ لِشِدَّةِ شَوْقِهٖ اِلَيْهِ -

প্রবল আগ্রহ বশত লোকটি অপর ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ দিয়েছে।

اَلِهَ الْفَصِيْلُ : اِذَا وَلِعَ بِاُمِّهٖ -

মাতৃহারা উষ্ট্রীর বাচ্চা মাকে পেয়েই তার কোলে আশ্রয় নিয়েছে।

لاَهَ يَلِيْهُ لِيْهًا وَلاَهًا : اِذَا حْتَجَبَ وَارْتَفَعَ

আচ্ছাদিত বা প্রচ্ছন্ন হয়েছে, বুলন্দ হয়েছে, ওপরে ওঠেছে।

اَلِهَ اِلٰهَةً وَاُلُوْهَةً وَاُلُوْهِيَّةً : عَبَدَ –ইবাদাত করেছে।

اَلِهَ يَاْلَهُ اُلٰهَةً –এর অর্থ ইবাদাত (পূজা) এবং ইলাহ অর্থ মাবুদ কোন্ কারণে কি সম্পর্কে হয়েছে। এ সকল ধাতুগত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে তা জানা যায়।

এক ঃ প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষের অন্তরে ইবাদাতের প্রাথমিক প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, বিপদাপদে তাকে

আশ্রয় দিতে পারে, অস্থিরতার সময় তাকে শান্তি দিতে পারে—এমন একটা ধারণা মানুষের মনে জাগার আগে সে কারো ইবাদাতের কথা কল্পনাও করতে পারে না।

দুই ঃ কাউকে নিজের চেয়ে উন্নততর মনে না করে মানুষ তাকে অভাব পূরণকারী বলে ধারণাও করতে পারে না। কেবল পদমর্যাদার দিক থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়, বরং শক্তি-সামর্থের দিক থেকেও তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হবে।

তিন ঃ একথাও সত্য যে, কার্যকারণ পরম্পরার অধীন যেসব বস্তু দ্বারা সাধারণত মানুষের প্রয়োজন পূরণ হয় ; যার প্রয়োজন পূরণের সকল কার্য মানুষের চক্ষুর সম্মুখে বা তার জ্ঞান-সীমার পরিমণ্ডলে থাকে, তার পূজা অর্চনার কোনো প্রেরণা মানুষের মনে জাগে না। উদাহরণ স্বরূপ ব্যয় করার জন্য আমার টাকার প্রয়োজন, আমি কোনো ব্যক্তির নিকট গিয়ে চাকুরী বা মজুরীর জন্যে আবেদন করি। সে ব্যক্তি আমার আবেদন গ্রহণ করে আমাকে কোনো কাজ দেয়, আর সে কাজের বিনিময়ও আমাকে দেয়। এসব কার্য যেহেতু আমার পঞ্চইন্দ্রীয় এবং জ্ঞান-সীমার মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, আমি জানি সে কিভাবে আমার প্রয়োজন পূরণ করেছে। তাই তার পূজনীয় হওয়ার কোনো ধারণাও আমার অন্তরে উদয় হয় না। যখন কারো ব্যক্তিত্ব, শক্তি-সামর্থ্য বা প্রয়োজন পূরণ এবং প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়া রহস্যাবৃত থাকে—কেবল তখনই কোনো ব্যক্তিকে পূজা করার ধারণা আমার অন্তরে জাগতে পারে। এজন্যই মা'বুদের জন্য এমন শব্দ চয়ন করা হয়েছে যার মধ্যে প্রাধান্যের সাথে প্রচ্ছন্নতা এবং অস্থিরতা-চঞ্চলতার অর্থও শামিল রয়েছে।

চার ঃ যার সম্পর্কেই মানুষ ধারণা করে যে, অভাবের সময় সে অভাব দূর করতে পারে, বিপদের সময় আশ্রয় দিতে পারে, অস্থিরতার সময় শান্তি দিতে পারে ; আগ্রহের সাথে তার প্রতি মনোযোগী হওয়া মানুষের জন্য অপরিহার্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, যে সকল ধারণার ভিত্তিতে মা'বুদের জন্য ইলাহ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা এই ঃ প্রয়োজন পূরণ করা, আশ্রয় দান করা, শান্তি-স্বস্তি দান করা, উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক হওয়া, যে সকল অধিকার এবং ক্ষমতার ভিত্তিতে এ আশা করা যেতে পারে যে, মাবুদ অভাব পূরণকারী এবং আশ্রয় দানকারী হতে পারে, এমন সব ক্ষমতা, অধিকারের মালিক হওয়া,

তার ব্যক্তিত্ব রহস্যাবৃত হওয়া বা সাধারণ দৃশ্যপটে না থাকা তার প্রতি মানুষের আগ্রহী হওয়া।[১১]

○

আসমান-যমীনে একক সত্তাই সকল ক্ষমতা ইখতিয়ারের মালিক। সৃষ্টি করা, নিয়ামত দান করা, নির্দেশ দেয়া, শক্তি-সামর্থ্য—সবকিছুই তাঁর হাতে নিহিত। সবকিছুই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁর আনুগত্য করছে। তিনি ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা নেই, নেই কারো নির্দেশ দানের অধিকার সৃজন এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার রহস্য সম্পর্কেও কেউ অবগত নয়, তাঁর শাসন-ক্ষমতায় কেউ সামান্যতম অংশীদারও নয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তিনি ছাড়া অপর কোনো ইলাহ্ নেই। বাস্তবে যখন অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, তখন অন্যদেরকে ইলাহ্ মনে করে তোমরা যেসব কাজ করছো তা মূলত ভুল এবং অন্যায়। সে কাজ দোয়া-প্রার্থনা করা, সুপারিশকারী বানানো বা নির্দেশ পালন এবং আনুগত্য করার—যে কোনো কার্যই হোক না কেন, তোমরা অন্যের সাথে যে সকল সম্পর্ক স্থাপন করে আছো তা সবই কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। কারণ তিনিই হচ্ছেন একক ক্ষমতার অধিকারী।[১২]

○

ইলাহিয়াত এবং ক্ষমতা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত—ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্পীরিট এবং তাৎপর্যের দিক থেকে উভয়ই এক জিনিস। যার ক্ষমতা নেই, সে ইলাহ্ হতে পারে না—ইলাহ্ হওয়া উচিত নয় তার। যার ক্ষমতা আছে, কেবল সে-ই ইলাহ্ হতে পারে—ইলাহ্ তারই হওয়া উচিত। কারণ, ইলাহ্র নিকট আমাদের যতো প্রকার প্রয়োজন রয়েছে, অন্য কথায় যেসব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কাউকে ইলাহ্ স্বীকার করার আমাদের প্রয়োজন পড়ে, আর কোনো একটি প্রয়োজনও ক্ষমতা ছাড়া পূরণ হতে পারে না। সুতরাং ক্ষমতাহীনের ইলাহ্ হওয়া অর্থহীন, অবাস্তব আর তার দিকে প্রত্যাবর্তন নিষ্ফল।

এ কেন্দ্রীয় ধারণাটি কুরআন যেভাবে উপস্থাপন করেছে, নিম্নোক্ত ধারায় তার ভূমিকা এবং ফলাফল ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় ঃ

এক ঃ অভাব পূরণ, জটিলতা দূরীকরণ, আশ্রয় দান, সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান, তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ এবং আহ্বানে সাড়া দান—এ সবকে তোমরা মামুলী কাজ মনে করছো, আসলে এগুলো কোনো মামুলী কাজ নয় ; বরং সমগ্র বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিধর্ম এবং ব্যবস্থাপনা শক্তির

সাথে এ সবের যোগসূত্র নিহিত। তোমাদের সামান্যতম প্রয়োজন যেভাবে পূরণ হয়, তা নিয়ে চিন্তা করলে জানতে পারবে যে, আসমান-যমীনের বিশাল কারখানায় অসংখ্য অগণিত কার্য-করণের সার্বিক ক্রিয়া ছাড়া তা পূরণ হওয়া অসম্ভব। তোমাদের পান করার এক গ্লাস পানি, আহার্যের একটি কণার কথাই চিন্তা করো ; এ সামান্য জিনিস সরবরাহের জন্য সূর্য, যমীন এবং বায়ু ও সমুদ্রকে কতো কাজ করতে হয়, তা আল্লাহ-ই জানেন। তবেই তো এসব জিনিস তোমাদের কাছে পৌছায়, সুতরাং তোমাদের দোয়া শ্রবণ এবং অভাব অভিযোগ দূরীকরণের জন্য কোনো মামুলী ক্ষমতা নয়, বরং এমন এক ক্ষমতা দরকার ; আসমান-যমীনের সৃষ্টি, গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন, বায়ুপ্রবাহ এবং বারি বর্ষণের জন্য—এক কথায়, সমগ্র বিশ্বজাহানের পরিচালনা এবং শৃংখলা বিধানের জন্য যে ক্ষমতা দরকার।

দুই ঃ এ ক্ষমতা অবিভাজ্য। সৃষ্টি করার ক্ষমতা একজনের হাতে থাকবে আর জীবিকা সরবরাহের ক্ষমতা থাকবে অন্যজনের হাতে ; সূর্য একজনের অধিকারে থাকবে, যমীন অন্যজনের অধিকারে ; সৃষ্টি করা কারো ইখতিয়ারে থাকবে সুস্থতা-অসুস্থতা অন্য কারো ইখতিয়ারে, জীবন এবং মৃত্যু কোনো তৃতীয় জনের ইখতিয়ারে—এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। এমন হলে বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপনা কিছুতেই চলতে পারতো না। সুতরাং সকল ক্ষমতা ইখতিয়ার একই কেন্দ্রীয় শাসকের অধিকারে থাকা একান্ত জরুরী। এমনটি হোক, তা বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপনারও দাবী। মূলত হয়েছেও তাই।

তিন ঃ যেহেতু একই শাসকের হাতে সমস্ত ক্ষমতা নিহিত, ক্ষমতায় বিন্দু মাত্রও কারো কোনো হিস্যা নেই, সুতরাং উলুহিয়াতও সর্বতোভাবে সে শাসনকর্তার জন্যই নির্দিষ্ট, তাতেও কেউ অংশীদার নেই। তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিতে পারে, দোয়া কবুল করতে পারে, আশ্রয় দান করতে পারে, সহযোগী-সাহায্যকারী এবং পৃষ্ঠপোষক ও কর্মকুশলী হতে পারে—এমন ক্ষমতা কারো নেই। সুতরাং ইলাহর যে অর্থ-ই তোমাদের মানস-পটে আছে, তার প্রেক্ষিতে অন্য কোনো ইলাহ নেই। এমনকি বিশ্বজাহানের নিয়ন্তা-পরিচালকের নৈকট্য লাভের প্রেক্ষিতে আর কিছুটা ক্ষমতা চলবে এবং তার সুপারিশ কবুল করা হবে—এ অর্থেও কোনো ইলাহ নেই। তার রাজ্য পরিচালন ব্যবস্থায় কারও বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। তার কার্যাবলীতে কেউ দখল দিতে পারে না। সুপারিশ কবুল করা না করা সম্পূর্ণ তাঁর ইখতিয়ারে। কারো এমন কোনো ক্ষমতা নেই, যার ভিত্তিতে সে তার সুপারিশ কবুল করাতে পারে।

৩—

চার ঃ একক সর্বোচ্চ ক্ষমতার দাবী এই যে, সার্বভৌমত্ব এবং নেতৃত্ব কর্তৃত্বের যত শ্রেণীবিভাগ আছে, একক সার্বিক ক্ষমতার অধিকারীর অস্তিত্বের মধ্যে তা সবই কেন্দ্রীভূত হবে। সার্বভৌমত্বের কোনো অংশও অন্য কারো দিকে স্থানান্তরিত হবে না। তিনিই যখন স্রষ্টা, সৃষ্টি-কর্মে কেউ তাঁর শরীক নেই ; রিযিকদাতা তিনি, রিযিকদানে কেউ তাঁর অংশীদার নেই; বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপনায় তিনি একক চালক, ব্যবস্থাপক—পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনায় কেউই তাঁর সাথে শরীক নেই। সুতরাং নির্দেশদাতা এবং আইনদাতা-বিধানদাতাও তিনিই। ক্ষমতার এ পর্যায়েও কারো অংশীদার হওয়ার কোনো কারণ নেই। যেমনি করে তাঁর রাজ্যের পরিসীমায় অন্য কারো ফরিয়াদে সাড়া দানকারী, অভাব পূরণকারী এবং আশ্রয়দাতা হওয়া মিথ্যা, তেমনি করে স্বতন্ত্র নির্দেশদাতা, স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী নৃপতি এবং স্বাধীন আইন-বিধানদাতা হওয়াও ভুল-মিথ্যা। সৃষ্টি করা এবং জীবিকা দান, জীবন-মৃত্যু দান, চন্দ্র-সূর্যের বশীকরণ, রাত-দিনের আবর্তন-বিবর্তন, পরিমাণ নির্ধারণ, নির্দেশ দান এবং একক রাজত্ব-কর্তৃত্ব, আইন-বিধান দান—এ সবই হচ্ছে একক ক্ষমতা এবং সার্বভৌমিকতার বিভিন্ন দিক। এ ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্ব অবিভাজ্য। কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর নির্দেশের অনুমোদন ছাড়াই কাউকে আনুগত্যের যোগ্য মনে করে, তবে সে তেমনি শিরক করে, যেমনি শিরক করে গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী ব্যক্তি। কোনো ব্যক্তি যদি রাজনৈতিক অর্থে রাজাধিরাজ (مالك الملك), সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং নিরংকুশ শাসক (حاكم على الاطلاق) বলে দাবী করে, তবে তার এ দাবী সরাসরি খোদায়ীর দাবীর অনুরূপ ; যেমন—অতি-প্রাকৃতিক অর্থে কারো এ দাবী করা যে আমিই তোমার পৃষ্ঠপোষক, কর্মকুশলী, সাহায্যকারী এবং সংরক্ষক। এজন্য যেখানেই সৃষ্টি বস্তুর পরিমাণ এবং বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় আল্লাহকে লা-শরীক বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই (له الحكم) নির্দেশ দেয়ার অধিকার একমাত্র তাঁর, (له الملك) বৈধ অধিকার কেবলমাত্র তাঁরই এবং (لم يكن له شريك فى الملك) কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্বে কেউই তাঁর শরীক নেই ইত্যাদিও বলা হয়েছে। এসব থেকে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাজত্ব-কর্তৃত্বের অর্থও উলুহিয়াত (الوهيت) -এর তাৎপর্যের শামিল। এ অর্থের দিক থেকেও আল্লাহর সাথে অন্য কারো অংশীদারিত্ব স্বীকার না করা ইলাহর একত্বের জন্যে অপরিহার্য। নিম্নোক্ত আয়াতে একথাটি আরও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط ـ ال عمران : ٢٦

"বল, হে আল্লাহ ! রাজত্বের মালিক। যাকে খুশী রাজ্য দান কর, যার কাছ থেকে খুশী রাজ্য ছিনিয়ে নাও। যাকে ইচ্ছা ইয্যত দান করো, যাকে খুশী অপদস্ত করো।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ○

"সুতরাং প্রকৃত বাদশাহ্ আল্লাহ্ অতি মহান। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মহান আরশ-এর অধিকারী।"-সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১১৬

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ اِلٰهِ النَّاسِ ○ الناس : ١ ـ ٣

"বলো, মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ্, মানুষের ইলাহ্‌র কাছে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি।"[১৩]–সূরা আন-নাস ঃ ১-৩

○

নিজের এ বিশাল সীমাহীন রাজ্যের যাবতীয় শাসন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক তিনি একাই। তাঁর গুণাবলীতে দ্বিতীয় কোনো সত্তার অংশীদারীত্ব নেই। তাঁর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও অধিকারেও নেই দ্বিতীয় কোনো শরীক। কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে বা তাঁর সাথে শরীক করে পৃথিবীতে বা আকাশে কোথাও আর কাউকে মাবুদ, ইলাহ ও প্রভু বানানো হলে তা একটি নিরেট মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই হয় না। এভাবে আসলে সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[১৪]

○

যিনি ছাড়া আর কারোরই ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও অবস্থান এমন নয় যে, তার বন্দেগী ও আরাধনা করা যেতে পারে। যিনি ছাড়া আর কেউ আল্লাহ্‌র গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিকই নয় যে, সে উপাস্য হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারে।[১৫]

○

খোদায়ীর সর্বময় ক্ষমতা ও ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে। এ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার অন্য কারো আদৌ নেই। তাই অন্য কেউ তোমাদের জন্য ভাল বা মন্দ ভাগ্য গড়তে পারে না। তিনি আনলেই

কেবল সুসময় আসতে পারে এবং তিনি দূর করলেই কেবল দুঃসময় দূর হতে পারে। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহকে মনে প্রাণে একমাত্র ইলাহ বলে স্বীকার করে সে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং একজন ঈমানদার হিসেবে এই বিশ্বাস রেখে দুনিয়াতে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকবে যে, আল্লাহ যে পথ দেখিয়েছেন কেবল সে পথেই কল্যাণ নিহিত। এ ছাড়া তার জন্য আর কোনো পথ নেই। এ পথে সফলতা লাভ হলে তা আল্লাহর সাহায্য, সহযোগিতা ও তাওফিকের মাধ্যমেই হবে ; অতপর কোনো শক্তির সাহায্যে তা হওয়ার নয়। আর এ পথে যদি কঠোর পরিস্থিতি, বিপদাপদ, ভয়-ভীতি ও ধ্বংস আসে তাহলে তা থেকেও কেবল তিনিই রক্ষা করতে পারেন, অন্য কেউ নয়।[১৬]

○

বিশ্বজাহানের আসল মালিক ও শাসনকর্তাই মানুষের আসল মা'বুদ। তিনিই প্রকৃতপক্ষে মা'বুদ হতে পারেন এবং তাঁরই মা'বুদ হওয়া উচিত। রব (মালিক, শাসনকর্তা ও প্রতিপালক) হবে একজন এবং ইলাহ (ইবাদাত লাভের অধিকারী) হবে অন্যজন, এটা একেবারেই বুদ্ধি বিরোধী কথা। মানুষের লাভ ও ক্ষতি, তার অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া, তার ভাগ্য ভাঙা-গড়া বরং তার নিজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বই যার ক্ষমতার অধীন তার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করা এবং তার সামনে নত হওয়া মানুষের প্রকৃতিরই দাবী। এটিই তার ইবাদাতের মৌল কারণ। মানুষ যখন একথাটি বুঝতে পারে তখন আপনা আপনি সে একথাটিও বুঝতে পারে যে, ক্ষমতার অধিকারীর ইবাদাত না করা এবং ক্ষমতাহীনের ইবাদাত করা দুটোই বুদ্ধি ও প্রকৃতির সুস্পষ্ট বিরোধী। কর্তৃত্বশালী ইবাদাত লাভের হকদার হন। কর্তৃত্বহীন সত্তারা এর হকদারও হয় না। তাদের ইবাদাত করে এবং তাদের কাছে কিছু চেয়ে কোনো লাভও হয় না। কারণ আমাদের কোনো আবেদনের ভিত্তিতে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই। তাদের সামনে বিনয়, দীনতা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে মাথানত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ঠিক তেমনিই নির্বুদ্ধিতার কাজ যেমন কোনো ব্যক্তি কোনো শাসনকর্তার সামনে হাজির হয়ে তার কাছে আর্জি পেশ করার পরিবর্তে অন্য প্রার্থীরা যারা সেখানে আবেদনপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্য থেকে কারো সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।[১৭]

○

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَه الِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لاَّبْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلاً ○

"হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, যদি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও থাকতো যেমন এরা বলে, তাহলে সে আরশের মালিকের জায়গায় পৌঁছে যাবার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করতো।"-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪২

অর্থাৎ সে নিজেই আরশের মালিক হবার চেষ্টা করতো। কারণ অনেকগুলো সত্তা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের শরীক হলে সেখানে অনিবার্য-ভাবে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হবে। এক, তারা সবাই হবে প্রত্যেকের জায়গায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ইলাহ। দুই, তাদের একজন হবে আসল ইলাহ আর বাদবাকি সবাই হবে তার বান্দা এবং সে তাদেরকে নিজের প্রভুত্ব কর্তৃত্বের কিছু কিছু অংশ সোপর্দ করবে। প্রথম অবস্থাটিতে কোনোক্রমেই এসব স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ইলাহর পক্ষে সবসময় সব ব্যাপারে পরস্পরের ইচ্ছা ও সংকল্পের প্রতি আনুকূল্য বজায় রেখে এ অনন্ত অসীম বিশ্বলোকের আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা এতো পরিপূর্ণ ঐক্য, সামঞ্জস্য, সমতা ও ভারসাম্য সহকারে পরিচালনা করা সম্ভবপর ছিল না। তাদের পরিকল্পনা ও সংকল্পের প্রতি পদে পদেই সংঘর্ষ বাধা ছিল অনিবার্য। প্রত্যেকেই যখন দেখতো অন্য ইলাহদের সাথে আনুকূল্য ছাড়া তার প্রভূত্ব চলছে না তখন সে একাই সমগ্র বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র মালিক হয়ে যাবার চেষ্টা করতো। আর দ্বিতীয় অবস্থা সম্পর্কে বলা যায়, বান্দার সত্তা প্রভুত্বের ক্ষমতা তো দূরের কথা প্রভুত্বের সামান্যতম ভাবকল্প ও স্পর্শ-গন্ধ ধারণ করার ক্ষমতাও রাখে না। যদি কোথাও কোনো সৃষ্টির দিকে সামান্যতম প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব স্থানান্তরিত করে দেয়া হতো তাহলে তার পায়াভারি হয়ে যেতো, আর সামান্য ক্ষণের জন্যও সে বান্দা হয়ে থাকতে রাজী হতো না এবং তখনি সে বিশ্বজাহানের ইলাহ হয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে দিতো।

যে বিশ্বজাহানে পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত শক্তি মিলে একসাথে কাজ না করলে গমের একটি দানা এবং ঘাসের একটি পাতা পর্যন্তও উৎপন্ন হতে পারে না তার সম্পর্কে শুধুমাত্র একজন নিরেট মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকই একথা চিন্তা করতে পারে যে, একাধিক স্বাধীন বা অর্ধ স্বাধীন ইলাহ তার শাসনকার্য পরিচালনা করছে। অন্যথায় যে ব্যক্তিই এ ব্যবস্থার মেজাজ ও প্রকৃতি বুঝবার জন্য সামান্যতম চেষ্টাও করেছে সে এ সিদ্ধান্তে

না পৌঁছে থাকতে পারে না যে, এখানে শুধুমাত্র একজনেরই প্রভুত্ব চলছে এবং তাঁর সাথে অন্য কারো কোনো পর্যায়েই কোনো প্রকারের শরীক হবার আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই।[১৮]

○

সমগ্র বিশ্বজাহান এবং তার প্রত্যেকটি জিনিস নিজের সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে এ সত্যের পক্ষে সাক্ষ দিয়ে চলছে যে, যিনি তাকে পয়দা করেছেন এবং তার লালন পালন ও দেখাশুনা করছেন, তাঁর সত্তা সবরকমের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত এবং প্রভুত্বের ব্যাপারে কেউ তাঁর সাথে শরীক ও সহযোগী নয়।[১৯]

○

৩

আর রাহমানু ঃ اَلرَّحْمٰنُ

অর্থ ঃ পরম করুণাময়, করুণাকারী।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের দৃষ্টিতে কোনো জিনিস খুব বেশী বলে প্রতীয়মান হলে সেজন্য সে এমন শব্দ ব্যবহার করে যার মাধ্যমে আধিক্যের প্রকাশ ঘটে। আর একটি আধিক্যবোধক শব্দ বলার পর যখন সে অনুভব করে যে, ঐ শব্দটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জিনিসটির আধিক্যের প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তখন সে সেই একই অর্থে আর একটি শব্দ ব্যবহার করে। এভাবে শব্দটির অন্তর্নিহিত গুণের আধিক্য প্রকাশের ব্যাপারে যে কমতি রয়েছে বলে সে মনে করছে তা পূরণ করে। আল্লাহর প্রশংসায় 'রহমান' শব্দের পরে আবার 'রহীম' বলার মধ্যেও এ একই নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। আরবী ভাষায় 'রহমান' একটি বিপুল আধিক্যবোধক শব্দ। কিন্তু সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর রহমত ও মেহেরবানী এতবেশী ও ব্যাপক এবং এত সীমা সংখ্যাহীন যে, তা বর্ণনা করার জন্য সবচেয়ে বেশি ও বড় আধিক্যবোধক শব্দ ব্যবহার করার পরও মন ভরে না। তাই তার আধিক্য প্রকাশের হক আদায় করার জন্য আবার 'রহীম' শব্দটিও বলা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যেতে পারে, যেমন আমরা কোনো ব্যক্তির দানশীলতার গুণ বর্ণনা করার জন্য 'দাতা' বলার পরও যখন অতৃপ্তি অনুভব করি তখন এর সাথে 'দানবীর' শব্দটিও লাগিয়ে দেই। রঙের প্রশংসায় 'সাদা' শব্দটি বলার পর আবার 'দুধের মতো সাদা' বলে থাকি।[২০]

○

একমাত্র তিনিই এমন এক সত্তা যাঁর রহমত অসীম ও অফুরন্ত। সমগ্র বিশ্ব চরাচরব্যাপী পরিব্যপ্ত এবং বিশ্বজাহানের প্রতিটি জিনিসই তাঁর বদান্যতা ও অনুগ্রহ লাভ করে থাকে। গোটা বিশ্বজাহানে আর একজনও এ সর্বাত্মক ও অফুরন্ত রহমতের অধিকারী নেই। আর যেসব সত্তার মধ্যে দয়ামায়ার এ গুণটি দেখা যায় তা আংশিক ও সীমিত। তাও আবার তার নিজস্ব গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয়। বরং স্রষ্টা কোনো উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সামনে রেখে তা তাকে দান করেছেন তিনি কোনো সৃষ্টির মধ্যে দয়ামায়ার আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি করে থাকলে তা এ জন্য করেছেন যে, তিনি একটি সৃষ্টিকে দিয়ে আরেকটি সৃষ্টির প্রতিপালন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করতে চান। এটাও তাঁরই রহমতের প্রমাণ।[২১]

○

এ বিষয়বস্তুটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত সূক্ষ্ম দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি একটি দৃষ্টান্ত এভাবে দিয়েছেন যে, তোমাদের কোনো ব্যক্তির উট যদি কোনো বিশুষ্ক তৃণপানিহীন এলাকায় হারিয়ে গিয়ে থাকে, তার পিঠে তার পানাহারের সামগ্রীও থাকে এবং সে ব্যক্তি তার খোঁজ করতে করতে নিরাশ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের নীচে শুয়ে পড়ে। ঠিক এমনি অবস্থায় সে দেখে তার উটটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এ সময় সে যে পরিমাণ খুশী হবে আল্লাহর পথভ্রষ্ট বান্দা সঠিক পথে ফিরে আসার ফলে আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশী খুশী হন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি এর চেয়ে আরো বেশী মর্মস্পর্শী। হযরত উমর (রা) বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু যুদ্ধবন্দী এলো। এদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিল। তার দুগ্ধপোষ্য শিশুটি হারিয়ে গিয়েছিল। মাতৃস্নেহে সে এতই অস্থির হয়ে পড়েছিল যে, কোনো বাচ্চা সামনে দেখলেই তাকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরতো এবং নিজের বুকের দুধ তাকে পান করাতে থাকতো। তার এ অবস্থা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মনে করো এ মা তার নিজের বাচ্চাকে নিজের হাতে আগুনে ছুঁড়ে ফেলতে পারে ? আমরা জবাব দিলামঃ কখনোই নয়, তার নিজের ছুঁড়ে দেবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, বাচ্চা নিজেই যদি আগুনে পড়ে যায় তাহলে সে তাকে বাঁচাবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। তিনি বলেন ঃ

الله ارحم بعباده من هذه بولدها -

"এ মহিলা তার বাচ্চার প্রতি যে পরিমাণ অনুগ্রহশীল আল্লাহর অনুগ্রহ তাঁর বান্দার প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশি।"

আর এমন চিন্তা-ভাবনা করলে একথা সহজেই বুঝা যায়। আল্লাহই তো বাচ্চার লালন-পালনের জন্য মা-বাপের মনে স্নেহ-প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নয়তো আল্লাহ যদি এ স্নেহ-প্রীতি সৃষ্টি না করে দিতেন তাহলে বাচ্চাদের মা-বাপের চেয়ে বড় শত্রু আর হতো না। কারণ তারা মা-বাপের জন্য হয় সবচেয়ে বেশী কষ্টদায়ক। এখন যে আল্লাহ মাতৃ-পিতৃস্নেহের স্রষ্টা তার নিজের মধ্যে নিজের সৃষ্টির জন্য কি পরিমাণ স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা থাকবে–একথা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই আন্দাজ করতে পারে।[২২]

○

৪

আর রাহীমু ঃ اَلرَّحِيْمُ

অর্থ ঃ পরম দয়াময়, দয়া প্রদর্শনকারী।

ব্যাখ্যা ঃ আর তাঁর দয়াময় হওয়া এ নিশ্চিন্ততার জন্য যথেষ্ট যে, তাঁর জন্য যে ব্যক্তি সত্যের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার কাজে জীবন উৎসর্গ করবে তার প্রচেষ্টাকে তিনি কখনো নিষ্ফল হতে দেবেন না।[২৩]

○

আল্লাহ কি অপরূপ দয়া ও ক্ষমার আধার—যারা সত্যকে পরাজিত করার জন্য মিথ্যার তাণ্ডব সৃষ্টি করে তাদেরকেও তিনি অবকাশ দেন এবং তাদের অপরাধজনক কথাবার্তা শুনার সাথে সাথেই তাদের ওপর আযাব নাযিল করা আরম্ভ করেন না।[২৪]

○

বছরের পর বছর এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ধরে ঢিল দিতে থাকেন। চিন্তা করার, বুঝার ও সামলে নেবার সুযোগ দিয়ে যেতে থাকেন। সারা জীবনের সমস্ত নাফরমানী একটি মাত্র তাওবায় মাফ করে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন।[২৫]

○

তাঁর রাজ্যে কোনো ব্যক্তি বা দল তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও যদি পাকড়াও না হয়ে থাকে তাহলে এর কারণ এ নয় যে, এ দুনিয়ায় নৈরাজ্য চলছে এবং আল্লাহ এখানকার ক্ষমতাহীন রাজা। বরং এর কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ করুণাশীল এবং ক্ষমা করাই তাঁর অভ্যাস। পাপী ও অপরাধীকে অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই পাকড়াও করা, তার রিযিক বন্ধ করে দেয়া, তার শরীর অবশ করে দেয়া, মুহূর্তের মধ্যে তাকে মেরে ফেলা, সবকিছুই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে ; কিন্তু তিনি এমনটি করেন না। তাঁর করুণাগুণের দাবী অনুযায়ী তিনি এটি করেন। সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি নাফরমান বান্দাদেরকে ঢিল দিয়ে থাকেন। তাদেরকে আপন আচরণ শুধরে নেবার অবকাশ দেন এবং নাফরমানি থেকে বিরত হবার সাথে সাথেই মাফ করে দেন।[২৬]

○

এটা তাঁর উদারতা, দয়া ও ক্ষমাশীলতা যার কল্যাণে কুফর, শিরক ও নাস্তিকতা এবং পাপাচার ও চরম যুলুম-নির্যাতনে লিপ্ত বক্তিরাও বছরের পর বছর, এমনকি এ ধরনের পুরো এক একটা সমাজ শত শত বছর পর্যন্ত এক নাগাড়ে অবকাশ পেয়ে থাকে। তারা শুধু রিযিকই লাভ করে না, পৃথিবীতে তাদের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া পৃথিবীর এমন সব উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম দ্বারা তারা অনুগৃহীত হয় যা দেখে নির্বোধ লোকেরা এ ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হয় যে, হয়তো এ পৃথিবীর কোনো খোদা-ই নেই।[২৭]

○

সূরা হা-মীম আস সাজদার দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। "এটা পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত জিনিস।"

এ বাণী নাযিলকারী মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান (রহমান ও রাহীম) এ বাণী নাযিলকারী আল্লাহর আর সব গুণাবলীর পরিবর্তে 'রহমত' গুণটি এ সত্যের প্রতি ইংগিত করে যে, তিনি তাঁর দয়ার দাবী অনুসারে এ ব্যাণী নাযিল করেছেন। এর দ্বারা শ্রোতাদেরকে এ মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, কেউ যদি এ বাণীর প্রতি রুষ্ট হয় বা একে প্রত্যাখ্যান করে কিংবা ভ্রূকুঞ্চিত করে তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে নিজের সাথেই শত্রুতা করে। এটা বিরাট এক নিয়ামত যা আল্লাহ মানুষকে পথ প্রদর্শন এবং তার সাফল্য ও সৌভাগ্যের জন্য সরাসরি নাযিল করেছেন। আল্লাহ যদি মানুষের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন তাহলে তাদেরকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরার জন্য পরিত্যাগ করতেন এবং তারা কোনো গর্তে গিয়ে পতিত হবে তার কোনো পরোয়াই করতেন না। কিন্তু সৃষ্টি করা ও খাদ্য সরবরাহ করার সাথে সাথে তার জীবনকে সুন্দর করে গোছানোর জন্য জ্ঞানের আলো দান করাও তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন এবং সে কারণেই তাঁর এক বান্দার কাছে এ বাণী নাযিল করেছেন, এটা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ। সুতরাং যে ব্যক্তি এ রহমত দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অগ্রসর হয় তার চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ এবং নিজেই নিজের দুশমন আর কে হতে পারে ?[২৮]

○

বান্দাদের হেদায়াতের জন্য কুরআন মজীদ নাযিল করা সরাসরি আল্লাহর রহমত। যেহেতু তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি অতীব দয়াবান ; তাই তিনি তোমাদেরকে অন্ধকারে হাতড়ে মরার জন্য ছেড়ে দেয়া পসন্দ করেননি। তিনি তাঁর রহমতের দাবী অনুসারে এ কুরআন পাঠিয়ে তোমাদেরকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যার ওপরে পার্থিব জীবনে তোমাদের সত্যানুসরণ এবং আখেরাতের জীবনের সফলতা নির্ভরশীল।[২৯]

○

আল্লাহ তাআলা যেহেতু মানুষের স্রষ্টা, তাই স্রষ্টার দায়িত্ব হচ্ছে নিজের সৃষ্টিকে পথ প্রদর্শন করা এবং যে পথের মাধ্যমে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে সে পথ দেখানো। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের এ শিক্ষা নাযিল হওয়া শুধু তাঁর অনুগ্রহ পরায়ণতার দাবীই নয়, তাঁর স্রষ্টা হওয়ারও অনিবার্য এবং স্বাভাবিক দাবী। স্রষ্টা যদি সৃষ্টিকে পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আর কে তা করবে ? তাছাড়া স্রষ্টা নিজেই যদি পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আর কে তা করতে পারে ? স্রষ্টা যে বস্তু সৃষ্টি করলেন তিনি যদি তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করার পন্থা-পদ্ধতি না শেখান তাহলে তাঁর জন্য এর চেয়ে বড় ত্রুটি আর কি হতে পরে ? সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া কোনো আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। বরং তাঁর পক্ষ থেকে যদি এ ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে সেটাই হতো বিস্ময়কর ব্যাপার।[৩০]

○

কেউ আল্লাহর নাফরমানী যতই করে থাকুক না কেন যখনই সে এ আচরণ থেকে বিরত হয় তখনই আল্লাহ তার প্রতি নিজের রহমতের হাত বাড়িয়ে দেন। যেহেতু তিনি বান্দা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের কোনো ইচ্ছা আদৌ পোষণ করেন না তাই এমন হঠকারী তিনি নন যে, কোনো অবস্থায়ই তাকে ক্ষমা করবেন না বা শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না।[৩১]

○

তিনি প্রকৃত ও বাস্তব সত্যের বিপরীত পথে চলতে নিষেধ করেন। তাঁর এ আদেশ-নিষেধের অর্থ এ নয় যে, তোমরা সঠিক পথে চললে তাঁর লাভ এবং তোমরা ভুল পথে চললে তাঁর ক্ষতি। বরং এর আসল অর্থ হচ্ছে এই যে, সঠিক পথে চললে তোমাদের লাভ এবং ভুল পথে চললে

তোমাদের ক্ষতি। কাজেই তিনি তোমাদের সঠিক কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দেন। তার সাহায্যে তোমরা উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত হবার যোগ্যতা লাভ করতে পার। তিনি তোমাদের ভুল কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখেন। এর ফলে তোমরা নিম্ন পর্যায়ে নেমে যাওয়া থেকে রক্ষা পাও। এগুলো তাঁর করুণা ও মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমাদের রব কঠোরভাবে পাকড়াও করেন না। তোমাদের শাস্তি দেয়ার মধ্যে তাঁর কোনো আনন্দ নেই। তোমাদের পাকড়াও করার ও আঘাত দেবার জন্য তিনি ওঁৎ পেতে বসে নেই। তোমাদের সামান্য ভুল হলেই অমনি তিনি তোমাদের ওপর চড়াও হবেন তা নয়। আসলে নিজের সকল সৃষ্টির প্রতি তিনি বড়ই মেহেরবান। নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব পরিচালনার ব্যাপারে তিনি পরম দয়া, করুণা, অনুগ্রহ ও অনুকম্পার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। মানুষের ব্যাপারেও তিনি এ নীতিই অবলম্বন করেছেন। তাই তিনি একের পর এক তোমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে যেতে থাকেন। তোমরা নাফরমানী করে যেতে থাকো, গোনাহ করতে থাকো, অপরাধ করতে থাকো, তাঁর দেয়া জীবিকায় প্রতিপালিত হয়ে তাঁরই বিধান অমান্য করতে থাকো। কিন্তু তিনি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার আশ্রয় নেন এবং তোমাদের উপলব্ধি করার ও সংশোধিত হবার জন্য ছাড় ও অবকাশ দিয়ে যেতে থাকেন। অন্যথায় তিনি যদি কঠোরভাবে পাকড়াও করতেন, তাহলে তোমাদের এ দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্য একটি জাতির উত্থান ঘটানো অথবা সমগ্র মানব জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে আর একটি নতুন প্রজাতির জন্ম দেয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না।[৩২]

○

তিনি নিছক স্রষ্টা নন বরং নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি বড়ই করুণাশীল ও স্নেহময় এবং তার প্রয়োজন ও কল্যাণের জন্য তার চেয়ে বেশী তিনি চিন্তা করেন। মানুষ দুনিয়ায় অনবরত পরিশ্রম করতে পারে না। বরং প্রত্যেকবার কয়েক ঘণ্টা মেহনতের পর তাকে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে হয়। এভাবে আবার সে কয়েক ঘণ্টা মেহনত করার শক্তি পাবে। এ উদ্দেশ্যে মহাজ্ঞানী ও করুণাময় স্রষ্টা মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র ক্লান্তির অনুভূতি এবং কেবলমাত্র বিশ্রামের আকাংখা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি বরং 'নিদ্রা'র এমন একটি জবরদস্ত চাহিদা তার অস্তিত্বের মধ্যে রেখে দিয়েছেন যার ফলে তার ইচ্ছা ছাড়াই এমন কি তার বিরোধিতা সত্ত্বেও আপনা আপনিই কয়েক ঘণ্টার জাগরণ ও মেহনতের পর তা তাকে পাকড়াও করে, কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে তাকে বাধ্য করে এবং প্রয়োজন

শেষ হয়ে গেলে অপনা আপনিই তাকে ত্যাগ করে। এ নিদ্রার স্বরূপ ও অবস্থা এবং এর মৌল কারণগুলো আজো মানুষ অনুধাবন করতে পারেনি। এটি অবশ্যই জন্মগতভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এবং তার কাঠামোয় রেখে দেয়া হয়েছে। এটি যে যথাযথভাবে মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী হয়ে থাকে, এটা একথার সাক্ষ পেশ করার জন্য যথেষ্ট যে, এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় বরং কোনো মহাজ্ঞানী সত্তা একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে এ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। এর মধ্যে একটি বিরাট জ্ঞান, কল্যাণ ও উদ্দেশ্যমুখিতা পরিষ্কার সক্রিয় দেখা যায়। এছাড়াও এ নিদ্রা একথারও সাক্ষবহ যে, যিনি মানুষের মধ্যে এ বাধ্যতামূলক উদ্যোগ রেখে দিয়েছেন। তিনি নিজেই মানুষের জন্য তার চেয়ে বেশী কল্যাণকামী। অন্যথায় মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে নিদ্রার বিরোধিতা করে এবং জোরপূর্বক জেগে থেকে এবং অনবরত কাজ করে কেবল নিজের কর্মশক্তিই নয় জীবনী শক্তিও ক্ষয় করে।[৩৩]

○

৫

আল মালিকু : اَلْمَلِكُ। আল মালীকু : اَلْمَلِيْكُ।

অর্থ : রাজা, শাসক, সম্রাট।

ব্যাখ্যা : মূল আয়াতে الملك। শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ প্রকৃত বাদশাহ তিনিই। তাছাড়া শুধু الملك। শব্দ ব্যবহার করায় তার অর্থ দাঁড়ায় তিনি কোনো বিশেষ এলাকা বা নির্দিষ্ট কোনো রাজ্যের বাদশাহ নন, বরং সমগ্র বিশ্বজাহানের বাদশাহ। তাঁর ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্ব সমস্ত সৃষ্টিজগত জুড়ে পরিব্যাপ্ত। প্রতিটি বস্তুর তিনিই মালিক। প্রতিটি বস্তু তার ইখতিয়ার, ক্ষমতা এবং হুকুমের অধীন। তার কর্তৃত্ব তথা সার্বভৌম ক্ষমতাকে (Soverignty) সীমিত করার মত কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলার বাদশাহীর এ দিকগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে :

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ ○ الروم : ٢٦

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সব তাঁরই মালিকানাধীন। সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত।"–সূরা আর রূম : ২৬

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ـ السجدة : ٥

"আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সব কাজের ব্যবস্থাপনা তিনিই পরিচালনা করে থাকেন।"–সূরা আস সাজদা : ৫

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○ الحديد : ٥

"আসমান ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই সব বিষয় আল্লাহর দিকেই রুজু করা হবে।"–সূরা আল হাদীদ : ৫

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ ـ الفرقان : ٢

"বাদশাহী ও সার্বভৌমত্বে কেউ তাঁর অংশীদার নয়।"–সূরা ফুরকান : ২

بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ ـ يس : ٨٣

"সবকিছুর কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা তাঁরই হাতে।"–সূরা ইয়াসীন : ৮৩

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ○ ـ البروج : ١٦

"যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম।"–সূরা আল বুরূজ : ১৬

لَايُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ○ـ الانبياء : ٢٣

"তিনি যা করেন তার জন্য তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তবে অন্য সবাইকে তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হয়।"

–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২৩

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ط ـ الرعد : ٤١

"আল্লাহ ফায়সালা করেন। তাঁর ফায়সালা পুনর্বিবেচনাকারী কেউ নেই।"–সূরা আর রা'দ ঃ ৪১

وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ـ المؤمنون : ٨٨

"তিনিই আশ্রয় দান করেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না।"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৮৮

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ○

"বলো, হে আল্লাহ, বিশ্বজাহানের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দান করো আবার যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর। সমস্ত কল্যাণ তোমার আয়ত্তে। নিসন্দেহে তুমি সব বিষয়ে শক্তিমান।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬

এসব স্পষ্ট ঘোষণা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাআলার বাদশাহী সার্বভৌমত্ব কোনো সীমিত বা রূপক অর্থের বাদশাহী নয়, বরং সত্যিকার বাদশাহী যা সার্বভৌমত্বের পূর্ণাংগ অর্থ ও পূর্ণাংগ ধারণার মূর্তপ্রতীক। সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বুঝায় তার অস্তিত্ব বাস্তবে কোথাও থাকলে কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার বাদশাহীতেই আছে। তাঁকে ছাড়া আর যেখানেই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকার দাবী করা হয় তা কোনো বাদশাহ বা ডিক্টেটরের ব্যক্তিসত্তা কিংবা কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠী অথবা কোনো বংশ বা জাতি যাই হোক না কেন প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। কেননা যে ক্ষমতা অন্য কারো দান, যা এক সময় পাওয়া যায় এবং আবার এক সময় হাতছাড়া হয়ে যায়, অন্য কোনো শক্তির পক্ষ থেকে যা বিপদের আশংকা করে, যার প্রতিষ্ঠা ও টিকে থাকা সাময়িক এবং অন্য বহু প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গণ্ডি

সীমিত করে দেয় এমন সরকার বা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে আদৌ সার্বভৌম ক্ষমতা বলা হয় না।[৩৪]

○

তিনিই সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী ও যথার্থ রব। তাঁর বন্দেগীকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। আর অন্যান্য সকল মাবুদই আসলে পুরোপুরি অসত্য ও অর্থহীন। তাদেরকে যেসব গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক মনে করা হয়েছে সেগুলোর মূলত কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের ভরসায় যারা বেঁচে থাকে তারা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না।[৩৫]

○

(কিয়ামতের দিন) যে সমস্ত নকল রাজত্ব ও রাজ্যশাসন দুনিয়ায় মানুষকে প্রতারিত করে তা সবই খতম হয়ে যাবে। সেখানে কেবলমাত্র একটি রাজত্বই বাকি থাকবে এবং তা হবে এ বিশ্বজাহানের যথার্থ শাসনকর্তা আল্লাহর রাজত্ব। সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ ۚ لَايَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْئٌ ۗ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۗ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○ المؤمن : ١٦

"সেদিন যখন এরা সবাই প্রকাশিত হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে এদের কোনো জিনিস গোপন থাকবে না, জিজ্ঞেস করা হবে—আজ রাজত্ব কার ? সবদিক থেকে জবাব আসবে, একমাত্র আল্লাহর যিনি সবার ওপর বিজয়ী।"–সূরা মু'মিন ঃ ১৬

হাদীসে এ বিষয়বস্তুকে আরো বেশী স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ এক হাতে পৃথিবী ও অন্য হাতে আকাশ নিয়ে বলবেন ঃ

انا الملك، انا الديان، اين ملوك الارض ؟ اين الجبارون ؟ اين المتكبرون ؟

"আমিই বাদশাহ, আমিই শাসনকর্তা। এখন সেই পৃথিবীর বাদশাহরা কোথায় ? কোথায় স্বৈরাচারী একনায়কের দল ? অহংকারী ক্ষমতাদর্পীরা কোথায় ?"[৩৬]

○

এ গোটা বিশ্বজাহান তাঁরই সাম্রাজ্য। তিনি একে সৃষ্টি করে এবং একবার চালু করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনিই এর ওপর কার্যত সার্বক্ষণিক শাসন পরিচালনা করছেন। এ শাসন ও কর্তৃত্বে অন্য কারো আদৌ কোনো অংশ বা অধিকার নেই। এ বিশ্বজাহানের কোনো জায়গায় কেউ যদি সাময়িকভাবে সীমিত পর্যায়ে ক্ষমতা কিংবা মালিকানা অথবা শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে থাকে তাহলে তা তার নিজের শক্তিতে অর্জিত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার নয় বরং আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ও ইখতিয়ার। আল্লাহ যতদিন চান ততদিন তা তার অধিকারে থাকে এবং যখনই চান তা তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন।[৩৭]

○

সূরা আল কামারে বলা হয়েছে ঃ

فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ○ ـ القمر : ٥٥

"সত্যিকার মর্যাদার স্থানে মহাশক্তিধর সম্রাটের সান্নিধ্যে।"
–সূরা আল কামার ঃ ৫৫

সূরা আল বাকারায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط ـ البقرة : ١٠٧

"তুমি কি জানো না, পৃথিবী ও আকাশের শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর ?"–সূরা আল বাকারা ঃ ১০৭

সূরা আলে ইমরানে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ○

"আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের মালিক এবং তাঁর শক্তি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৯

সূরা আল মায়েদায় বলা হয়েছে ঃ

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ المائدة : ١٧، ١٨، ١٢٠

"আল্লাহ আকাশসমূহ ও এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১৭, ১৮, ১২০

সূরা আল আনআমে বলা হয়েছে ঃ

قَوْلُهُ الْحَقُّ ط وَلَهُ الْمُلْكُ ـ الانعام : ٧٤

"তাঁর কথা যথার্থ অকাট্য সত্য। আর যেদিন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে সেদিন রাজত্ব হবে একমাত্র তারই।"–সূরা আল আনআম ঃ ৭৪

সূরা আল আ'রাফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج -

"আমি তোমাদের জন্য সেই আল্লাহর রসূল হিসেবে এসেছি, যিনি পৃথিবী ও আকাশ জগতের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী।"

সূরা আত তাওবায় বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط - التوبة : ١١٦

"আর এও সত্য, আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১১৬

সূরা বনী ইসরাঈলে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ -

"আর বলো ঃ সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি কোনো পুত্রও গ্রহণ করেননি। তাঁর বাদশাহীতে কেউ শরীকও হয়নি।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১১

সূরা আল হাজ্জে বলা হয়েছে ঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ط - الحج : ٥٦

"সেদিন বাদশাহী হবে আল্লাহর এবং তিনি তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫৬

সূরা আন নূরে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج - النور : ٤٢

"আকাশ জগত ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই।"–সূরা আন নূর ঃ ৪২

সূরা আল ফুরকান ঃ ২ সূরা আস্ সাদ ঃ ১০, সূরা আয্ যুমার ঃ ৬, ৪৪; সূরা আশ্ শূরা ঃ ৪৯ সূরা আয্ যুখরুফ ঃ ৮৫, সূরা আল জাসিয়া ঃ ২৭, সূরা আল ফাতহ ঃ ১৪, সূরা আল হাদীদ ঃ ২-৫, সূরা আল বুরুজ ঃ ৯ আয়াতগুলোতে مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ উল্লেখ করা হয়েছে।। পক্ষান্তরে সূরা আল ফুরকানে وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ 'তাঁর বাদশাহীতে কেউ

শরীক নয়' বলা হয়েছে এবং এর ২৬নং আয়াতে রয়েছে اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ن الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ। 'সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে শুধুমাত্র দয়াময়ের।'

সূরা আল মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○ المؤمن : ١٦

"আজ রাজত্ব কার ? (সমস্ত সৃষ্টি বলে উঠবে) একমাত্র আল্লাহর যিনি কাহ্হার।"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১৬

সূরা আল মুল্‌কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ○ الملك : ١

"অত্যন্ত পবিত্র ও মহান তিনি, যার হাতে রয়েছে বিশ্বজাহানের রাজত্ব। আর তিনি প্রত্যেক জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।"

–সূরা আল মুলক ঃ ১

সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক তিনিই। গোটা বিশ্বজাহান তাঁর হুকুমেই চলছে।[৩৮]

○

সত্য যথাস্থানে সত্যই। যমীন ও আসমানের বাদশাহী দুনিয়ার তথাকথিত বাদশাহ, স্বৈরাচারী শাসক ও নেতাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। কোনো নবী, অলী, দেবী বা দেবতার তাতে কোনো অংশ নেই, আল্লাহ একাই তার মালিক।[৩৯]

○

এটা আল্লাহর বাদশাহী নিরংকুশ (Absolute) হওয়ার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। কোনো মানুষ, সে পার্থিব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় অধিকর্তাই সাজুক না কেন, কিংবা তাকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় মালিকই মনে করা হোক না কেন, অন্যদের সন্তান দেওয়ানো তো দূরের কথা নিজের জন্য নিজের ইচ্ছানুসারে সন্তান জন্ম দানেও সে কখনো সক্ষম হয়নি। আল্লাহ যাকে বন্ধ্যা করে দিয়েছেন সে কোনো ওষুধ, কোনো চিকিৎসা এবং কোনো তাবীজ কবজ দ্বারা সন্তান ওয়ালা হতে পারেনি। আল্লাহ যাকে শুধু কন্যা সন্তান দান করেছেন সে কোনোভাবেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করতে পারেনি এবং আল্লাহ যাকে শুধু পুত্র সন্তানই দিয়েছেন সে কোনোভাবেই একটি কন্যা সন্তান লাভ

করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে সবাই নিদারুণ অসহায় এমনকি সন্তান জন্মের পূর্বে কেউ এতটুকু পর্যন্ত জানতে পারেনি যে, মায়ের গর্ভে পুত্র সন্তান বেড়ে উঠেছে না কন্যা সন্তান। এসব দেখে শুনেও যদি কেউ খোদার খোদায়ীতে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সেজে বসে, কিংবা অন্য কাউকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে অংশীদার মনে করে তাহলে সেটা তার নিজের অদূরদর্শিতা যার পরিণাম সে নিঁজেই ভোগ করবে। কেউ নিজে নিজেই কোনো কিছু বিশ্বাস করে বসলে তাতে প্রকৃত সত্যে সামান্য কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না।[৪০]

○

খোদায়ীর ব্যাপারে কেউ তাঁর অংশীদার থাকবে এবং এই বিশাল বিশ্বজাহানের শাসন কর্তৃত্বে কারো দখল থাকবে এমন অবস্থা থেকে তাঁর মহান সত্তা অনেক উর্ধে। নবী হোক বা অলী, ফেরেশতা হোক বা জিন, কিংবা রূহ, তারকা হোক বা গ্রহ আসমানে ও যমীনে যারাই আছে সবাই তাঁর বান্দা, দাস ও নির্দেশের অনুগত। খোদায়ীর কোনো গুণে গুণান্বিত হওয়া কিংবা খোদায়ী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।[৪১]

○

তাঁর মালিকানা কর্তৃত্ব ও শাসন পরিচালনায় কারো এক বিন্দু পরিমাণও অংশ নেই।[৪২]

○

এ গোটা বিশ্বজাহান তাঁরই সাম্রাজ্য। তিনি একে সৃষ্টি করে এবং একবার চালু করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনিই এর ওপর কার্যত সার্বক্ষণিক শাসন পরিচালনা করছেন। এই শাসন ও কর্তৃত্বে অন্য কারো আদৌ কোনো অংশ বা অধিকার নেই। এ বিশ্বজাহানের কোনো জায়গায় কেউ যদি সাময়িকভাবে সীমিত পর্যায়ে ক্ষমতা কিংবা মালিকানা অথবা শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে থাকে তাহলে তা তার নিজের শক্তিতে অর্জিত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার নয় বরং আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ও ইখতিয়ার। আল্লাহ যতদিন চান ততদিন তা তার অধিকারে থাকে এবং যখনই চান তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন।[৪৩]

○

আল কুদ্দূসু ঃ اَلْقُدُّوْسُ

অর্থ ঃ পরম পবিত্র, সর্বতোভাবে নিখুঁত ও নিষ্কলুষ।

ব্যাখ্যা ঃ ইবারতে قــدوس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা আধিক্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর মূলধাতু قــدس ; قــدس অর্থ সবরকম মন্দ বৈশিষ্ট্য মুক্ত ও পবিত্র হওয়া। قدوس অর্থ হলো, আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তা কোনো প্রকার দোষ-ত্রুটি অথবা অপূর্ণতা কিংবা কোনো মন্দ বৈশিষ্ট্যের অনেক উর্ধে। বরং তা এক অতি পবিত্র সত্তা যার মন্দ হওয়ার ধারণাও করা যায় না। এখানে একথাটি ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, চরম পবিত্রতা প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের প্রাথমিক অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তরভুক্ত। যে সত্তা দুষ্ট, দুশ্চরিত্র এবং বদনিয়াত পোষণকারী, যার মধ্যে মানব চরিত্রের মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান এবং যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভে অধিনস্তরা কল্যাণ লাভের প্রত্যাশী হওয়ার পরিবর্তে অকল্যাণের ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে এমন সত্তা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে এটা মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি ও স্বভাব-প্রকৃতি মেনে নিতে অস্বীকার করে। এ কারণে মানুষ যাকেই সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলে স্বীকৃতি দেয় তার মধ্যে পবিত্রতা না থাকলেও তা আছে বলে ধরে নেয়। কারণ পবিত্রতা ছাড়া নিরংকুশ ক্ষমতা অকল্পনীয়। কিন্তু এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো চূড়ান্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি পবিত্র নয় এবং তা হতেও পারে না। ব্যক্তিগত বাদশাহী, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি, অন্য কোনো পদ্ধতির মানবীয় সরকার যাই হোক না কেন কোনো অবস্থায়ই তার সম্পর্কে চরম পবিত্রতার ধারণা করা যেতে পারে না।[৪৪]

○

তাঁর সিদ্ধান্তে ভুল-ত্রুটির কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে না। তিনি ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তা থেকে অনেক উর্ধে। তোমাদের বুঝ ও উপলব্ধিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে, কিন্তু তার সিদ্ধান্তে ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে না।[৪৫]

○

৭

আস্ সালামু ঃ اَلسَّلَامُ

অর্থ ঃ আপাদমস্তক শান্তি।

ব্যাখ্যা ঃ السلام শব্দের অর্থ শান্তি। কাউকে 'সুস্থ' ও 'নিরাপদ' না বলে 'নিরাপত্তা' বললে আপনা থেকেই তার মধ্যে আধিক্য অর্থ সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন কাউকে সুন্দর না বলে যদি সৌন্দর্য বলা হয় তাহলে তার অর্থ হবে সে আপাদমস্তক সৌন্দর্যমণ্ডিত। সুতরাং আল্লাহ তাআলাকে السلام বলার অর্থ তার গোটা সত্তাই পুরোপুরি শান্তি। কোনো বিপদ, কোনো দুর্বলতা কিংবা অপূর্ণতা স্পর্শ করা অথবা তাঁর পূর্ণতায় কোনো সময় ভাটা পড়া থেকে তিনি অনেক উর্ধে।[৪৬]

○

আল মু'মিনু ঃ اَلْمُؤْمِنُ

অর্থ ঃ নিরাপত্তাদাতা।

ব্যাখ্যা ঃ المــؤمن শব্দটির মূল ধাতু হলো امن ; امن অর্থ ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ হওয়া। তিনিই মু'মিন যিনি অন্যকে নিরাপত্তা দান করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে নিরাপত্তা দান করেন তাই তাঁকে মু'মিন বলা হয়েছে। তিনি কোনো সময় তাঁর সৃষ্টির ওপর যুলুম করবেন, কিংবা তার অধিকার নস্যাত করবেন কিংবা তার পুরস্কার নষ্ট করবেন অথবা তার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন এ ভয় থেকে তার সৃষ্টি পুরোপুরি নিরাপদ। আর কর্তার কোনো কর্ম অর্থাৎ তিনি কাকে নিরাপত্তা দেবেন তা যেহেতু উল্লেখিত হয়নি বরং শুধু المؤمن বা নিরাপত্তা দানকারী বলা হয়েছে তাই আপনা থেকে এর অর্থ দাঁড়ায় গোটা বিশ্বজাহান ও তার সমস্ত জিনিসের জন্য তাঁর নিরাপত্তা।[৪৭]

○

(৯)

আল মুহাইমিনু ঃ اَلْمُهَيْمِنُ

অর্থ ঃ তত্ত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক।

ব্যাখ্যা ঃ اَلْمُـهَـيْـمِنُ শব্দটির তিনটি অর্থ হয়। এক, তত্ত্বাবধান ও হিফাযতকারী। দুই, পর্যবেক্ষণকারী, কে কি করছে তা যিনি দেখছেন। তিন, সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপক, যিনি মানুষের সমস্ত প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এখানেও যেহেতু শুধু المـهـيـمن শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এ কর্তার কোনো কর্ম নির্দেশ করা হয়নি। অর্থাৎ তিনি কার তত্ত্বাবধানকারী ও সংরক্ষক, কার পর্যবেক্ষক এবং কার দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা বলা হয়নি। তাই শব্দের এ ধরনের প্রয়োগ থেকে স্বতঃই যা অর্থ দাঁড়ায় তা হলো তিনি সমস্ত সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করেছেন, সবার কাজকর্ম দেখছেন এবং বিশ্বজাহানের সমস্ত সৃষ্টির দেখাশোনা, লালন-পালন এবং অভাব ও প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।[৪৮]

○

আল আযীযু ঃ اَلْعَزِيْزُ

অর্থ ঃ সবার ওপর বিজয়ী, পরাক্রান্ত, অত্যন্ত প্রতাপশালী ও পরাক্রমশালী।

ব্যাখ্যা ঃ 'আযীয' শব্দের মূল অক্ষর ع ز ز আরবী ভাষায় 'ইয্যত' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সাধারণত ইয্যত শব্দটি বললে মান, মর্যাদা, সম্মান ইত্যাদি বুঝানো হয় ; কিন্তু আরবীতে 'ইয্যত' শব্দের অর্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির মর্যাদা এতই উন্নত ও সংরক্ষিত হয়ে যাওয়া যার ফলে কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। অন্য কথায় 'ইয্যত' শব্দটির অর্থে বলা যায়, যার মর্যাদা বিনষ্ট করার ক্ষমতা কারো নেই।[৪৯]

○

সূরা আন নিসায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا 'সমস্ত মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৩৯

আরবী ভাষায় 'ইয্যত' মানে হচ্ছে কোনো ব্যক্তির এত বেশী শক্তিশালী ও জবরদস্ত হয়ে যাওয়া যার ফলে তার গায়ে কেউ হাত দিতে না পারে।[৫০]

○

العزيز। অর্থ এমন এক পরাক্রমশালী সত্তা যার মোকাবিলায় অন্য কেউ মাথা তুলতে পারে না, সিদ্ধান্তসমূহের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর সাধ্য কারো নেই এবং যার মোকাবিলায় সবাই অসহায় ও শক্তিহীন।[৫১]

○

বিশ্বজাহানে এমন কোনো শক্তি নেই যা তাঁর ইচ্ছার পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়নে বাধা দিতে পারে। প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর অধীন এবং তাঁর মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারো নেই।[৫২]

○

সবার ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও পূর্ণ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁর সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার পথে কেউ বাধা দিতে পারে না।[৫৩]

○

পরাক্রমশালী, শক্তিমান ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী যার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পৃথিবীর কোনো শক্তিই রোধ করতে পারে না, যার সাথে টক্কর নেয়ার সাধ্য কারো নেই, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যার আনুগত্য সবাইকে করতে হয়, যার আদেশ অমান্যকারী কোনোভাবেই তার পাকড়াও থেকে রক্ষা পায় না।[৫৪]

○

তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে কেউ বিজয়ী হতে পারে না। কিংবা কেউ তাঁর পাকড়াও থেকেও বাঁচতে পারে না। তাই তাঁর নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেউ যদি সফলতার আশা করে এবং তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে তাঁকে পরাভূত ও অবদমিত দেখানোর আশা করে, তাহলে তা তার নিজের বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের আশা কখনো পূরণ হতে পারে না।[৫৫]

○

মহান আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না এবং এ বিশ্বজাহানে এমন কোনো শক্তিই নেই যে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যাপারে তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই ঈমান ও সৎকাজের বিনিময়ে আল্লাহ যা কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা কারো না পাওয়ার আশংকা নেই।[৫৬]

○

তাঁর দান ও পুরস্কারের এই ব্যবস্থা নিজের শক্তিতেই চলছে। কারো ক্ষমতা নেই তা পরিবর্তন করতে পারে বা জোরপূর্বক তাঁর নিকট থেকে কিছু নিতে পারে কিংবা কাউকে দান করার ব্যাপারে তাকে বিরত রাখতে পারে।[৫৭]

○

অর্থাৎ তিনি এমন শক্তিধর যে, যদি কাউকে শাস্তি দিতে চান, তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই ধ্বংস করে দেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও শাস্তি দেবার ব্যাপারে তিনি কখনো তাড়াহুড়ো করেন না, এটা তাঁর দয়ার মূর্ত প্রকাশ। বছরের পর বছর এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ধরে ঢিল দিতে থাকেন। চিন্তা করার, বুঝার ও সামলে নেবার সুযোগ দিয়ে যেতে থাকেন। সারা জীবনের সমস্ত নাফরমানী একটি মাত্র তাওবায় মাফ করে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন।[৫৮]

○

তোমরা নিজেদের শক্তিতে এ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছো না। তোমাদেরকে এখান থেকে বিদায় দেবার এবং তার জায়গায় অন্য কোনো জাতিকে এনে বসাবার জন্য তাঁর একটি ইশারাই যথেষ্ট। কাজেই নিজের মর্যাদা অনুধাবন করো এবং এমন নীতি অবলম্বন করো না যার ফলে শেষ পর্যন্ত জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে থাকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন কারো ধ্বংসের ফায়সালা এসে যায় তখন সমগ্র বিশ্বজাহানে এমন কোনো শক্তি নেই যে তাঁর হাত টেনে ধরতে পারে এবং ফায়সালা কার্যকর হবার পথ রোধ করতে সক্ষম হয়।[৫৯]

○

তিনি সবার ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী, আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং বিশ্বজাহানের সমস্ত জিনিস তাঁর মালিকানাধীন। তাঁকে বাদ দিয়ে এ বিশ্বজাহানে যেসব সত্তাকে তোমরা মাবুদ বানিয়ে রেখেছো তাদের মধ্যে কোনো একটি সত্তাও এমন নেই, যে তাঁর অধীন ও গোলাম নয়। এসব কর্তৃত্বাধীন ও গোলাম সত্তা সেই সর্বময় কর্তৃত্বকারী ও প্রাধান্যবিস্তারকারী সত্তার কর্তৃত্বে শরীক হতে পারে কেমন করে ? কোন্ অধিকারে এদেরকে মাবুদ ও উপাস্য গণ্য করা যেতে পারে।[৬০]

○

কুরআন মজীদের অতি অল্পসংখ্যক স্থানে আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম عزيز (মহাপরাক্রমশালী) এর সাথে قوى (নিরংকুশ শক্তির অধিকারী), مقتدر (ক্ষমতাধর), جبار (আপন নির্দেশাবলী বাস্তবায়নকারী) এবং ذوانتقام (প্রতিশোধ গ্রহণকারী) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে যার সাহায্যে তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। যেখানে বাক্যের ধারাবাহিকতা যালেম ও অবাধ্যদের জন্য আল্লাহর আযাবের ভীতি প্রদর্শন দাবী করে কেবল সেখানেই এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের হাতে গোণা কতিপয় স্থান বাদ দিলে আর যেখানেই عزيز শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই তার সাথে সাথে حكيم (অতিশয় বিজ্ঞ), عليم (সর্বজ্ঞাতা), رحيم (দয়ালু, নিয়ামতদানকারী), غفور (ক্ষমাশীল) وهاب (সার্বক্ষণিক দানকারী) এবং حميد (প্রশংসিত) শব্দগুলোর মধ্য থেকে কোনো শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করা হয়েছে কারণ, যে সত্তা অসীম ক্ষমতার অধিকারী, সে যদি নির্বোধ হয়, মূর্খ হয়, দয়া মায়াহীন হয়, ক্ষমা ও মার্জনা আদৌ না জানে, কৃপণ হয় এবং দুশ্চরিত্র হয় তাহলে তার ক্ষমতার পরিণাম যুলুম নির্যাতন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। পৃথিবীতে যেখানেই যুলুম নির্যাতন হচ্ছে তার

মূল কারণ এই যে, যে ব্যক্তি অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে সে তার শক্তি ও ক্ষমতাকে হয় মূর্খতার সাথে ব্যবহার করছে, নয়তো সে দয়ামায়াহীন, কঠোর হৃদয় অথবা কৃপণ ও সংকীর্ণমনা কিংবা দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্মশীল। যে ক্ষেত্রেই শক্তির সাথে এসব দোষ একত্রিত হবে সে ক্ষেত্রে কোনো কল্যাণের আশা করা যায় না। এ কারণে কুরআন মজীদে আল্লাহর গুণবাচক নাম عزيز -এর সাথে তাঁর حكيم، عليم، رحيم، غفور، حميد ও وهاب হওয়ার কথাও অবশ্যই উল্লেখ করা হয়েছে যাতে মানুষ জানতে পারে, যে আল্লাহ্ এ বিশ্বজাহান শাসন ও পরিচালনা করছেন একদিকে তিনি এমন ক্ষমতার অধিকারী যে, যমীন থেকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা দিতে পারে না, অপর দিকে তিনি حكيم বা (মহাজ্ঞানী)ও বটে। তাঁর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সরাসরি জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। তিনি رحيم -ও। যে ফায়সালাই তিনি করেন জ্ঞান অনুসারেই করেন। তিনি غفور -ও। নিজের অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে নির্দয়ভাবে ব্যবহার করেন না। তিনি غفور -ও। অধীনস্তদের সাথে ছিদ্রান্বেষণ বা খুঁত ধরা মানসিকতার নয়, বরং ক্ষমাশীলতার আচরণ করে থাকেন। তিনি وهاب -ও। নিজের অধীনস্তদের সাথে কৃপণতার আচরণ করেন না। বরং চরম দানশীলতা ও বদান্যতার আচরণ করছেন। এবং তিনি حميد -ও। তাঁর সত্তায় প্রশংসার যোগ্য সমস্ত গুণাবলী ও পূর্ণতার সমাহার ঘটেছে।

যারা সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) ওপর রাষ্ট্র দর্শন ও আইন দর্শনের আলোচনা সম্পর্কে অবহিত, তারা কুরআনের এ বক্তব্যের প্রকৃত গুরুত্বকে ভালভাবে বুঝতে পারবেন। সার্বভৌমত্ব বলতে বুঝায়, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি, অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক হবে। তার আদেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টিকারী, তা পরিবর্তনকারী বা পুনর্বিবেচনাকারী কোনো আভ্যন্তরীণ বা বাইরের শক্তি থাকবে না এবং তার আনুগত্য করা ছাড়া কারো কোনো উপায়ও থাকবে না। এ অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ধারণার সাথে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অনিবার্যরূপেই দাবী করে যে, যিনি এ ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন তাকে নিষ্কলুষ এবং জ্ঞান-বুদ্ধিতে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। কারণ, এরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোক নির্বোধ, মূর্খ, দয়ামায়াহীন এবং দুশ্চরিত্র হলে তার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সর্বাত্মক যুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এ কারণে যেসব দার্শনিক কোনো মানুষ বা মানবীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা কোনো একদল মানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী

বলে মনে করেছে তাদেরকে একথাও ধরে নিতে হয়েছে যে, তারা ভুল ক্রুটির উর্ধে হবে। কিন্তু একথা স্পষ্ট, যে কোনো মানবীয় কর্তৃত্ব বাস্তবে যেমন কখনো এরূপ নিরঙ্কুশ ও সীমাহীন সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করতে পারে না তেমনি কোনো বাদশাহ্ বা পার্লামেন্ট, জাতি কিংবা পার্টি সীমিত পরিসরে যে সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে থাকে তা নির্ভুল পন্থায় কাজে লাগানোও তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এমন যুক্তিবুদ্ধি যার মধ্যে অজ্ঞতার লেশমাত্র নেই এবং এমন জ্ঞান যা সংশ্লিষ্ট সব সত্যকে পরিব্যাপ্ত করে— কোনো একজন মানুষ, একক কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো জাতির ভাগ্যে জুটে যাওয়া তো দূরের কথা, সম্মিলিতভাবে গোটা মানব জাতিও লাভ করেনি। অনুরূপভাবে মানুষ যতক্ষণ মানুষ, ততক্ষণ তার পক্ষে নিজের স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ভয়ভীতি, লোভ-লালসা, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা, পক্ষপাতিত্ব, আবেগ তাড়িত সন্তুষ্টি ও ক্রোধ এবং ভালবাসা ও ঘৃণা করা থেকে উর্ধে উঠাও সম্ভবপর নয়। এসব সত্যকে সামনে রেখে কেউ যদি গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে সে উপলব্ধি করবে যে, এ বক্তব্যের মধ্যে কুরআন প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেশ করছে। কুরআন বলছে ঃ عـزيز এ বিশ্বজাহানে অর্থাৎ নিরংকুশ ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ নেই। আর কেবল তিনিই সীমাহীন এ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র সত্তা যিনি 'নিষ্কলুষ' 'হাকীম' ও 'আলীম' 'রহীম' ও 'গাফুর' এবং 'হামীদ' ও 'ওয়াহহাব'।[৬১]

○

(১১)

আল জাব্বারু : اَلْجَبَّارُ

অর্থ : নিজের হুকুম শক্তি প্রয়োগে বাস্তবায়নকারী।

ব্যাখ্যা : এর শব্দমূল বা ধাতু হলো جبر। جبر শব্দের অর্থ কোনো বস্তুকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ঠিক করা, কোনো জিনিসকে শক্তি দ্বারা সংশোধন করা। যদিও আরবী ভাষায় جبر শব্দটির কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু সংশোধন অর্থে এবং কোনো কোনো সময় শুধু জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হলো, সংস্কার ও সংশোধনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে جبار (জাব্বার) বলার অর্থ হলো বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তিনি সৃষ্ট বিশ্বজাহানের শৃংখলা রক্ষাকারী এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নকারী, যদিও তাঁর ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়াও جبار শব্দটির মধ্যে বড়ত্ব ও মহত্ত্ববোধক অর্থও বিদ্যমান। খেজুরের যে গাছ অত্যন্ত উঁচু হওয়ার কারণে তার ফল সংগ্রহ করা কারো জন্য সহজ সাধ্য নয় আরবী ভাষায় তাকে জাব্বার বলে। অনুরূপ যে কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও জাঁকজমকপূর্ণ তাকে জাব্বার বা অতি বড় কাজ বলা হয়।[৬২]

○

১২

আল মুতাকাব্বিরু ঃ اَلْمُتَكَبِّرُ

অর্থ ঃ বাস্তবিক পক্ষে বড়ত্ব ও মহত্বের অধিকারী।

ব্যাখ্যা ঃ এ শব্দটির দুটি অর্থ। এক, যে প্রকৃতপক্ষে বড় নয়, কিন্তু খামাখা বড়ত্ব জাহির করে। দুই, যে প্রকৃতপক্ষেই বড় এবং বড় হয়েই থাকে। মানুষ হোক, শয়তান হোক বা অন্য কোনো মাখলুক হোক, যেহেতু প্রকৃতপক্ষে তার কোনো বড়ত্ব-মহত্ব নেই, তাই নিজেকে নিজে বড় মনে করা এবং অন্যদের কাছে নিজের বড়ত্ব ও মহত্ব জাহির করা একটা মিথ্যা দাবী ও জঘন্য দোষ। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতই বড়, বড়ত্ব বাস্তবে তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট এবং বিশ্বজাহানের সব বস্তু তাঁর সমানে ক্ষুদ্র ও নগণ্য। তাই তাঁর বড় হওয়া এবং বড় হয়ে থাকা নিছক কোনো দাবী বা ভান নয়। বরং একটি বাস্তবতা। এটি কোনো খারাপ বা মন্দ বৈশিষ্ট্য নয়, বরং একটি গুণ ও সৌন্দর্য যা তাঁর ছাড়া আর কারো মধ্যে নেই।[৬৩]

○

(১৩)

আল খালিকু ঃ اَلْخَالِقُ

অর্থ ঃ সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী।

ব্যাখ্যা ঃ সারা দুনিয়ার এবং দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু সৃষ্টির প্রাথমিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তার নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে অস্তিত্ব লাভ করা পর্যন্ত পুরোপুরি তাঁরই তৈরি ও লালিতপালিত। কোনো কিছুই আপনা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়ে যায়নি অথবা তার নির্মাণ ও পরিপাটি করণে অন্য কারো সামান্যতম অবদানও নেই। এখানে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকর্মকে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায় বা স্তরে বর্ণনা করা হয়েছে যা ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রথম পর্যায়টি হলো সৃষ্টি অর্থাৎ পরিকল্পনা করা। এর উদারহণ হলো, কোনো ইঞ্জিনিয়ার কোনো ইমারত নির্মাণের পূর্বে যেমন মনে মনে স্থির করে যে, অমুক বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে এরূপ ও এরূপ একটি ইমারত নির্মাণ করতে হবে। সে তখন মনে মনে তার নমুনা বা ডিজাইন (Design) চিন্তা করতে থাকে। এ উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ইমারতের বিস্তারিত ও সামগ্রিক কাঠামো কি হবে এ পর্যায়ে সে তা ঠিক করে নেয়।[৬৪]

○

সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যতগুলো মানুষ জন্ম নিয়েছে এবং আগামীতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম নেবে তাদের সবাইকে তিনি আবার মাত্র এক মুহূর্তেই সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা একটি মানুষের সৃষ্টিতে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ে না যে, সে একই সময়ে অন্য মানুষদের সৃষ্টি করতে অপারগ হয়ে পড়েন। একজন মানুষ সৃষ্টি করা বা কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করা দুডটাই তাঁর জন্য সমান।[৬৫]

○

দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিস তাঁরই নির্মাণ কৌশলে নির্মিত হয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনিই আকার-আকৃতি, গঠনশৈলী, শক্তি, যোগ্যতা, গুণ ও বিশেষত্ব দান করেছেন। দুনিয়ায় কাজ করার জন্য হাতের যে গঠনাকৃতির প্রয়োজন ছিল তা তিনি তাকে দিয়েছেন। পায়ের জন্য যে সর্বাধিক উপযুক্ত গঠনাকৃতির দরকার তা তাকে দিয়েছেন। মানুষ, পশু,

উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, বাতাস, পানি, আলো, প্রত্যেককে তিনি এমন বিশেষ আকৃতি দান করেছেন যা এ বিশ্বজাহানে তার নিজের অংশের কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন ছিল।[৬৬]

○

অন্য কথায় বলতে গেলে আল্লাহ বিশ্বজাহানের প্রত্যেকটি জিনিসের কেবল অস্তিত্বই দান করেননি বরং তিনিই প্রত্যেকটি জিনিসকে তার সত্তার সাথে সম্পর্কিত আকার-আকৃতি, দেহ সৌষ্ঠব, শক্তি, যোগ্যতা, গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, কাজ ও কাজের পদ্ধতি, স্থায়িত্বের সময়-কাল, উত্থান ও ক্রমবিকাশের সীমা এবং অন্যান্য যাবতীয় বিস্তারিত বিষয় নির্ধারণ করেছেন। তারপর যেসব কার্যকারণ, উপায়-উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধার বদৌলতে প্রত্যেকটি জিনিস এখানে নিজ পরিসরে নিজের ওপর আরোপিত কাজ করে যাচ্ছে তা বিশ্বজগতকে তিনিই সৃষ্টি করে দিয়েছেন।[৬৭]

○

তারপর তোমাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে একটি সর্বোত্তম দেহ-কাঠামো, উপযুক্ত অংগ-প্রত্যংগ এবং উন্নত দৈহিক ও চিন্তাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ সরল সোজা দেহ কাঠামো, হাত পা, চোখ নাক এবং কান, বাকশক্তি সম্পন্ন এ জিহ্বা এবং সর্বোত্তম যোগ্যতা ভাণ্ডার এ মস্তিষ্ক তোমরা নিজে তৈরি করে আননি, তোমাদের বাবা-মাও তৈরি করেনি, কোনো নবী, অলী কিংবা দেবতার মধ্যেও তা তৈরি করার ক্ষমতা ছিল না। এসব যোগ্যতা ও ক্ষমতার সৃষ্টিকারী ছিলেন সে মহাজ্ঞানী দয়ালু ও সর্বশক্তিমান সত্তা যিনি মানুষকে সৃষ্টি করার সময় পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তাকে এ নজীরবিহীন দেহ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।[৬৮]

○

যদিও তোমাদের বাকশক্তি সমান নয়, মুখ ও জিহ্বার গঠনেও কোনো ফারাক নেই এবং মস্তিষ্কের গঠনাকৃতিও একই রূপ তবুও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তোমাদের ভাষা বিভিন্ন হয়ে গেছে। তারপর একই ভাষায় যারা কথা বলে তাদের বিভিন্ন শহর ও জনপদের ভাষাও আলাদা। আবার আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির বলার রীতি, শব্দের উচ্চারণ এবং আলাপ-আলোচনার পদ্ধতি আলাদা। অনুরূপভাবে তোমাদের সৃষ্টি উপাদান এবং তোমাদের গঠনসূত্র একই। কিন্তু তোমাদের বর্ণ এত বেশি

বিভিন্ন যে, একেক জাতির কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু একই বাপ-মায়ের দুটি সন্তানের বর্ণও সম্পূর্ণ একই হয় না। এখানে নমুনা হিসেবে কেবলমাত্র দুটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু এদিক দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে দেখুন, দুনিয়ায় সকল দিকেই আপনি এত বেশি বৈচিত্র (VARAITY) দেখতে পাবেন না, তাদের সবগুলোকে একত্র করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। মানুষ, পশু, উদ্ভিদ এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসের যে কোনো একটি শ্রেণীকে নেয়া হোক, দেখা যাবে তাদের প্রতিটি এককের মধ্যে মৌলিক একাত্মতা সত্ত্বেও অসংখ্য বিভিন্নতা বিরাজ করছে। এমন কি কোনো এক শ্রেণীর একটি এককও অন্য একটি এককের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল নয়। এমন কি একটি গাছের দুটি পাতার মধ্যেও পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। এ জিনিসটি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ দুনিয়ায় এমন কোনো কারখানা নেই যেখানে স্বয়ংক্রিয় মেশিনপত্র চলছে এবং বিপুল উৎপাদনের (Massproduction) পদ্ধতিতে সব রকমের জিনিসের এক একটি ছাঁচ থেকে ঢালাই হয়ে একই ধরনের জিনিস বের হয়ে আসছে। বরং এখানে এমন একজন জবরদস্ত কারিগর কাজ করছে যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে পূর্ণ ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগ সহকারে একটি নতুন ডিজাইনে, নতুন নকশায় ও কারুকাজে, নতুন সৌষ্ঠবে এবং নতুন গুণাবলী সহকারে তৈরি করেন। তাঁর তৈরি করা প্রত্যেকটি জিনিস স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর উদ্ভাবন ক্ষমতা সবসময় সব জিনিসের একটি নতুন মডেল বের করে চলছে। তাঁর শিল্পকারিতা একটি ডিজাইনকে দ্বিতীয়বার সামনে নিয়ে আসাকে নিজের পূর্ণতার জন্য অবমাননাকর মনে করে। যে ব্যক্তিই এ বিস্ময়কর দৃশ্য চোখ মেলে দেখবে সে কখনো এ ধরনের মূর্খতা সুলভ ধারণা পোষণ করতে পারে না যে, এ বিশ্বজাহানের স্রষ্টা একবার এ কারখানাটি চালিয়ে দিয়ে তারপর নিজে কোথাও গিয়ে ঘুমাচ্ছেন, তিনি যে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি করে যাচ্ছেন এবং নিজের সৃষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর ব্যক্তিগত দৃষ্টি দিচ্ছেন, এতো একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ।[৬৭]

○

বিশ্বজগতের প্রতিটি জিনিসের অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করা, একটি অপরিবর্তনীয় নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং অসংখ্য শক্তির পরম সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য সহকারে কাজ করা।এগুলো নিজের অভ্যন্তরে এমন বহু নিদর্শন রাখে যা থেকে জানা যায় যে, এ সমগ্র বিশ্বজাহানকে মাত্র একজন স্রষ্টাই অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তিনিই এ বিশাল ব্যবস্থা

পরিচালনা করছেন। একদিকে যদি একথা চিন্তা করা যায় যে, এ প্রাথমিক শক্তি (Energy) কোথা থেকে এসে বস্তুর আকার ধারণ করেছে ? বস্তুর এ বিভিন্ন উপাদান কেমন করে গঠিত হয়েছে এ উপাদানগুলোকে এহেন বৈজ্ঞানিক কৌশলে সংমিশ্রিত করে বিস্ময়কর সামঞ্জস্য সহকারে এ অত্যদ্ভূত বিশ্বব্যবস্থা গঠিত হয়েছে কেমন করে ? এখন কোটি কোটি বছর ধরে একটি মহাপরাক্রমশালী প্রাকৃতিক আইনের আওতাধীনে এ ব্যবস্থাটি কিভাবে চলছে ? এ অবস্থায় প্রত্যেক নিরপেক্ষ বুদ্ধিবৃত্তি এ সিদ্ধান্তে পৌছুবে যে, এসব কিছু একজন সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানীর প্রবল ইচ্ছাশক্তি ছাড়া নিছক ঘটনাক্রমে বা অকস্মাৎ ঘটতে পারে না। আবার অন্যদিকে যদি দেখা যায় যে, পৃথিবী থেকে নিয়ে বিশ্বজাহানের দূরবর্তী নক্ষত্রগুলো পর্যন্ত সবাই একই ধরনের উপাদানে গঠিত এবং একই প্রাকৃতিক আইনের নিয়ন্ত্রণে তারা চলছে, তাহলে হঠকারিতামুক্ত প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তিই নিসন্দেহে একথা স্বীকার করবে যে, এ সবকিছু বহু ইলাহর কর্মকুশলতা নয় বরং একজন ইলাহ এ সমগ্র বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক।[৭০]

○

আল্লাহ এ বিশ্বজাহানে মানুষকে সর্বোত্তম আকার আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আকার আকৃতি অর্থ শুধু মানুষের চেহারা নয়। বরং এর অর্থ তার গোটা দৈহিক কাঠামো এবং দুনিয়াতে কাজ করার জন্য তাকে দেয়া সবরকম শক্তি ও যোগ্যতাও এর অন্তরভুক্ত। এ দুটি দিক দিয়ে মানুষকে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ কারণেই সে পৃথিবী ও তার আশেপাশের সমস্ত সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার যোগ্য হয়েছে। তাকে দীর্ঘ দেহ কাঠামো দেয়া হয়েছে, চলাফেরার জন্য উপযুক্ত পা দেয়া হয়েছে এবং কাজ-কর্ম করার জন্য উপযুক্ত হাত দেয়া হয়েছে। তাকে এমন সব ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান আহরণ যন্ত্র দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সেসব রকম তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। তাকে চিন্তা-ভাবনা করার, বুঝার এবং বিভিন্ন তথ্য একত্র করে তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত উন্নত পর্যায়ের একটি মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তি দেয়া হয়েছে। তাকে একটি নৈতিক বোধ ও অনুভূতি এবং ভালমন্দ ও ভুল-শুদ্ধ নিরূপক শক্তি দেয়া হয়েছে। তাকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শক্তি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে নিজেই তার চলার পথ বেছে নেয় এবং কোন্ পথে সে তার চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করবে আর কোন্ পথে করবে না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাকে এতটা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে তার স্রষ্টাকে মানতে এবং তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব করতে পারে, কিংবা তাঁকে

অস্বীকার করতে পারে, কিংবা যাদেরকে ইচ্ছা সে তার খোদা বানিয়ে নিতে পারে অথবা যাকে সে খোদা বলে স্বীকার করে, ইচ্ছা করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করতে পারে। এসব শক্তি এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। আর কার্যত সে এ ক্ষমতা প্রয়োগও করছে।[৭১]

○

স্রষ্টা যদি সৃষ্টিকে পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আর কে তা করবে ? তাছাড়া স্রষ্টা নিজেই যদি পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আর কে তা করতে পারে ? স্রষ্টা যে বস্তু সৃষ্টি করলেন তিনি যদি তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করার পন্থা-পদ্ধতি না শেখান তাহলে তাঁর জন্য এর চেয়ে বড় ক্রটি আর কি হতে পারে ? সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া কোনো আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। বরং তাঁর পক্ষ থেকে যদি এ ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে সেটাই হতো বিস্ময়কর ব্যাপার। গোটা সৃষ্টিলোকে যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন তা কেবল সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি। তাকে এমন উপযুক্ত আকার-আকৃতি দিয়েছেন যার সাহায্যে সে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অধীনে তার নিজের অংশের কাজ করার যোগ্য হতে পারে। সাথে সাথে সে কাজ সম্পাদন করার পন্থা পদ্ধতিও তাকে শিখিয়েছেন। মানুষের নিজের দেহের এক একটি লোম এবং এক একটি কোষকে (Cell) মানবদেহে যে কাজ আঞ্জাম দিতে হবে সে কাজ শিখেই তা জন্ম লাভ করেছে। তাই মানুষ নিজে কেমন করে তার স্রষ্টার শিক্ষা ও পথনির্দেশ লাভ করা থেকে মুক্ত ও বঞ্চিত হতে পারে ? এ বিষয়টি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বুঝানো হয়েছে। সূরা আল লাইলে (১২ আয়াতে) বলা হয়েছে ঃ انَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى "নিসন্দেহে পথ প্রদর্শন করা আমার দায়িত্ব।" সূরা আন নাহ্লে (৯ আয়াত) বলা হয়েছে ঃ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ "সরল সোজা পথ দেখিয়ে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব। বাঁকা পথের সংখ্যা তো অনেক।" সূরা ত্বা-হায় (৪৭-৫০ আয়াত) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফেরাউন মূসার মুখে রিসালাতের পয়গাম শুনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ "তোমার সেই 'রব' কে যে আমার কাছে দূত পাঠায় ?" জবাবে হযরত মূসা বললেন ঃ

رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى -

"তিনিই আমার রব যিনি প্রতিটি জিনিসকে একটি নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি দান করে পথ প্রদর্শন করেছেন।"

অর্থাৎ তিনি তাকে সেই নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়েছেন যার সাহায্যে সে বস্তু জগতে তার করণীয় কাজ সম্পাদন করতে পারবে। মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবসমূহ আসা যে সরাসরি প্রকৃতিরই দাবী, একজন নিরপেক্ষ মন মগজের অধিকারী মানুষ এসব যুক্তি প্রমাণ দেখে সে বিষয়ে নিশ্চিত ও সন্তুষ্ট হতে পারে।[৭২]

○

আল্লাহর সৃষ্টি ও মানবীয় সৃষ্টি ক্ষমতার পার্থক্য পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায়। মানুষ যখন কোনো জিনিস বানাতে চায় তখন প্রথমেই নিজের মন-মগজে তার একটা নকশা ফুটিয়ে তোলে এবং সে জন্য পরে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে। তারপর ঐ সব উপকরণকে নিজের পরিকল্পিত নকশা ও কাঠামো অনুসারে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য পরিশ্রম করে ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালায়। যেসব উপকরণকে সে নিজের মগজে অংকিত নকশায় রূপদানের চেষ্টা করে, চেষ্টার সময় তা একের পর এক বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। কখনো উপকরণের বাধা সফল হয় এবং কাংখিত বস্তু পরিকল্পিত নকশা অনুসারে ঠিকমত তৈরী হয় না। আবার কখনো ব্যক্তির প্রচেষ্টা প্রবল হয় এবং সে উপকরণসমূহকে কাংখিত রূপদানে সফল হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ কোনো দর্জি একটি জামা তৈরি করতে চায়। এ জন্য সে প্রথমে তার মন-মগজে জামার নকশা ও আকৃতি কল্পনা করে। তারপর কাপড় সংগ্রহ করে নিজের পরিকল্পিত জামার নকশা অনুসারে কাপড় কাটতে ও সেলাই করতে চেষ্টা করে এবং এই চেষ্টার সময় তাকে উপর্যুপরি কাপড়ের প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে হয়। কারণ কাপড় তার পরিকল্পিত নকশা অনুসারে তৈরি হতে সহজে প্রস্তুত হয় না। এমনকি এ ক্ষেত্রে কখনো কাপড়ের প্রতিবন্ধকতা সফল হয় এবং জামা ঠিকমত তৈরী হয় না। আবার কখনো দর্জির প্রচেষ্টা সফল হয় এবং সে কাপড়কে তার পরিকল্পিত নকশায় রূপদান করে।

এবার আল্লাহর সৃষ্টি পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করুন। বিশ্ব জাহান সৃষ্টির উপকরণ ধূঁয়ার আকারে ছড়িয়ে ছিলো। বিশ্বজাহানের বর্তমান যে রূপ আল্লাহ তাকে সেই রূপ দিতে চাইলেন। এ উদ্দেশ্যে তাকে বসে বসে কোনো মানুষ কারিগরের মতো পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য এবং অন্যান্য তারকা ও গ্রহ-উপগ্রহ বানাতে হয়নি। বরং তাঁর পরিকল্পনায় বিশ্বজাহানের যে নকশা ছিল সে অনুসারে তাকে অস্তিত্ব গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ তিনি যে ছায়াপথ, তারকারাজি এবং গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন

ঐসব উপকরণ যেন সেই আকৃতি ধারণ করে সেই নির্দেশ দান করলেন। আল্লাহর আদেশের পথে প্রতিবন্ধক হওয়ার ক্ষমতা ঐসব উপকরণের ছিল না। ঐ উপকরণসমূহকে বিশ্বজাহানের আকৃতি দান করতে আল্লাহকে কোনো পরিশ্রম করতে ও প্রচেষ্টা চালাতে হয়নি। একদিকে আদেশ হয়েছে আরেকদিকে ঐসব উপকরণ সংকুচিত ও একত্রিত হয়ে অনুগতদের মত প্রভুর পরিকল্পিত নকশা অনুযায়ী তৈরি হতে শুরু করেছে এবং ৪৮ ঘণ্টায় পৃথিবীসহ সমস্ত বিশ্বজাহান সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।[৭৩]

○

আল্লাহ আছেন এবং এক আল্লাহই পৃথিবী ও আকাশের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। জমি থেকে যা উৎপন্ন হয় তার ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর অসংখ্য সৃষ্টির খাদ্য। এ উৎপাদন নির্ভর করে জমির উর্বরতা ও শস্য উৎপাদন ক্ষমতার ওপর। আবার এ উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে বৃষ্টিপাতের ওপর। সরাসরি জমির ওপর এ বৃষ্টিপাত হতে পারে। অথবা পানির বিশাল ভাণ্ডার জমির উপরিভাগে স্থান লাভ করতে পারে। কিংবা ভূগর্ভস্থ ঝরণা ও কূপের রূপলাভ করতে পারে। অথবা পাহাড়ের ওপর বরফের আকারে জমাটবদ্ধ হয়ে নদ-নদীর সাহায্যে প্রবাহিত হতে পারে। তারপর এ বৃষ্টিপাত আবার নির্ভর করে সূর্যের উত্তাপ, মওসুম পরিবর্তন, মহাশূন্যের তাপমাত্রা ও শৈত্য, বাতাসের আবর্তন এবং এমন বিদ্যুতের ওপর যা মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে। এই সাথে বৃষ্টির পানির মধ্যে এক ধরনের প্রাকৃতিক লবণাক্ততাও সৃষ্টি করে দেয়। পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত এসব বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া, তারপর এসবের অসংখ্য ও বিচিত্র ধরনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের জন্য সুস্পষ্টভাবে উপযোগী হওয়া এবং হাজার হাজার লাখো লাখো বছর পর্যন্ত এদের পূর্ণ একাত্মতা সহকারে অনবরত সহযোগিতার ভূমিকা পালন করে যেতে থাকা, এ সবকিছু কি নিছক ঘটনাক্রমিক হতে পারে? এ সবকিছু কি একজন স্রষ্টার জ্ঞানবত্তা, তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং শক্তিশালী কৌশল ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াই হয়ে গেছে? এ সবকিছু কি একথার প্রমাণ নয় যে, পৃথিবী, সূর্য, বাতাস, পানি, উত্তাপ ও শৈত্য এবং পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা ও রব একজনই?[৭৪]

○

এই যে তিনি নগণ্য একটি ফোঁটা থেকে বাকশক্তিসম্পন্ন এবং যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে বিতর্ককারী মানুষ তৈরি করেছেন, তার প্রয়োজন ও

চাহিদা পূরণ করার জন্য এমন বহু জীব-জানোয়ার সৃষ্টি করেছেন যাদের চুল, চামড়া, রক্ত, দুধ, গোশ্‌ত ও পিঠের মধ্যে মানবিক প্রকৃতির বহুতর চাহিদা এমনকি তার সৌন্দর্যপ্রিয়তার দাবী পূরণেরও উপাদান রয়ে গেছে। এই যে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করার এবং ভূপৃষ্ঠে নানা জাতের ফুল, ফল, শস্য ও উদ্ভিদ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন, যার অসংখ্য বিভাগ পরস্পরের সাথে মিলেমিশে অবস্থান করে এবং সেগুলো মানুষের প্রয়োজনও পূর্ণ করে। এ রাত ও দিনের নিয়মিত আসা যাওয়া এবং চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির চরম নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখল আবর্তন, পৃথিবীর উৎপন্ন ফসল ও মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে যার গভীরতম সম্পর্ক বিদ্যমান। এই যে পৃথিবীতে সমুদ্রের অস্তিত্ব এবং তার মধ্যে মানুষের বহু প্রাকৃতিক ও সৌন্দর্য প্রীতির চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এই যে পানির কতিপয় বিশেষ আইনের শৃংখলে বাঁধা থাকা এবং তারপর তার এ উপকারিতা যে মানুষ সমুদ্রের মতো ভয়াবহ বস্তুর বুক চিরে তার মধ্যে নিজের জাহাজ চালায় এবং দেশ থেকে দেশান্তরে সফর ও বাণিজ্য করে। এই যে পৃথিবীর বুকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের সারি এবং মানুষের অস্তিত্বের জন্য তাদের অপরিহার্যতা। এই যে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে অসীম মহাশূন্যের বুক পর্যন্ত অসংখ্য চিহ্ন ও বিশেষ নিশানীর বিস্তার এবং তারপর এসব মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকা। এসব জিনিসই পরিষ্কার সাক্ষ দিচ্ছে যে, একটি সত্তাই এ পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। তিনি একাই নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী এসবের ডিজাইন তৈরি করেছেন। তিনিই এ ডিজাইন অনুযায়ী তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই প্রতি মুহূর্তে এ দুনিয়ায় নিত্য নতুন জিনিস তৈরি করে করে এমনভাবে সামনে আনছেন যার ফলে সমগ্র পরিকল্পনা ও তার নিয়ম-শৃংখলায় সামান্যতম পার্থক্যও আসছে না। আর তিনি একাই পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত এ সুবিশাল কারখানাটি চালাচ্ছেন। একজন নির্বোধ বা হঠকারী ছাড়া আর কে-ইবা একথা বলতে পারে যে, এসব কিছুই একটি আকস্মিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয় ? অথবা এ চরম সুশৃংখল, সুসংবদ্ধ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বজাহানের বিভিন্ন কাজ বা বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন খোদার সৃষ্ট এবং বিভিন্ন খোদার পরিচালনাধীন ?[৭৫]

○

এমন কি তাদের উপাস্যরা নিজেরাও যে আল্লাহর সৃষ্টি এ ব্যাপারে হযরত ইবরাহীমের জাতিসহ সকল মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল। নাস্তিকরা ছাড়া বাকি দুনিয়ার আর কোথাও কেউ একথা অস্বীকার করেনি। আল্লাহ

বিশ্বজাহানের স্রষ্টা তাই হযরত ইবরাহীমের প্রথম যুক্তি ছিল, আমি একমাত্র তাঁর ইবাদাতকে সঠিক ও যথার্থ মনে করি যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অন্য কোনো সত্ত্বা কেমন করে আমার ইবাদাতের হকদার হতে পারে, যেহেতু আমাকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে তার কোনো অংশ নেই। প্রত্যেক সৃষ্টি অবশ্যি তার নিজের স্রষ্টার বন্দেগী করবে। যে তার স্রষ্টা নয়, তার বন্দেগী করবে কেন ?[৭৬]

○

১৪

আল খাল্লাকু ঃ اَلْـخَلَّاقُ

অর্থ ঃ দক্ষ ও নিপুণ স্রষ্টা।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আল হিজরে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْـخَلّٰقُ الْـعَلِيْمُ ○ الـحجر :٨٦

"নিশ্চিতভাবে তোমার রব সবার স্রষ্টা এবং সবকিছু জানেন।"

–সূরা আল হিজর ঃ ৮৬

সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে ঃ

اَوَ لَيْسَ الَّـذِىْ خَلَقَ السَّـمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰـدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِـثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْـخَلّٰقُ الْـعَلِيْمُ○ يس : ٨١

"যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না ? কেন নয়, যখন তিনি পারদর্শী স্রষ্টা।"

–সূরা ইয়াসীন ঃ ৮১

স্রষ্টা হিসেবে তিনি নিজের সৃষ্টির ওপর পূর্ণ প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী। তাঁর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা কোনো সৃষ্টির নেই।[৭৭]

○

আল্লাহর সৃষ্ট এ বিশ্বজাহানে কোথাও একঘেয়েমি ও বৈচিত্রহীনতা নেই। সর্বত্রই বৈচিত্র আর বৈচিত্র। একই মাটি ও একই পানি থেকে বিভিন্ন প্রকার গাছ উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছের দুটি ফলেরও বর্ণ, দৈহিক কাঠামো ও স্বাদ এক নয়। একই পাহাড়ের দিকে তাকালে তার মধ্যে দেখা যাবে নানা রঙের বাহার। তার বিভিন্ন অংশের বস্তুগত গঠনপ্রণালীতে বিরাট পার্থক্য পাওয়া যাবে। মানুষ ও পশুদের মধ্যে একই মা-বাপের দুটি সন্তানও একই রকম পাওয়া যাবে না। এ বিশ্বজাহানে যদি কেউ মেজাজ, প্রকৃতি ও মানসিকতার একাত্মতা সন্ধান করে এবং বিভিন্নতা, বিচিত্রতা ও বৈষম্য দেখে আতংকিত হয়ে পড়ে, যেদিকে ওপরের ১৯ থেকে ২২ আয়াতে ইশারা করা হয়েছে, তাহলে এটা হবে তার নিজের

বোধশক্তি ও উপলব্ধির ত্রুটি। এই বৈচিত্র ও বিরোধই জানিয়ে দিচ্ছে, এ বিশ্বজাহানকে কোনো মহাপরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তা বহুবিধ জ্ঞান ও বিজ্ঞতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং এর নির্মাতা একজন নজীরবিহীন স্রষ্টা ও তুলনাবিহীন নির্মাণ কৌশলী। তিনি একই জিনিসের কেবল একটিমাত্র নমুনা নিয়ে বসে পড়েননি। বরং তাঁর কাছে প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য একের পর এক এবং অসংখ্য ও সীমাহীন ডিজাইন রয়েছে। তারপর বিশেষ করে মানবিক প্রকৃতি ও বুদ্ধি বৈচিত্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে যে কোনো ব্যক্তি একথা বুঝতে পারে যে, এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় বরং প্রকৃতপক্ষে অতুলনীয় সৃষ্টি জ্ঞানের নিদর্শন। যদি জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষকে তাদের নিজেদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, প্রবৃত্তি, কামনা, আবেগ-অনুভূতি, ঝোঁকপ্রবণতা ও চিন্তাধারার দিক দিয়ে এক করে দেয়া হতো এবং কোনো প্রকার বৈষম্য-বিভিন্নতার কোনো অবকাশই না রাখা হতো, তাহলে দুনিয়ায় মানুষের মতো একটি নতুন ধরনের সৃষ্টি তৈরি করাই হতো পুরোপুরি অর্থহীন। স্রষ্টা যখন এ পৃথিবীতে একটি দায়িত্বশীল ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী সৃষ্টিকে অস্তিত্বশীল করার ফায়সালা করেছেন তখন তার কাঠামোর মধ্যে সব রকমের বিচিত্রতা ও বিভিন্নতার অবকাশ রাখা ছিল সে ফায়সালার অনিবার্য দাবী। মানুষ যে কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল নয় বরং একটা মহান বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ফলশ্রুতি, এ জিনিসটি এর সবচেয়ে বড় সাক্ষ প্রদান করে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বৈজ্ঞানিক, পরিকল্পনা যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই অনিবার্যভাবে তার পেছনে পাওয়া যাবে এক বিজ্ঞানময় সত্তার সক্রিয় সংযোগ। বিজ্ঞানী ছাড়া বিজ্ঞানের অস্তিত্ব কেবলমাত্র একজন নির্বোধই কল্পনা করতে পারে।[৭৮]

○

স্রষ্টার প্রজ্ঞার পূর্ণতা হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষকে শুধুমাত্র একটি জাতি (Sexes) সৃষ্টি করেননি বরং তাকে দুটি জাতির আকারে সৃষ্টি করেছেন। মানবিকতার দিক দিয়ে তারা একই পর্যায়ভুক্ত। তাদের সৃষ্টির মূল ফরমুলাও এক। কিন্তু তারা উভয়ই পরস্পর থেকে ভিন্ন শারীরিক আকৃতি, মানসিক ও আত্মিক গুণাবলী এবং আবেগ-অনুভূতি ও উদ্যোগ নিয়ে জন্মলাভ করে। আবার তাদের মধ্যে এমন বিস্ময়কর সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যার ফলে তারা প্রত্যেককে পুরোপুরি অন্যের জোড়ায় পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকের শরীর এবং প্রবৃত্তি ও উদ্যোগসমূহ অন্যের শারীরিক ও প্রবৃত্তির দাবীসমূহের পরিপূর্ণ জবাব। এ ছাড়াও সেই প্রাজ্ঞ স্রষ্টা এ উভয় জাতির লোকদেরকে সৃষ্টির সূচনা থেকেই

বরাবর এটা আনুপাতিক হারে সৃষ্টি করে যেতে থাকবেন। আজ পর্যন্ত কখনো দুনিয়ার কোনো জাতির মধ্যে বা কোনো এলাকায় কেবলমাত্র পুত্র সন্তানই জন্মলাভ করছে, এমনটি দেখা যায়নি। অথবা কোথাও কেবলমাত্র কন্যা সন্তানই জন্মলাভ করে চলছে এমন কথাও শোনা যায়নি। এটা এমন একটা জিনিস যার মধ্যে কোনো মানুষের হস্তক্ষেপ বা বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগের সামান্যতম অবকাশই নেই। মানুষ এ ব্যাপারে সামান্যতমও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না যে, মেয়েরা অনবরত এমন মেয়েলী বৈশিষ্ট্য এবং ছেলেরা অনবরত এমন পুরুষালী বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মলাভ করতে থাকবে যা তাদের পরস্পরকে যথার্থ জোড়ায় পরিণত করবে। আর নারী ও পুরুষদের জন্ম এমনি ধারাবাহিকভাবে একটি আনুপাতিক হারে হয়ে যেতে থাকবে, এ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করার কোনো মাধ্যম তার নেই। হাজার হাজার বছর থেকে কোটি কোটি মানুষের জন্মলাভে এ কৌশল ও ব্যবস্থার এমনই সুসামঞ্জস্য পদ্ধতিতে কার্যকর থাকা কখনো নিছক আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না আবার বহু ইলাহর সম্মিলিত ব্যবস্থাপনার ফলও এটা নয়। এ জিনিসটি সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণ করে যে, একজন বিজ্ঞানী আর শুধুমাত্র একজন মহা বিজ্ঞানী স্রষ্টাই তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির মাধ্যমে শুরুতে পুরুষ ও নারীর একটি সর্বাধিক উপযোগী ডিজাইন তৈরি করেন। তারপর তিনি এ ডিজাইন অনুযায়ী অসংখ্য পুরুষ ও অসংখ্য নারীর তাদের পৃথক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সহকারে সারা দুনিয়ায় একটি আনুপাতিক হারে জন্মলাভ করার ব্যবস্থা করেন।[৭৯]

○

মানুষের সৃষ্টি রহস্য কয়েকটি নিষ্প্রাণ উপাদানের সমাহার মাত্র, যেগুলো এ পৃথিবীর বুকে পাওয়া যায়। যেমন কিছু কার্বন, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম এবং এ ধরনের আরো কিছু উপাদান। এগুলোর রাসায়নিক সংযোগের মাধ্যমে মানুষ নামক একটি বিস্ময়কর সত্তা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে আবেগ, অনুভূতি, চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তা-কল্পনার এমন সব অদ্ভূত শক্তি যাদের কোনো একটির উৎসও তার মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না। তারপর শুধু এতটুকুই নয় যে, হঠাৎ একজন মানুষ এমনি ধরনের এক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে গেছে বরং তার মধ্যে এমন সব অদ্ভূত প্রজনন শক্তিও সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যার বদৌলতে কোটি কোটি মানুষ সে একই কাঠামো এবং যোগ্যতার অধিকারী হয়ে অসংখ্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং সীমাসংখ্যাহীন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ধারক হিসেবে বের হয়ে আসছে। তোমার বুদ্ধি কি এ সাক্ষ দেয় যে, এ চূড়ান্ত জ্ঞানময় সৃষ্টি কোনো জ্ঞানী স্রষ্টার সৃষ্টিকর্ম ছাড়াই আপনা আপনিই অস্তিত্বশীল হয়েছে ?[৮০]

আল বারিয়্যু ঃ اَلْبَارِئُ

অর্থ ঃ আপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী।

ব্যাখ্যা ঃ দ্বিতীয় পর্যায় হলো بـرء । এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো পৃথক করা, চিরে ফেলা, ফেড়ে আলাদা করা। স্রষ্টার জন্য 'বারী' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে, তিনি তাঁর পরিকল্পিত কাঠামোকে বাস্তবে রূপ দেন। অর্থাৎ যে নকশা তিনি নিজে চিন্তা করে রেখেছেন তাকে কল্পনা বা অস্তিত্বহীনতার জগত থেকে এনে অস্তিত্ব দান করেন। এর উদাহরণ হলো, ইঞ্জিনিয়ার ইমারতের যে কাঠামো ও আকৃতি তাঁর চিন্তারজগতে অংকন করেছিলেন সে অনুযায়ী ঠিকমত মাপজোঁক করে মাটিতে দাগ টানেন, ভিত খনন করেন, প্রাচীর গেঁথে তোলেন এবং নির্মাণের সকল বাস্তব স্তর অতিক্রম করেন।[৮১]

○

আল মুসাব্বিরু : اَلْمُصَوِّرُ

অর্থ : নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী রূপ দানকারী।

ব্যাখ্যা : তৃতীয় পর্যায় হলো, 'তাসবীর'। এর অর্থ রূপদান করা। এখানে এর অর্থ হলো, কোনো বস্তুকে চূড়ান্ত, পূর্ণাঙ্গ আকৃতি ও রূপ দান করা। এ তিনটি পর্যায়ে আল্লাহ তাআলার কাজ ও মানুষের কাজের মধ্যে আদৌ কোনো মিল বা তুলনা হয় না। মানুষের কোনো পরিকল্পনাই এমন নয় যা পূর্বের কোনো নমুনা থেকে গৃহীত নয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রতিটি পরিকল্পনা অনুপম এবং তাঁর নিজের আবিষ্কার। মানুষ যা তৈরি করে তা আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট উপাদানসমূহের একটিকে আরেকটির সাথে জুড়ে দেয়। অস্তিত্ব নেই এমন কোনো জিনিসকে সে অস্তিত্ব দান করে না, বরং যা আছে তাকেই বিভিন্ন পন্থায় জোড়া দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা সমস্ত বস্তুকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং যে উপাদান দিয়ে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সে উপাদানও তাঁর নিজের সৃষ্টি। অনুরূপ আকার-আকৃতি দানের ব্যাপারেও মানুষ আবিষ্কর্তা নয়, বরং আল্লাহর তৈরি আকার-আকৃতি ও চিত্রসমূহের অনুকরণকারী ও অপরিপক্ক নকলকারী। প্রকৃত আকার-আকৃতি দানকারী ও চিত্র অংকনকারী মহান আল্লাহ। তিনি প্রতিটি জাতি, প্রজাতি এবং প্রতিটি ব্যক্তির অনুপম ও নজীরহীন আকার-আকৃতি বানিয়েছেন এবং কোনো সময় একই আকার-আকৃতির পুনরাবৃত্তি ঘটাননি।[৮২]

○

১৭

আল গাফ্ফারু : اَلْغَفَّارُ

অর্থ : ক্ষমাকারী।

ব্যাখ্যা : সূরা ত্বাহায় বলা হয়েছে :

وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ـ طه : ٨٢

"তবে সে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তারপর সোজা সঠিক পথে চলতে থাকে তার জন্য আমি অনেক বেশি ক্ষমাশীল।"
–সূরা আত তাওবা : ৮২

সূরা আয্ যুমারের পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে :

اَلاَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○ الزمر : ٥

"জেনে রাখো, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।"

সূরা মু'মিনের ৪২ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ○ المؤمن : ٤٢

"অথচ আমি তোমাদের সে মহাপরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাচ্ছি।"–সূরা মু'মিন : ৪২

সূরা সোয়াদের ৬৬ আয়াতে বলা হয়েছে :

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○ ـ ص : ٦٦

"আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং এ দুয়ের মধ্যে অবস্থানকারী, সমস্ত জিনিসের মালিক পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।"-সূরা সোয়াদ : ৬৬

সূরা আন নূহের ১০ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ قف اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ○ نوح : ١٠

"আমি বলেছি তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও। নিসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল।"–সূরা আন নূহ : ১০

এমন মহাপরাক্রমশালী যে, তিনি যদি তোমাদের আযাব দিতে চান তাহলে কোনো শক্তিই তা রোধ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু এটা তাঁর

মেহেরবানী যে তোমরা এসব অপরাধ ও অবমাননা করা সত্ত্বেও তখনই তোমাদের পাকড়াও করছেন না, বরং একের পর এক অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এখানে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা এবং অবকাশ দেয়াকে ক্ষমা (দেখেও না দেখা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৩]

○

মাগফিরাতের জন্য রয়েছে চারটি শর্ত। এক, তাওবা। অর্থাৎ বিদ্রোহ, নাফরমানী অথবা শির্ক ও কুফরী থেকে বিরত থাকা। দুই, ঈমান। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূল এবং কিতাব ও আখেরাতকে সাচ্চা দিলে মেনে নেয়া। তিন, সৎকাজ। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের বিধান অনুযায়ী ভালো কাজ করা। চার, সত্যপথাশ্রয়ী হওয়া। অর্থাৎ সত্য-সঠিক পথে অবিচল থাকা এবং তারপর ভুল পথে না যাওয়া।[৮৪]

○

সগীরা গোনাহকারী ব্যক্তিকে মাফ করে দেয়ার কারণ এ নয় যে, সগীরা* গোনাহ কোনো গোনাহই নয়। বরং এর কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদের সাথে সংকীর্ণচেতনার মতো আচরণ এবং ছোট ছোট ব্যাপারে পাকড়াও করার নীতি গ্রহণ করেন না। বান্দা যদি নেকীর পথ অনুসরণ করে এবং বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে তাহলে ছোট ছোট ব্যাপারে তিনি তাকে পাকড়াও করবেন না। অশেষ রহমতের কারণে তাকে ক্ষমা করে দেবেন।[৮৫]

○

এখন প্রশ্ন হলো, সগীরা ও কবীরা গোনাহর মধ্যে পার্থক্য কি ? এবং কি ধরনের গোনাহ সগীরা আর কি ধরনের গোনাহ কবীরা ? এ ব্যাপারে কবীরা ও সগীরা গোনাহর যে সংজ্ঞা আমার কাছে পূর্ণরূপে নিশ্চিত ও পরিতৃপ্ত তা হচ্ছে, "যে গোনাহকে কিতাব ও সুন্নাহর কোনো সুস্পষ্ট উক্তিতে হারাম বলা হয়েছে অথবা যে গোনাহর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দুনিয়াতে কোনো শাস্তি নির্দিষ্ট করেছেন অথবা যে গোনাহর কারণে আখেরাতে আযাবের ভয় দেখিয়েছেন বা অভিশাপ দিয়েছেন অথবা তাতে লিপ্ত ব্যক্তির ওপর আযাব নাযিলের খবর দিয়েছেন"—এ ধরনের সমস্ত গোনাহই কবীরা গোনাহ। এ প্রকৃতির গোনাহ ছাড়া শরীআতের দৃষ্টিতে আর যত রকমের অপসন্দনীয় কাজ আছে তা সবই সগীরা গোনাহর সংজ্ঞায় পড়ে। একইভাবে কেবলমাত্র গোনাহের আকাংখা পোষণ করা

কিংবা ইচ্ছা করাও কবীরা গোনাহ্ নয়, সগীরা গোনাহ্। এমন কি কোনো বড় গোনাহ্র প্রাথমিক পর্যায়সমূহ্ অতিক্রম করাও ততক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গোনাহ নয় যতক্ষণ না ব্যক্তি কার্যত তা করে বসবে। তবে সগীরা গোনাহ্ও যখন ইসলামী বিধানকে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে করা হয়, আল্লাহ্ তাআলার মুকাবিলায় অহংকারের মনোবৃত্তি নিয়ে করা হয় এবং যে শরীআত একে খারাপ কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে তাকে আদৌ গুরুত্ব দেয়ার উপযুক্ত মনে করা না হয় তখন তা কবীরা গোনাহে রূপান্তরিত হয়।[৮৬]

○

১৮

গাফিরুয যানবি ঃ غَافِرُ الذَّنْبِ

অর্থ ঃ গুনাহ মাফকারী।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ

غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ط - المؤمن : ٣

"গোনাহ মাফকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং অত্যন্ত দয়ালু।"–সূরা মু'মিন ঃ ৩

এটা তাঁর আশা ও উৎসাহ দানকারী গুণ। এ গুণটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা এখনো পর্যন্ত বিদ্রোহ করে চলেছে তারা যেন নিরাশ না হয় বরং একথা ভেবে নিজেদের আচরণ পুনর্বিবেচনা করে যে, এখনো যদি তারা এ আচরণ থেকে বিরত হয় তাহলে আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। এখানে একথা বুঝে নিতে হবে যে, গোনাহ মাফ করা আর তাওবা কবুল করা একই বিষয়ের দুটি শিরোনাম মোটেই নয়। অনেক সময় তাওবা ছাড়াই আল্লাহ তাআলা গোনাহ মাফ করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি ভুল-ক্রটিও করে আবার নেকীর কাজও করে এবং তার নেকীর কাজ গোনাহ মাফ হওয়ার কারণ হয়ে যায়, চাই ঐসব ভুল-ক্রটির জন্য তার তাওবা করার ও ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগ হোক বা না হোক। এমনকি সে যদি তা ভুলে গিয়ে থাকে তাও। অনুরূপভাবে পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তির ওপর যত দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি এবং নানা রকম দুশ্চিন্তা ও মর্মপীড়াদায়ক গোনাহ মাফ করার কথা তাওবা কবুল করার কথা থেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাওবা ছাড়াই গোনাহ মাফ লাভের এ সুযোগ কেবল ঈমানদারদের জন্যই আছে। আর ঈমানদারদের মধ্যেও কেবল তারাই এ সুযোগ লাভ করবে যারা বিদ্রোহ করার মানসিকতা থেকে মুক্ত এবং যাদের দ্বারা মানবিক দুর্বলতার কারণে গোনাহর কাজ সংঘটিত হয়েছে, অহংকার ও বার বার গোনাহ করার কারণে নয়।[৮৭]

○

আল কাহ্হারু ঃ اَلْقَهَّارُ

অর্থ ঃ সকলের ওপর বিজয়ী।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা ইউসুফে বলা হয়েছে ঃ

أَ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ـ يوسف : ٣٩

"ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো, না এক আল্লাহ্, যিনি সবার ওপর বিজয়ী।"–সূরা ইউসুফ ঃ ৩৯

সূরা আর রাআদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ـ الرعد : ١٦

"বলো, প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্। তিনি একক ও সবার ওপর পরাক্রমশালী।"–সূরা আর রাআদ ঃ ১৬

সূরা ইবরাহীমে বলা হয়েছে ঃ

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ـ ابرهيم : ٤٨

"এবং সবাই এক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উন্মুক্ত হয়ে হাযির হবে।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৪৮

সূরা সোয়াদে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ص : ٦٥

"হে নবী. এদেরকে বলো, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত মাবুদ নেই। তিনি একক, সবার ওপর আধিপত্যশীল।"–সূরা সোয়াদ ঃ ৬৫

সূরা আয্ যুমারে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

سُبْحَانَهٗ ط هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الزمر : ٤

"তিনি এ থেকে পবিত্র। তিনি আল্লাহ। তিনি একক ও সবার ওপর বিজয়ী।"–সূরা আয্ যুমার ঃ ৪

সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○ المؤمن : ١٦

"আজ রাজত্ব কার ? একমাত্র আল্লাহর, যিনি মহাপরাক্রমশালী।"
—সূরা মু'মিন ঃ ১৬

এমন সত্তা যিনি নিজ শক্তিতে সবার ওপর হুকুম চালান এবং সবাইকে অধীনস্থ করে রাখেন। "আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা" একথাটি এমন একটি সত্য যাকে মুশরিকরাও স্বীকার করে নিয়েছিল এবং তারা কখনো এটা অস্বীকার করেনি। "তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী" একথাটি হচ্ছে মুশরিকদের ঐ স্বীকৃত সত্যের অনিবার্য ফল। প্রথম সত্যটি মেনে নেবার পর কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে একে অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়। কারণ যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা নিসন্দেহে তিনি একক, অতুলনীয় ও সাদৃশ্যবিহীন। কারণ অন্য যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি। এ অবস্থায় কোনো সৃষ্টি কেমন করে তার স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা বা অধিকারে তাঁর সাথে শরীক হতে পারে ? এভাবে তিনি নিসন্দেহে মহাপরাক্রমশালীও। কারণ সৃষ্টি তার স্রষ্টার অধীন হয়ে থাকবে, এটি সৃষ্টি-ধারণার অংগীভূত। সৃষ্টির ওপর স্রষ্টার যদি পূর্ণ কর্তৃত্ব ও দখল না থাকে তাহলে তিনি সৃষ্টিকর্মই বা করবেন কেমন করে ? কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্রষ্টা বলে মানে তার পক্ষে এ দুটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও ন্যায়ানুগ ফলশ্রুতি অস্বীকার করা সম্ভবপর হয় না। কাজেই এরপরে কোনো ব্যক্তি স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করবে এবং মহা-পরাক্রমশালীকে বাদ দিয়ে দুর্বল ও অধীনকে সংকট উত্তরণ করাবার জন্য আহবান জানাবে, একথা একেবারেই অযৌক্তিক প্রমাণিত হয়।[৮৮]

○

পৃথিবীতে সব জিনিসই তাঁর অজেয় আধিপত্যের অধীন। এ বিশ্বজাহানের কোনো কিছুই কোনো পর্যায়েই তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তাই কোনো জিনিস সম্পর্কেই এ ধারণা করা যেতে পারে না যে, আল্লাহর সাথে তার কোনো আত্মীয়তার বন্ধন আছে।[৮৯]

○

একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত উপাস্য ও মাবুদ। কারণ তিনি সবার ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী, আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং বিশ্বজাহানের সমস্ত জিনিস তাঁর মালিকানাধীন। তাঁকে বাদ দিয়ে এ বিশ্বজাহানে যেসব

সত্তাকে তোমরা মাবুদ বানিয়ে রেখেছো তাদের মধ্যে কোনো একটি সত্তাও এমন নেই, যে তাঁর অধীন ও গোলাম নয়। এসব কর্তৃত্বাধীন ও গোলাম সত্তা সেই সর্বময় কর্তৃত্বকারী ও প্রাধান্য বিস্তারকারী সত্তার কর্তৃত্বে শরীক হতে পারে কেমন করে ? কোন্ অধিকারে এদেরকে মাবুদ ও উপাস্য গণ্য করা যেতে পারে ?[৯০]

○

পৃথিবীতে তো বহু অংহকারী ভ্রান্ত লোক নিজেদের বাদশাহী ও শক্তিমত্তার ডঙ্কা বাজাতো আর বহু সংখ্যক নির্বোধ তাদের বাদশাহী ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতো। এখন বলো প্রকৃতপক্ষে বাদশাহী কার ? ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকৃত মালিক কে ? আর হুকুমই বা চলে কার ? এটা এমন একটা বিষয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি তা বুঝার চেষ্টা করে তাহলে সে যত বড় বাদশাহ কিংবা একনায়ক হয়ে থাকুক না কেন, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তার মন-মগজ থেকে শক্তিমত্তার সমস্ত অহংকার উবে যাবে। এখানে এ ঐতিহাসিক ঘটনাটা উল্লেখ্য যে, সামানী খান্দানের শাসক নাসর ইবনে আহমাদ (৩০১-৩৩১ হিঃ) নিশাপুরে প্রবেশ করলে একটি দরবার ডাকেন এবং সিংহাসনে বসার পর কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের মাধ্যমে কাজকর্ম শুরু হবে বলে আদেশ দেন। একথা শুনে একজন সম্মানিত জ্ঞানী ব্যক্তি অগ্রসর হন এবং এ রুকূ'টি তিলাওয়াত করেন। যখন তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন তখন নাসর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে সিংহাসন থেকে নামলেন এবং মাথার মুকুট খুলে সিজদায় পড়ে বললেন ঃ হে আমার প্রভু, বাদশাহী তোমারই, আমার নয়।[৯১]

○

আল কাহির : اَلْقَاهِرُ

অর্থ : সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

ব্যাখ্যা : সূরা আল আন'আমে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন :

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ - الانعام : ١٨

"তিনি নিজের বান্দাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি জ্ঞানী ও সবকিছু জানেন।"–সূরা আল আনআম : ১৮

একইভাবে ৬১নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً - الانعام : ٦١

"তিনি নিজের বান্দাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাদের ওপর রক্ষক নিযুক্ত করে পাঠান।"–সূরা আল আনআম : ৬১

একমাত্র আল্লাহই যে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন, সকল শক্তির অধিকারী, সমস্ত ইখতিয়ার ও কর্মক্ষমতা যে তাঁরই হাতে সীমাবদ্ধ, তোমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ করার যাবতীয় ক্ষমতা যে তাঁরই আয়ত্তাধীন এবং তাঁরই হাতে যে রয়েছে তোমাদের ভাগ্যের চাবিকাঠি—এ সত্যগুলোর সাক্ষ তো তোমাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যেই বিদ্যমান। কোনো কঠিন সংকটকাল এলে এবং যাবতীয় উপায় উপকরণ হাতছাড়া হতে দেখা গেলে তোমরা নিতান্ত অসহায়ের মতো তাঁর আশ্রয় চাও।[৯২]

○

আল ওয়াহ্হাবু : اَلْوَهَّابُ

অর্থ : প্রকৃত দাতা, স্বতস্ফূর্তভাবে দানশীল।

ব্যাখ্যা : সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে :

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

"হে আমাদের রব! যখন তুমি আমাদের সোজা পথে চালিয়েছো। তখন আর আমাদের অন্তরকে বক্রতায় আচ্ছন্ন করে দিয়ো না, তোমার দান ভাণ্ডার থেকে আমাদের জন্য রহমত দান করো কেননা তুমিই আসল দাতা।"–সূরা আলে ইমরান : ৮

সূরা সোয়াদের ৯ম আয়াতে বলা হয়েছে :

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ - ص : ٩

"তোমার মহান দাতা ও পরাক্রমশালী পরওয়ারদিগারের রহমতের ভাণ্ডার কি এদের আয়ত্তাধীনে আছে ?"

সূরা সোয়াদে বলা হয়েছে :

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّايَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

"এবং বললো, হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করো যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভন হবে না ; নিঃসন্দেহে তুমিই আসল দাতা।"–সূরা সোয়াদ : ৩৫

অপরাধ করে ঘাড় বাঁকা করে থাকা বান্দার জন্য সঠিক কর্মনীতি নয়। বরং তার কাজ হচ্ছে যখনই সে নিজের ভুল অনুভব করতে পারবে তখনই বিনীতভাবে নিজের রবের সামনে ঝুঁকে পড়বে। এ কর্মনীতিরই ফল স্বরূপ মহান আল্লাহ এ মনীষীদের পদস্খলনগুলো কেবল ক্ষমাই করে দেন না বরং তাঁদের প্রতি আরো বেশী দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেন।[৯৩]

○

বান্দার অহংকার আল্লাহর কাছে যত বেশী অপ্রিয় ও অপসন্দনীয় তার দীনতা ও বিনয়ের প্রকাশ তাঁর কাছে তত বেশী প্রিয়। বান্দা যদি অপরাধ

করে এবং সতর্ক করার কারণে উল্‌টো আরো বেশী বাড়াবাড়ি করে, তাহলে এর পরিণাম তাই হয় যা সামনের দিকে আদম ও ইবলিসের কাহিনীতে বর্ণনা করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে বান্দার যদি সামান্য পদস্খলন হয়ে যায় এবং সে তাওবা করে দীনতা সহকারে তার রবের সামনে মাথা নত করে, তাহলে তার প্রতি এমন সব দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হয়, যা ইতিপূর্বে দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের ওপর প্রদর্শিত হয়। হযরত সুলাইমান ইস্‌তিগ্‌ফারের পরে যে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ তাকে অক্ষরে অক্ষরে তা পূরণ করেন এবং বাস্তবে তাঁকে এমন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করেন যা তাঁর পূর্বে কেউ লাভ করেনি এবং তাঁর পরে আজো পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয়নি। বায়ু নিয়ন্ত্রণ ও জিনদের ওপর কর্তৃত্ব এ দুটি এমন ধরনের অসাধারণ শক্তি যা মানুষের ইতিহাসে একমাত্র হযরত সুলাইমানকেই দান করা হয়েছে। অন্য কাউকে এর কোনো অংশ দেয়া হয়নি।[৯৪]

○

আল্লাহর নেক বান্দারা যখন বিপদের ও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হন তখন তাঁরা তাঁদের রবের কাছে অভিযোগ করেন না বরং ধৈর্য সহকারে তাঁর চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে মেনে নেন এবং তাতে উত্তীর্ণ হবার জন্য তাঁর কাছেই সাহায্য চান। কিছুকাল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পর যদি বিপদ অপসারিত না হয় তাহলে তাঁর থেকে নিরাশ হয়ে অন্যদের দরবারে হাত পাতবেন, এমন পদ্ধতি তাঁরা অবলম্বন করেন না। বরং তারা ভাল করেই জানেন, যা কিছু পাওয়ার আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। তাই বিপদের ধারা যতই দীর্ঘ হোক না কেন তারা তাঁরই করুণাপ্রার্থী হন। এজন্য তারা এমন দান ও করুণা লাভে ধন্য হন যার দৃষ্টান্ত হযরত আইয়ুবের জীবনে পাওয়া যায়। এমনকি যদি তারা কখনো অস্থির হয়ে কোনো প্রকার নৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়েন তাহলেও আল্লাহ তাদেরকে দুষ্কৃতিমুক্ত করার জন্য একটি পথ বের করে দেন যেমন হযরত আইয়ুবের জন্য বের করে দিয়েছিলেন।[৯৫]

○

আর রায্যাকু ঃ اَلـرَّزَّاقُ

অর্থ ঃ সকলের জীবিকা প্রদানকারী।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আয্ যারিয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰـهَ هُوَ الـرَّزَّاقُ ذُوْ الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ۔ الذريت : ٥٨

"আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।" –সূরা আয্ যারিয়াত ঃ ৫৮

সূরা আল জুমআয় বলা হয়েছে ঃ

وَاللّٰـهُ خَيْرُ الـرّٰزِقِيْنَ۔ الـجمعة : ١١

"আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিক দাতা।"–সূরা আল জুমুআ ঃ ১১

এ পৃথিবীতে রিযিকদানের পরোক্ষ মাধ্যম যে বা যাই হোক না কেন তাদের সবার চেয়ে উত্তম রিযিকদাতা হলেন আল্লাহ তাআলা। কুরআন মজীদের বহুসংখ্যক স্থানে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। কোথাও আল্লাহ তাআলাকে احسن الخالقين "সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা" কোথাও خير الغافرين "সর্বোত্তম ক্ষমাকারী", কোথাও خير الحاكمين "সর্বোত্তম বিচারক" কোথাও خير الراحمين "সর্বোত্তম দয়ালু" এবং কোথাও خير الناصرين "সর্বোত্তম সাহায্যকারী" বলা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সৃষ্টি বা মাখলূকের সাথে রিযিক দেয়া, সৃষ্টি করা, দয়া করা এবং সাহায্য করার যে সম্পর্ক তা রূপক বা পরোক্ষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যারাই তোমাদেরকে বেতন, পারিশ্রমিক বা খাদ্য দিচ্ছে বলে দেখা যায়, যাদেরকেই তাদের শিল্প ও কারিগরী দক্ষতা দিয়ে কিছু তৈরি করতে দেখা যায় অথবা যাদেরকেই অন্যদের অপরাধ ক্ষমা করতে, দয়া করতে এবং সাহায্য করতে দেখা যায় আল্লাহ তাদের সবার চেয়ে বড় রিযিকদাতা, বড় সৃষ্টিকর্তা, বড় দয়ালু, বড় ক্ষমাকারী এবং বড় সাহায্যকারী।[৯৬]

○

রিযিকদাতা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, দাতা এবং এ ধরনের আরো বহু গুণ রয়েছে, যা আসলে আল্লাহরই গুণ, কিন্তু রূপক অর্থে বান্দাদের সাথেও

সংশ্লিষ্ট করা হয়। যেমন আমরা এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলি, সে অমুক ব্যক্তির রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অথবা সে এ উপহারটি দিয়েছে। কিংবা সে অমুক জিনিসটি তৈরি করেছে বা উদ্ভাবন করেছে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ নিজের জন্য 'উত্তম রিযিক দাতা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে তোমরা ধারণা করে থাকো যে, তারা রুজি দান করে থাকে, তাদের সবার চেয়ে আল্লাহ্ উত্তম রিযিকদাতা।[৯৭]

○

আর্ রাযিকু الـرَّازِقُ

অর্থ ঃ সর্বোত্তম জীবিকাদাতা।

ব্যাখ্যা ঃ خَـيْـرُ الـرَّازِقِيْنَ বাক্যটি পবিত্র কুরআনের কয়েকটি সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে যেমন ঃ

وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الـرَّازِقِيْنَ۝ المائدة : ١١٤

"আমাদের জীবিকা দান করো এবং তুমি সর্বোত্তম জীবিকা দানকারী।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১১৪

وَاِنَّ اللّٰـهَ لَـهُوَ خَيْرُ الـرّٰزِقِيْنَ ـ الـحج : ٥٨

"এবং নিশ্চয়ই আল্লাহই সবচেয়ে ভালো রিযিকদাতা।"
–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫৮

وَمَا اَنْفَقْتُـمْ مِّنْ شَيْئٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ج وَهُوَ خَيْرُ الـرَّازِقِيْنَ۝سبا : ٣٩

"যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, তার জায়গায় তিনি তোমাদের আরো দেন, তিনি সব রিযিকদাতার চেয়ে ভালো রিযিকদাতা।
–সূরা সাবা ঃ ৩৯

اَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَـخَرْجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ق وَّهُوَ خَيْرُ الـرّٰزِقِيْنَ۝المؤمنون : ٧٢

"তুমি কি তাদের কাছে কিছু চাচ্ছো ? তোমার জন্য তোমার রব যা দিয়েছেন, সেটাই ভালো এবং তিনি সবচেয়ে ভালো রিযিকদাতা।"
–সূরা মু'মিনূন ঃ ৭২

তোমাদের সামনে এই যে অসংখ্য পশুপাখি ও জলজপ্রাণী জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, এদের মধ্য থেকে কে তার জীবিকা বহন করে ফিরছে ? আল্লাহই তো এদের সবাইকে প্রতিপালন করেছেন। যেখানেই যায় আল্লাহর অনুগ্রহে এরা কোনো না কোনো প্রকারে জীবিকা লাভ করেই থাকে। কাজেই তোমরা একথা ভেবে সাহস হারিয়ে বসো না যে, যদি ঈমান রক্ষার জন্য বাড়িঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়ি তাহলে খাবো

কি ? আল্লাহ যেখান থেকে তাঁর অসংখ্য সৃষ্টিকে রিযিক দিচ্ছেন সেখান থেকে তোমাদেরও দেবেন।[৯৮]

○

জন্মলাভ করার সাথে সাথে তাঁর দয়ায় তোমরা প্রচুর পবিত্র খাদ্য পেয়েছো, পানাহারের এমন সব পবিত্র উপকরণ লাভ করেছো যা বিষাক্ত নয়, সুস্বাস্থ্য দায়ক, তিক্ত, নোংরা ও বিস্বাদ নয় বরং সুস্বাদু, পচা গলা ও দুর্গন্ধ নয় বরং সুবাসিত, খাদ্যপ্রাণহীন নয়, বরং তোমাদের দেহের লালন ও প্রবৃদ্ধির জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী খাদ্যপ্রাণ ও প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানে সমৃদ্ধ। পানি, খাদ্য, শস্য, তরকারী-ফলমূল, দুধ, মধু, গোশত, লবণ, মরিচ ও মসলা তোমাদের পুষ্টি সাধনের জন্য এসব অত্যন্ত উপযোগী এবং জীবনদায়িনী শক্তিই শুধু নয়, বরং জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদলাভের জন্যও অত্যন্ত উপযোগী। এ পৃথিবীতে এসব জিনিসকে এত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করেছে, ভূমি থেকে খাদ্যের এ অগণিত ভাণ্ডার উৎপাদনের এ ব্যবস্থা কে করেছে যে, তার যোগান কখনো বন্ধ হয় না ? চিন্তা করে দেখো, রিযিকের এ ব্যবস্থা না করেই যদি তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হতো তাহলে তোমাদের জীবনের পরিস্থিতি কি দাঁড়াতো ?[৯৯]

○

আল্লাহ বিমুখ লোকেরা পৃথিবীতে যাদের বন্দেগী করছে তারা সবাই প্রকৃতপক্ষে এসব বান্দার মুখাপেক্ষী। এরা যদি তার প্রভুত্ব না চালায় তাহলে তা একদিনও চলবে না। সে এদের রিযিকদাতা নয় এরাই বরং তাকে রিযিক পৌঁছিয়ে থাকে। সে এদের খাওয়ায় না, এরাই তাকে খাইয়ে থাকে। সে এদের প্রাণের রক্ষক নয়, বরং এরাই তাদের প্রাণ রক্ষা করে থাকে। এরাই তাদের সৈন্য সামন্ত। এদের ওপর নির্ভর করেই তাদের প্রভুত্ব চলে। যেখানেই কেউ এ মিথ্যা প্রভুদের সহযোগী বান্দা হয়নি কিংবা বান্দারা তাদেরকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থেকেছে সেখানেই তাদের সব জৌলুস হারিয়ে গিয়েছে এবং দুনিয়ার মানুষ তাদের পতন দেখতে পেয়েছে। সমস্ত উপাস্যের মধ্যে একমাত্র মহান ও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহই এমন উপাস্য, নিজের ক্ষমতায়ই যাঁর প্রভুত্ব চলছে। যিনি তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে কিছু নেন না, বরং তিনিই তাদের সবকিছু দেন।[১০০]

○

আল ফাত্তাহু : اَلْفَتَّاحُ, আল ফাতিহু : اَلْفَاتِحُ

অর্থ : পরাক্রমশালী শাসক, নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।

ব্যাখ্যা : সূরা সাবায় বলা হয়েছে :

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ط وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ○ سبا : ٢٦

"বলো, আমাদের রব আমাদেরকে একত্রিত করবেন। অতপর আমাদের পারস্পরিক ব্যাপারে ঠিক ঠিক ফায়সালা দান করবেন। তিনি এতবড়ো বিচারকর্তা যে, তিনি সবকিছুই জানেন।"

–সূরা সাবা : ২৬

এটি এক অকাট্য সত্য যে, আমাদের ও তোমাদের উভয় দলকেই নিজের রবের সামনে হাজির হতে হবে। আর রবও হচ্ছেন এমন যিনি প্রকৃত সত্য অবহিত আছেন এবং আমাদের উভয় দলের অবস্থাও ভালোভাবেই জানেন। সেখানে গিয়ে কেবলমাত্র আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কারা সত্য ও কারা মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এ বিষয়টিরই চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে না বরং এ মামলারও নিষ্পত্তি হয়ে যাবে যে, তোমাদের কাছে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য আমরা কি করেছি এবং তোমরা মিথ্যাপূজার জিদের বশবর্তী হয়ে কিভাবে আমাদের বিরোধিতা করেছো।[১০১]

○

আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের ইচ্ছার অধীন নয়। কোনো কাজের জন্য তোমরা যে সময় বেঁধে দেবে সে সময়ই সে কাজটি করতে তিনি বাধ্য নন। নিজের কাজ নিজের ইচ্ছা ও সুবিধা মতো তিনি করে থাকেন। তোমরা আল্লাহর পরিকল্পনা কি বুঝবে ? তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী মানব জাতি কতদিন পর্যন্ত এ দুনিয়ায় কাজ করার সুযোগ পাবে, কত ব্যক্তির এবং কত জাতির কি কি ধরনের পরীক্ষা হবে এবং এ দপ্তরের সমস্ত কাজকর্ম গুটিয়ে নেবার এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের সবাইকে হিসেব-নিকেশের উদ্দেশ্যে ডেকে নেবার জন্য কোন্ সময়টি উপযোগী হবে তোমরা তার কি বুঝবে![১০২] ○

আল আলীমু ঃ اَلْعَلِيْمُ, আল্ আল্লামু ঃ اَلْعَلاَّمُ

অর্থ ঃ সর্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী।

ব্যাখ্যা ঃ একটি সঠিক ও নির্ভুল জীবন পদ্ধতি রচনার জন্য যেসব জ্ঞান ও সত্য জানা জরুরী তার সবগুলো আয়ত্ত করা মানুষের সাধ্যাতীত। এরূপ পূর্ণজ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। তিনিই সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী। তাই মানুষের জন্য কোন্‌টি হিদায়াত আর কোন্‌টি গোমরাহী, কোন্‌টি হক আর কোন্‌টি বাতিল এবং কোন্‌টি কল্যাণ আর কোন্‌টি অকল্যাণ তা তিনিই বলতে পারেন।[১০৩]

○

প্রকৃতপক্ষে কে গুণাবলীর দিক দিয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ, আর কে নিচু মর্যাদার মানুষ তা আল্লাহই ভাল জানেন। মানুষ নিজেরা নিজেদের উচ্চ নীচের যে মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। হতে পারে দুনিয়াতে যাকে অনেক উচ্চ মর্যাদার মানুষ মনে করা হতো আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালায় সে অতি নীচুস্তরের মানুষ হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং যাকে এখানে অতি নগণ্য মনে করা হয়েছে সেখানে সে অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আসল গুরুত্ব দুনিয়ার সম্মান ও লাঞ্ছনার নয়, বরং কেউ আল্লাহর কাছে যে সম্মান ও লাঞ্ছনা লাভ করবে তার। তাই যেসব গুণাবলী আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভের উপযুক্ত বানাতে পারে নিজের মধ্যে সেসব বাস্তব গুণাবলী সৃষ্টির জন্য মানুষের সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত হওয়া উচিত।[১০৪]

○

আল্লাহ অন্ধ, বধির ও বেখবর নন। বরং তিনি জ্ঞানী—সবকিছু জানেন এবং সবকিছু দেখেন। তাঁর রাজত্বে অন্ধের মত আন্দাজে কাজ কারবার হচ্ছে না।[১০৫]

○

চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিটি বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন। আর আল্লাহ্ এমন এক সত্তা যার কাছে কোনো কিছু গোপন থাকতে পারে না। এ জন্য কোনো ব্যক্তি যদি দুনিয়ায় তার ভণ্ডামী ও মুনাফিকী গোপন করতে সক্ষমও হয় এবং মানুষ যেসব মানদণ্ডে কারো ঈমান ও

আন্তরিকতা পরখ করতে পারে সেসবগুলোতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়, তবু একথা মনে করা উচিত নয় যে, সে মুনাফিকীর শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।[১০৬]

○

তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, তার নাগালের বাইরে কেউ নেই। বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো মানুষের মাটি হয়ে যাওয়া দেহের একটি কণাও তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারে না। তাই যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনকে দূরবর্তী বা অবাস্তব মনে করে সে মূলত আল্লাহর প্রজ্ঞা ও কুশলতা সম্পর্কেই বেখবর। আর যে ব্যক্তি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "মরার পরে যখন আমাদের মৃত্তিকার বিভিন্ন অণু-কণিকা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে তখন আমাদের কিভাবে পুনর্বার জীবিত করা হবে ?" সে আসলে আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ।[১০৭]

○

তিনি জানেন কে প্রকৃতপক্ষে তাঁর পথে ঘর-বাড়ী ত্যাগ করেছে এবং সে কোন্ ধরনের পুরস্কার লাভের যোগ্য।[১০৮]

○

আল্লাহ চোখ বন্ধ করে আন্দাজে যাকে তাকে পবিত্রতা দান করেন না বরং নিজের নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে দান করেন। আল্লাহ্ জানেন কে কল্যাণ চায় এবং কে অকল্যাণ আকাংখী। প্রত্যেক ব্যক্তি একান্তে যেসব কথা বলে আল্লাহ্ তা সবই শুনে থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে মনে যা চিন্তা করে আল্লাহ্ তা থেকে মোটেই বেখবর থাকেন না। এ সরাসরি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ্ ফায়সলা করেন, কাকে পবিত্রতা দান করবেন ও কাকে পবিত্রতা দান করবেন না।[১০৯]

○

সূরা আল আহ্যাবের প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○ الاحزاب : ١

"প্রকৃতপক্ষে সকল জ্ঞান ও বুদ্ধির মালিক তো আল্লাহ্ তাআলা।"
—সূরা আল আহ্যাব ঃ ১

বক্তব্যের নিগূঢ় অর্থ হচ্ছে দীনের কল্যাণ কিসে এবং কিসে নয় এ বিষয়টি আমিই ভালো জানি। কোন্ সময় কোন্ কাজটি করতে হবে এবং কোন্ কাজটি অকল্যাণকর তা আমি জানি।[১১০]

তিনি শুধু সেসব কাজ-কর্ম সম্পর্কেই অবগত নন যা মানুষের গোচরে আসে বরং সেসব কাজ-কর্ম সম্পর্কেও তিনি অবহিত যা সবার কাছেই গোপন থাকে। তাছাড়াও তিনি শুধু কাজ-কর্মের বাহ্যিক রূপটাই দেখেন না বরং মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনে কি ধরনের ইচ্ছা-আকাংখা এবং উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল, সে যা করেছে তা কি নিয়তে করেছে এবং কি বুঝে করেছে তাও তিনি জানেন।[১১১]

○

যেসব বিষয়ের প্রতি মানুষ নিকটতম আকর্ষণ অনুভব করে সেগুলো সম্পর্কেও তার কোনো জ্ঞান নেই। তাহলে সারা দুনিয়ার শেষ ক্ষণটি কবে ও কখন আসবে, একথা জানা তার পক্ষে কেমন করে সম্ভব? তোমাদের সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা বিরাটভাবে নির্ভর করে বৃষ্টির ওপর। কিন্তু আল্লাহর হাতে রয়েছে এর পুরো যোগসূত্র। যেখানে যখন যতটুকু চান বর্ষণ করান এবং যখনি চান থামিয়ে দেন। কেউ একটুও জানে না কোথায় কখন কতটুকু বৃষ্টি হবে এবং কোন্ ভূখণ্ড তা থেকে বঞ্চিত হবে অথবা কোন্ ভূখণ্ডে বৃষ্টি উল্টো ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। তোমাদের বীর্যে তোমাদের স্ত্রীদের গর্ভসঞ্চার হয় এবং এর সাথে তোমাদের বংশধারার ভবিষ্যত জড়িত। কিন্তু তোমরা জানো না এ গর্ভে কি লালিত হচ্ছে এবং কোন্ আকৃতিতে ও কোন্ ধরনের কল্যাণ বা অকল্যাণ নিয়ে তা বের হয়ে আসবে। আগামীকাল তোমাদের কি হবে তা-ও তোমরা জানো না।

একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা তোমাদের ভাগ্য বদলে দিতে পারে। কিন্তু এক মিনিট আগেও তোমরা তার খবর পাও না। তোমরা এও জানো না, তোমাদের এ জীবনের সমষ্টি ঘটবে কোথায়, কি অবস্থায়। এ সমস্ত তথ্যজ্ঞান আল্লাহ নিজেরই কাছে রেখেছেন এবং এর কোনো একটির জ্ঞানও তোমাদের দেননি। এর মধ্যে প্রত্যেকটি জিনিসই এমন যে সম্পর্কে তোমরা পূর্বাহ্নেই কিছু জানতে চাও যাতে এ জ্ঞানের সাহায্যে তোমরা আগেভাগেই কিছু পদক্ষেপ নিতে পারো। কিন্তু সেসব ব্যাপারে আল্লাহর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং তাঁর ফায়সালার ওপর ভরসা করো। এভাবে দুনিয়ার শেষক্ষণটির ব্যাপারেও আল্লাহর ফায়সালার প্রতি আস্থা স্থাপন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এর জ্ঞানই কাউকে দেয়া হয়নি এবং দেয়া যেতে পারে না।[১১২]

○

তিনি সবকিছু জানেন। অর্থাৎ তিনি অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোনো কথা বলেন না, বরং তিনি প্রতিটি বস্তু সম্পর্কেই সরাসরি জ্ঞানের অধিকারী। এ জন্য অনুভূতি ও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়ে তিনি যেসব তথ্য দিচ্ছেন কেবল সেগুলোই সঠিক হতে পারে এবং তা না মানার অর্থ হচ্ছে অযথা অজ্ঞতার অনুসরণ করা। একইভাবে তিনি জানেন কোন্ জিনিসে মানুষের উন্নতি এবং তার কল্যাণের জন্য কোন্ নীতিমালা, আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ আবশ্যক। তাঁর প্রতিটি শিক্ষা সঠিক কৌশল ও জ্ঞানভিত্তিক যার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। অতএব, তাঁর পথনির্দেশনা গ্রহণ না করার অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি নিজেই তার ধ্বংসের পথে চলতে চায়। তাছাড়া মানুষের কোনো গতিবিধি তাঁর নিকট গোপন থাকতে পারে না। এমনকি মনের যে নিয়ত ও ইচ্ছা মানুষের সমস্ত কাজ-কর্মের মূল চালিকাশক্তি তাও তিনি জানেন। তাই কোনো অজুহাত বা বাহানা দেখিয়ে মানুষ তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে না।[১১৩]

○

বিরোধিতার তুফানের মুখে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার পর যে জিনিসটি মুমিনের হৃদয়ে ধৈর্য, প্রশান্তি ও তৃপ্তি গভীর শীতলতা সৃষ্টি করে তা এ বিশ্বাস যে আল্লাহ বিষয়টি সম্পর্কে অনবহিত নন। আমরা যা করছি তাও তিনি জানেন এবং আমাদের সাথে যা করা হচ্ছে তাও তিনি জানেন। আমাদের ও আমাদের বিরোধীদের সব কথাই তিনি শুনছেন এবং উভয়ের কর্মনীতি যা কিছুই হোক না কেন তা তিনি দেখছেন। এ আস্থার কারণেই মুমিন বান্দা নিজের এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনের ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে যায়।[১১৪]

○

যদি তোমরা কখনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার নীতি গ্রহণ করো কিংবা নিজের মতামত ও ধ্যান-ধারণাকে তাঁদের নির্দেশের চেয়ে অগ্রাধিকার দান করো তাহলে জেনে রাখো তোমাদের বুঝাপড়া হবে সেই আল্লাহর সাথে যিনি তোমাদের সব কথা শুনছেন এবং মনের অভিপ্রায় পর্যন্ত অবগত আছেন।[১১৫]

○

তিনি শুধু সামগ্রিক জ্ঞানের অধিকারী নন, খুঁটিনাটি বিষয়েও জ্ঞানের অধিকারী। এক একটি শস্যদানা ও বীজ যা মাটির গভীরে প্রবিষ্ট হয়,

এক একটি ছোট পাতা ও অঙ্কুর যা মাটি ফুঁড়ে বের হয়, বৃষ্টির এক একটি বিন্দু যা আসমান থেকে পতিত হয় এবং সমুদ্র ও খালবিল থেকে যে বাষ্পরাশি আকাশের দিকে উত্থিত হয়, তার প্রতিটি মাত্রা তাঁর জানা আছে। কোন্ দানাটি ও বীজটি পৃথিবীর কোন্খানে কিভাবে পড়ে আছে তা তিনি জানেন বলেই সেটিকে বিদীর্ণ করে অঙ্কুরোদগম করেন এবং তাকে লালন পালন করে বড় করেন। কি পরিমাণ বাষ্প কোন্ কোন্ স্থানে থেকে উত্থিত হয়েছে এবং কোথায় কোথায় পৌঁছেছে তা তিনি জানেন বলেই সেগুলো একত্রিত করে মেঘমালা সৃষ্টি করেন এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের জন্য তা বন্টন করে দিয়ে একটি হিসেব অনুসারে বৃষ্টিপাত ঘটান। আর যেসব জিনিস মাটিতে প্রবেশ করে ও তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যেসব জিনিস আকাশের দিকে উঠে যায় ও তা থেকে নেমে আসে তার বিস্তারিত দিকও এর আলোকে অনুমান ও অনুধাবন করা যেতে পারে। আল্লাহ্র জ্ঞান যদি এসব বিষয়ে পরিব্যপ্ত না হতো, তাহলে প্রতিটি জিনিসই আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনা এবং প্রত্যেকটি জিনিসই এমন নিপুণ, নিখুঁত ও বিজ্ঞোচিত পন্থায় ব্যবস্থাপনা করা কিভাবে সম্ভব হতো ?[১১৬]

○

আল্লাহ্ তাআলা জানেন কোন্ ব্যক্তি প্রকৃতই ঈমানদার এবং সে কিরূপ ঈমানের অধিকারী ? তাই তিনি তার জ্ঞানের ভিত্তিতে সেই সব হৃদয়মনের অধিকারীকে হেদায়াত দান করেন যার মধ্যে ঈমান আছে এবং তার মধ্যে যে মর্যাদার ও প্রকৃতির ঈমান আছে সেই পর্যায়ের হেদায়াত তাকে দান করেন। অপর অর্থটি এও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাঁর মুমিন বান্দার অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত নন। তিনি তাকে ঈমান গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে এবং ঈমান গ্রহণের সাথে দুনিয়ার কঠিন পরীক্ষাসমূহের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাদেরকে ঐ অবস্থায়ই পরিত্যাগ করেননি। পৃথিবীতে কোন্ ঈমানদারের ওপর কি মসিবত চলছে আর কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে সে কিভাবে তার ঈমানের দাবীসমূহ পূরণ করছে তা তিনি জানেন। তাই এ বিষয়ে আস্থা রাখো যে, আল্লাহর অনুমোদনক্রমে যে মসিবতই তোমাদের ওপর আসুক না কেন আল্লাহ্র কাছে তার বৃহত্তর কোনো কল্যাণকর উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে এবং তার মধ্যে বৃহত্তর কোনো কল্যাণ লুক্কায়িত আছে। কেননা, আল্লাহ্ তাঁর ঈমানদার বান্দার কল্যাণকামী। তিনি তাদেরকে বিনা কারণে বিপদে ফেলতে চান না।[১১৭]

○

তোমরা কোনো জায়গায়ই তাঁর জ্ঞান, তাঁর অসীম ক্ষমতা, তাঁর শাসন কর্তৃত্ব এবং তাঁর ব্যবস্থাপনার আওতা বহির্ভূত নও। মাটিতে, বায়ুতে, পানিতে অথবা কোনো নিভৃত কোণে যেখানেই তোমরা থাক না কেন সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ জানেন তোমরা কোথায় আছো। সেখানে তোমাদের বেঁচে থাকাটাই একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ঐ স্থানেও তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করছেন। তোমাদের হৃদপিণ্ডে যে স্পন্দন উঠছে, তোমাদের ফুসফুস যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছে, তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি যে কাজ করছে এসব কিছুরই কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় তোমাদের দেহের সব যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজ করছে। কোনো সময় যদি তোমাদের মৃত্যু আসে তাহলে এ কারণে আসে যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থাপনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তোমাদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।[১১৮]

○

আল্লাহ তাআলা যেসব পন্থা-পদ্ধতি ও আইন-কানুন নির্ধারিত করে দিয়েছেন তা জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও যুক্তিনির্ভর। তিনি যে জিনিস হালাল করেছেন তা জ্ঞান ও হিকমাতের ভিত্তিতে হালাল করেছেন। আর যে জিনিস হারাম করেছেন তাও জ্ঞান ও হিকমাতের ভিত্তিতেই হারাম করেছেন। এটা কোনো খামখেয়ালী নয় যে, তিনি যুক্তিহীনভাবে যে জিনিসকে ইচ্ছা হালাল করেছেন এবং যে জিনিসকে ইচ্ছা হারাম করেছেন। তাই যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে তাদের বুঝা উচিত عليم (মহাজ্ঞানী) ও حكيم (প্রজ্ঞাময় ও কৌশলী) আমরা নই বরং আল্লাহই "আলীম" ও "হাকীম"। তাঁর দেয়া আদেশ-নিষেধের আনুগত্যের মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত।[১১৯]

○

মুমিনের জন্য শিক্ষা হলো, দুনিয়ায় জীবন যাপনকালে তাকে তার মন-মগজে এ অনুভূতি কার্যকর রাখতে হবে যে, তার গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা ও কাজই শুধু নয় তার নিয়ত ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত কোনো কিছুই আল্লাহর অজানা নয়। আর কাফেরের জন্য এতে সাবধানবাণী হলো এই যে, আল্লাহকে ভয় না করে সে নিজ অবস্থানে থেকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিন্তু তার কোনো একটি ব্যাপারও আল্লাহর কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের আওতা বহির্ভূত নয়।[১২০]

○

অন্য কেউ তাঁর কাজে কিভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে যখন তার কাছে এ বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপনা এবং অন্তর্নিহিত কার্যকারণ ও ফলাফল বুঝার মতো কোনো জ্ঞানই নেই ? মানুষ জিন ফেরেশতা বা অন্য কোনো সৃষ্টি হোক না কেন সবার জ্ঞান অপূর্ণ ও সীমিত। বিশ্বজাহানের সমগ্র সত্য ও রহস্য কারো দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই। তারপর কোনো একটি ক্ষুদ্রতর অংশেও যদি কোনো মানুষের স্বাধীন হস্তক্ষেপ অথবা অনড় সুপারিশ কার্যকর হয় তাহলে তো বিশ্বজগতের সমগ্র ব্যবস্থাপনাই ওলট-পালট হয়ে যাবে। বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা তো দূরের কথা মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ভালোমন্দ বুঝারও ক্ষমতা রাখে না। বিশ্বজাহানের প্রভু ও পরিচালক মহান আল্লাহই এ ভালোমন্দের পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। কাজেই এক্ষেত্রে জ্ঞানের মূল উৎস মহান আল্লাহর হেদায়াত ও পথনির্দেশনার ওপর আস্থাস্থাপন করা ছাড়া মানুষের জন্য দ্বিতীয় আর কোনো পথ নেই।[১২১]

○

আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

অর্থ ঃ গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবহিত

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আল আনআমে বলা হয়েছে ঃ

وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ط عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ط - الانعام : ٧٣

"যেদিন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। সেদিন রাজত্ব হবে একমাত্র তাঁরই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সবকিছুর জ্ঞান রাখেন।"

সূরা আত তাওবায় বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

"তারপর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু জানেন।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৯৪

وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ -

"তারপর তোমাদের তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু জানেন।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১০৫

সূরা আর রা'আদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ - الرعد : ٩

"তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান প্রত্যেক জিনিসের জ্ঞান রাখেন।"

সূরা আল মু'মিনূনে বলা হয়েছে ঃ

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

"প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু তিনি জানেন। এরা যে শিরক নির্ধারণ করে তিনি তার ধরা ছোয়ার বাইরে।"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৯২

সূরা আস্ সাজদায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

"তিনিই প্রত্যেকটি অদৃশ্য ও দৃশ্যমানকে জানেন। মহা পরাক্রমশালী ও করুণাময় তিনি।"-সূরা আস্ সাজদা ঃ ৬

সূরা সাবায় বলা হয়েছে ঃ

قُلْ بَلٰى وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ لا عٰلِمِ الْغَيْبِ ج -

"বলো, আমার অদৃশ্য জ্ঞানী পরওয়ারদেগারের কসম, তা তোমাদের ওপর অবশ্যই আসবে।"-সূরা সাবা ঃ ৩

সূরা আল ফাতিরে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

"নিসন্দেহে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত গোপন বিষয় অবগত, তিনি তো অন্তরের গোপন রহস্যও জানেন।"-সূরা ফাতির ঃ ৩৮

সূরা আয্ যুমারে বলা হয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ -

"বলো, হে আল্লাহ! আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী।"-সূরা আয্ যুমার ঃ ৪৬

সূরা আল হাশরে ইরশাদ হয়েছে ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج -

"বলো, তিনিই আল্লাহ। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী।"-সূরা আল হাশর ঃ ২২

সূরা আল জুমআয় বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ -

"অতপর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যিনি প্রকাশ্য গোপন সবকিছু জানেন।"-সূরা আল জুমআ ঃ ৮

সূরা আত তাগাবুনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

"দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত, মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"-সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৮

সূরা জিনে বলা হয়েছে ঃ

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا

"তিনি গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না।"–সূরা জিন ঃ ২৬

গায়েবী বিষয়ের সবটুকু জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। গায়েবী বিষয়ের এ পুর্ণাঙ্গ জ্ঞান তিনি আর কাউকেই দেন না।[১২২]

○

সৃষ্টির কাছে যা গোপন ও অজানা তিনি তাও জানেন আর যা তাদের কাছে প্রকাশ্য ও জানা তাও তিনি জানেন। এ বিশ্বজাহানের কোনো বস্তুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। যা অতীতে হয়ে গেছে, যা বর্তমানে আছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে তার সবকিছুই তিনি সরাসরি জানেন। এসব জানার জন্য তিনি কোনো মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন।[১২৩]

○

পৃথিবী ও আকাশে ফেরেশতা, জিন, নবী, আউলিয়া অথবা মানুষ ও অ-মানুষ যে কোনো সৃষ্টি হোক না কেন সবারই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কিছু না কিছু জিনিস সবার কাছ থেকে গোপন রয়েছে। সবকিছুর জ্ঞান যদি কারো থাকে তাহলে তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ এ বিশ্বজাহানের কোনো জিনিস এবং কোনো কথা তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সবকিছু জানেন।

গায়েব মানে প্রচ্ছন্ন, লুকানো, অদৃশ্য বা আবৃত। পারিভাষিক অর্থে গায়েব হচ্ছে এমন জিনিস যা অজানা এবং যাকে জানার উপায়-উপকরণগুলো দ্বারা আয়ত্ত করা যায় না। দুনিয়ায় এমন বহু জিনিস আছে যা এককভাবে কোনো কোনো লোক জানে এবং কোনো কোনো লোক জানে না। আবার এমন অনেক জিনিস আছে যা সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানবজাতি কখনো জানতো না, আজকেও জানে না এবং ভবিষ্যতেও কখনো জানবে না। জিন, ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টির ব্যাপারেও একথা। কতক জিনিস তাদের কারো কাছে প্রচ্ছন্ন এবং কারো কাছে প্রকাশিত। আবার অসংখ্য জিনিস এমন আছে যা তাদের সবার কাছে প্রচ্ছন্ন ও অজানা। এসব ধরনের অদৃশ্য জিনিস একমাত্র একজনের কাছে দৃশ্যমান। তিনি হচ্ছেন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্। তাঁর কাছে কোনো জিনিস অদৃশ্য নয়। সবকিছুই তাঁর কাছে সুস্পষ্টভাবে পরিদৃশ্যমান।

এখন প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির একথা ভেবে দেখা উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে একথা কি বোধগম্য ? অর্থাৎ বিশ্বজাহানে যেসব অবস্থা, বস্তু ও সত্য কখনো ছিল বা এখনো আছে কিংবা ভবিষ্যতে হবে, সেগুলো কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জানা সম্ভব! আর যদি অন্য কেউ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী না হয়ে থাকে এবং সে জ্ঞান লাভের ক্ষমতা ও যোগ্যতা আর কারো না থেকে থাকে তাহলে যারা প্রকৃত সত্য ও অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত নয় তাদের মধ্য থেকে কেউ বান্দাদের ফরিয়াদ শ্রবণকারী, অভাব মোচনকারী ও সংকট নিরসনকারী হতে পারে, একথা কি বুদ্ধিসম্মত ?

ইবাদাত-উপাসনা ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া এবং অদৃশ্য জ্ঞানের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যার ভেতরেই উপাস্য বা দেবতা বা বিশ্ববিধাতা সুলভ সর্বময় কর্তৃত্বের কোনো গন্ধও অনুমান করেছে তার সম্পর্কে একথা অবশ্যই ভেবেছে যে, তার কাছে সবকিছুই সুস্পষ্ট ও আলোকিত এবং কোনো জিনিস তার অগোচরে নেই। অর্থাৎ মানুষের মন এ সত্যটি সুস্পষ্ট-ভাবে জানে যে, ভাগ্যের ভাঙা-গড়া, ফরিয়াদ শোনা, প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং প্রত্যেক সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করা কেবলমাত্র এমন এক সত্তার কাজ হতে পারে যিনি সবকিছু জানেন এবং যার কাছে কোনো কিছুই গোপন নেই। এ কারণে তো মানুষ যাকেই সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পন্ন মনে করে তাকে অবশ্যই অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারীও মনে করে। কারণ তার বুদ্ধি নিসন্দেহে সাক্ষ্য দেয়, জ্ঞান ও ক্ষমতা পরস্পর অংগাংগীভাবে সম্পর্কিত, একটির জন্য অন্যটি অনিবার্য। এখন যদি এটি সত্য হয়ে থাকে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ স্রষ্টা, ব্যবস্থাপক, ফরিয়াদ শ্রবণকারী ও রিযিকদাতা নেই, যেমন উপরের আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে সাথে সাথে এটিও সত্য যে, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সত্তা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারীও নয়। কোন্ বুদ্ধি সচেতন ব্যক্তি একথা কল্পনা করতে পারে যে, কোনো ফেরেশতা, জিন, নবী, অলী বা কোনো সৃষ্টি সাগরের বুকে, বাতাসের মধ্যে এবং মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তরে ও তার উপরিভাগে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ প্রকারের কত প্রাণী আছে, মহাশূন্যের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের সঠিক সংখ্যা কত, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কোন্ কোন্ ধরনের সৃষ্টি বিরাজ করছে এবং এ সৃষ্টিগুলোর প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অবস্থান কোথায় এবং তার প্রয়োজনসমূহ কি কি তা জানে ? এসব কিছু আল্লাহর অপরিহার্যভাবে জানা থাকতে হবে। কারণ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন,

তাঁকেই তাদের যাবতীয় ব্যাপার পরিচালনা এবং তাদের যাবতীয় অবস্থা দেখাশুনা করতে হয় আর তিনিই তাদের জীবিকা সরবরাহকারী। কিন্তু অন্য কেউ তার নিজের সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের মধ্যে এ ব্যাপক ও সর্বময় জ্ঞান কেমন করে রাখতে পারে ? সৃষ্টি ও জীবিকাদানের কর্মের সাথে তার কোন্ সম্পর্ক আছে যে, সে এসব জিনিস জানবে ?

আবার অদৃশ্য জ্ঞানের গুণটি বিভাজ্যও নয়। উদাহরণস্বরূপ কেবলমাত্র পৃথিবীর সীমানা পর্যন্ত এবং শুধুমাত্র মানুষের ব্যাপারে কোনো মানুষ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হবে, এটা সম্ভব নয়। আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, স্থিতিস্থাপক ও প্রতিপালক হওয়ার গুণগুলো যেমন বিভক্ত হতে পারে না। তেমনি এ গুণটিও বিভক্ত হতে পারে না। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো মানুষ দুনিয়ায় জন্ম নিয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম নেবে মাতৃ জরায়ুতে গর্ভসঞ্চার হওয়ার সময় থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের সবার সকল অবস্থা ও পরিস্থিতি জানতে পারে এমন মানুষটি কে হতে পারে ? সে মানুষটি কেমন করে এবং কেন তা জানবে ? সে কি এ সীমাসংখ্যাহীন সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা ? সে কি তাদের পিতৃপুরুষদের বীর্যে তাদের বীজানু উৎপন্ন করেছিল ? সে কি তাদের মাতৃগর্ভে তাদের আকৃতি নির্মাণ করেছিল ? মাতৃগর্ভের সেই মাংসপিণ্ডটি জীবিত ভূমিষ্ঠ হওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা কি সে করেছিল ? সে কি তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগ্য তৈরি করেছিল ? সে কি তাদের জীবন-মৃত্যু, রোগ-স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি, দারিদ্র্য ও উত্থান পতনের ফায়সালা করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল ? এসব কাজ কবে থেকে তার দায়িত্বে এসেছে ? তার নিজের জন্মের আগে, না পরে ? আর কেবল মানুষের মধ্যে এ দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হতে পারে কেমন করে ? একাজ তো অনিবার্যভাবে পৃথিবী ও আকাশের বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। যে সত্তা সমগ্র বিশ্বজাহানের ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন তিনিই তো মানুষের জন্ম-মৃত্যু, তাদের জীবিকার সংকীর্ণতা ও সচ্ছলতার এবং তাদের ভাগ্যের ভাঙা-গড়ার জন্য দায়িত্বশীল হতে পারেন।

তাই আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নয়, এটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস।[১২৪]

○

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে চান যতটুকু চান জ্ঞান দান করেন। কোনো অদৃশ্য বা কতগুলো অদৃশ্য জিনিসকে তার সামনে উন্মুক্ত

করে দেন। কিন্তু অদৃশ্য জ্ঞান সামগ্রিকভাবে কেউ লাভ করতে পারে না এবং "আলিমুল গাইব" অদৃশ্য জ্ঞানী উপাধি একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রাপ্য।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ ط - الانعام : ٥٩

"আর তাঁর কাছেই আছে অদৃশ্যের চাবিগুলো, সেগুলোর খবর তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।"–সূরা আল আনআম ঃ ৫৯

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ط -

"একমাত্র আল্লাহই রাখেন কিয়ামতের জ্ঞান। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কি (লালিত) হচ্ছে, কোনো প্রাণী জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কোনো প্রাণী জানে না কোন্ ভূমিতে তার মৃত্যু হবে।"–সূরা লুকমান ঃ ৩৪

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ ج

"তিনি জানেন যা কিছু সৃষ্টির সামনে আছে এবং যা কিছু আছে তাদের অগোচরে। আর তাঁর জ্ঞানের কিছুমাত্র অংশও তারা আয়ত্ত করতে পারে না, তবে তিনি যে জিনিসটির জ্ঞান তাদেরকে দিতে চান, দেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫

কোনো সৃষ্টি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে এ ধারণা কুরআন সর্বতোভাবে নাকচ করে দেয়। এমনকি বিশেষভাবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারেও এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে, তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নন এবং তাঁকে অদৃশ্যের কেবলমাত্র ততটুকু জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে যতটুকু রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন ছিল। সূরা আল আন'আম ঃ ৫০, সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৮৭, সূরা আত তাওবা ঃ ১০১, সূরা হূদ ঃ ৩১, সূরা আল আহযাব ঃ ৬৩, সূরা আল আহকাফ ঃ ৯, সূরা আত তাহরীম ঃ ৩ এবং সূরা জিন ঃ ২৬ আয়াত এ ব্যাপারে কোনো প্রকার অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের অবকাশই রাখেনি।

কুরআনের এ সমস্ত সুস্পষ্ট ভাষণ আলোচ্য আয়াতটির বক্তব্য সমর্থন ও ব্যাখ্যা করে। এরপর এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করা

এবং যা কিছু আছে ও যা কিছু হবে এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো আছে—একথা মনে করা পুরোপুরি একটি অনৈসলামী বিশ্বাস। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইমাম আহমাদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম নির্ভুল বর্ণনা পরম্পরায় হযরত আয়েশা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

مَنْ زَعَمَ اَنَّهٗ (اى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَعْلَمُ مَا يَكُوْنُ فِىْ غَدٍ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهِ الْفِرْيَةَ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

"যে ব্যক্তি দাবী করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগামী কাল কি হবে তা জানেন, সে আল্লাহর প্রতি মহা মিথ্যা আরোপ করে। কারণ আল্লাহ তো বলেন, হে নবী! তুমি বলে দাও আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে আর কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না।"

ইবনুল মুনযির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) প্রখ্যাত শিষ্য হযরত ইকরামা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, "হে মুহাম্মদ! কিয়ামত কবে আসবে ? আমাদের দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকায় বৃষ্টি কবে হবে ? আর আমার গর্ভবতী স্ত্রী ছেলে না মেয়ে প্রসব করবে ? আর আজ আমি কি উপার্জন করেছি তাতো আমি জানি কিন্তু আগামীকাল আমি কি উপার্জন করবো ? আর আমি কোথায় জন্মেছি তাতো আমি জানি কিন্তু আমি মরবো কোথায় ?" এ প্রশ্নগুলোর জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিপূর্বে আমাদের উল্লেখিত সূরা লুকমানের আয়াতটি শুনিয়ে দেন। এছাড়া বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের একটি বহুল পরিচিত হাদীসও এর সমর্থন করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ সাহাবীগণের সমাবেশে হযরত জিবরাঈল মানুষের বেশে এসে নবীকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তার একটি এও ছিল যে, কিয়ামত কবে হবে ? নবী (সা) জবাব দিয়েছিলেন ঃ

مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ـ

"যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সে জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে এ ব্যাপারে বেশী জানে না।"[১২৫]

○

অন্য যেই হোক না কেন তার কাছে একটি জিনিস প্রকাশিত থাকলে অন্য অসংখ্য জিনিস রয়েছে অপ্রকাশিত। ফেরেশতা, জিন, নবী, ওলী অথবা আল্লাহর নির্বাচিত পছন্দনীয় বান্দাগণ যেই হোন না কেন তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি সবকিছু জানেন। একমাত্র আল্লাহ্ এ গুণের অধিকারী, তাঁর কাছে সবকিছুই দিনের আলোকের মতই উজ্জ্বল। যা কিছু হয়ে গেছে, যা কিছু বর্তমান, যা কিছু হবে সবই তার কাছে সমান আলোকোজ্জ্বল।[১২৬]

○

সবাই জানে, পার্থিব কোনো শক্তিই দেখা ও না দেখা বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী নয়। তার দৃষ্টিতে বাইরে অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। যে কোনো পার্থিব শক্তির পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য অসংখ্য কৌশল ও ফন্দি-ফিকির অবলম্বন সম্ভব। এছাড়াও পার্থিব শক্তির রচিত আইন ব্যবস্থা সব রকমের অপরাধকে তার আওতাধীন করতে পারে না। বেশীর ভাগ অপরাধই এমন পর্যায়ের, পার্থিব আইন-কানুন যার ওপর আদৌ কোনো হস্তক্ষেপ করে না। অথচ পার্থিব আইন ব্যবস্থা যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে সেগুলোর চেয়ে তা জঘন্য। তাই ইসলামী জীবন বিধান নৈতিকতার প্রাসাদ এমন একটি বুনিয়াদের ওপর নির্মাণ করেছে, যার ভিত্তিতে অদৃশ্য আল্লাহর ভয়ে সব খারাপ কাজ বর্জন করতে হয়। যে আল্লাহ্ সর্বাবস্থায় মানুষকে দেখছেন, যার হস্তক্ষেপ ও পাকড়াও থেকে নিজেকে রক্ষা করে মানুষ কোথাও যেতে সক্ষম নয়। যিনি মানুষকে ভাল ও মন্দ যাচাইয়ের জন্য একটি সার্বিক, বিশ্বজনীন এবং পূর্ণাঙ্গ মানদণ্ড দিয়েছেন, শুধু তাঁর ভয়ে মন্দ ও অকল্যাণকে বর্জন করা এবং ভাল ও কল্যাণকে গ্রহণ করা এমন একটি কল্যাণকর নীতি যা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান। এ কারণটি ছাড়া যদি অন্য কোনো কারণে কোনো মানুষ অন্যায় না করে কিংবা বাহ্যিকভাবে যেসব কাজ নেকীর কাজ বলে গণ্য হয় তা করে তাহলে তার এ নৈতিকতা আখেরাতে কোনো মূল্য ও মর্যাদালাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। কারণ তা হবে বালির স্তূপের ওপর নির্মিত প্রাসাদের মতো।[১২৭]

○

যেসব বিষয়ের প্রতি মানুষ নিকটতম আকর্ষণ অনুভব করে সেগুলো সম্পর্কেও তার কোনো জ্ঞান নেই। তাহলে সারা দুনিয়ার শেষ ক্ষণটি কবে ও কখন আসবে, একথা জানা তার পক্ষে কেমন করে সম্ভব ? তোমাদের সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা বিরাটভাবে নির্ভর করে বৃষ্টির ওপর। কিন্তু

আল্লাহর হাতে রয়েছে এর পুরো যোগসূত্র। যেখানে যখন যতটুকু চান বর্ষণ করান এবং যখনি চান থামিয়ে দেন। কেউ একটুও জানে না কোথায় কখন কতটুকু বৃষ্টি হবে এবং কোন্ ভূখণ্ড তা থেকে বঞ্চিত হবে অথবা কোন্ ভূখণ্ডে বৃষ্টি উল্টো ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। তোমাদের বীর্যে তোমাদের স্ত্রীদের গর্ভসঞ্চার হয় এবং এর সাথে তোমাদের বংশধারার ভবিষ্যত জড়িত। কিন্তু তোমরা জানো না এ গর্ভে কি লালিত হচ্ছে এবং কোন্ আকৃতিতে ও কোন্ ধরনের কল্যাণ বা অকল্যাণ নিয়ে তা বের হয়ে আসবে। আগামীকাল তোমাদের কি হবে তা-ও তোমরা জানো না।

একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা তোমাদের ভাগ্য বদলে দিতে পারে। কিন্তু এক মিনিট আগেও তোমরা তার খবর পাও না। তোমরা এও জানো না, তোমাদের এ জীবনের সমাপ্তি ঘটবে কোথায়, কি অবস্থায়। এ সমস্ত তথ্যজ্ঞান আল্লাহ নিজেরই কাছে রেখেছেন এবং এর কোনো একটির জ্ঞানও তোমাদের দেননি। এর মধ্যে প্রত্যেকটি জিনিসই এমন যে সম্পর্কে তোমরা পূর্বাহ্নেই কিছু জানতে চাও যাতে এ জ্ঞানের সাহায্যে তোমরা আগেভাগেই কিছু পদক্ষেপ নিতে পারো। কিন্তু সেসব ব্যাপারে আল্লাহর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং তাঁর ফায়সালার ওপর ভরসা করো। এভাবে দুনিয়ার শেষক্ষণটির ব্যাপারেও আল্লাহর ফায়সালার প্রতি আস্থা স্থাপন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এর জ্ঞানও কাউকে দেয়া হয়নি এবং দেয়া যেতে পারে না।

গায়েব এমন জিনিসকে বলা হয় যা সৃষ্টির অগোচরে এবং একমাত্র আল্লাহর দৃষ্টি সমক্ষে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ গায়েবের কোনো সীমা পরিসীমা নেই।[১২৮]

○

২৭

আল কাবিদু : اَلْقَابِضُ

অর্থ : হ্রাসকারী, সমবেতকারী।

ব্যাখ্যা : আল কুরআনে বলা হয়েছে :

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ط وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ص وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ البقرة : ٢٤٥

"তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দিতে প্রস্তুত, যাতে আল্লাহ্ তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে তাকে ফেরত দেবেন ? কমাবার ক্ষমতা আল্লাহর আছে, বাড়াবারও এবং তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"–সূরা আল বাকারা : ২৪৫

কুরআন মজীদে যমীন ও আসমানে আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের চিত্র অংকনের জন্য যমীন হাতের মুঠিতে থাকা এবং আসমান ডান হাতে পেঁচানো থাকা রূপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন মানুষ ছোট একটি বলকে যেমন মুঠির মধ্যে পুরে নেয় এবং তার জন্য তা একটা মামুলি ব্যাপার ঠিক তেমনি কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ (যারা আজ আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের অনুমান করতেও অক্ষম) নিজ চোখে দেখতে পাবে যমীন ও আসমান আল্লাহর কুদরতের হাতে একটা নগণ্যতম বল ও ছোট একটি রুমালের মত। মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে জারীর প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এবং হযরত আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে উঠে খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবা দানের সময় তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন : আল্লাহ তাআলা আসমান ও যমীনকে (অর্থাৎ গ্রহসমূহকে) তাঁর মুষ্ঠির মধ্যে নিয়ে এমনভাবে ঘুরাবেন—যেমন শিশুরা বল ঘুরিয়ে থাকে—এবং বলবেন : আমিই একমাত্র আল্লাহ ! আমি বাদশাহ ! আমি সর্বশক্তিমান। আমি বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মালিক। কোথায় পৃথিবীর বাদশাহরা ? কোথায় শক্তিমানেরা ? কোথায় অহংকারীরা ? এভাবে বলতে বলতে নবী (স) এমনভাবে কাঁপতে থাকলেন যে, তিনি মিম্বর থেকে পড়ে না যান আমাদের সে ভয় হতে লাগলো।[১২৯]

○

সূরা ফুরকানের ৪৬ আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করছেন ঃ

ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا - الفرقان : ٤٦

"আমি এ ছায়াকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে গুটিয়ে নিতে থাকি।"

মুশরিকদেরকে বলা হচ্ছে, যদি তোমরা পৃথিবীতে পশুর মতো জীবন ধারণ না করতে এবং কিছুটা বুদ্ধি-বিবেচনা ও সচেতনতার সাথে এগিয়ে চলতে, তাহলে প্রতিনিয়ত তোমরা এই যে ছায়া দেখতে পাচ্ছো এটিই তোমাদের এ শিক্ষা দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, নবী তোমাদের যে তাওহীদের শিক্ষা দিচ্ছেন তা যথার্থই সত্য ও সঠিক। তোমাদের সারা জীবন এ ছায়ার জোয়ার-ভাটার সাথে বিজড়িত। যদি চিরন্তন ছায়া হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে কোনো প্রাণী এমন কি উদ্ভিদও জীবিত থাকতে পারে না। কারণ সূর্যের আলো ও উত্তাপের ওপর তাদের সবার জীবন নির্ভর করে। ছায়া যদি একেবারেই না থাকে তাহলেও জীবন অসাধ্য। কারণ সর্বক্ষণ সূর্যের মুখোমুখি থাকার এবং তার রশ্মি থেকে কোনো আড়াল না পাওয়ার ফলে কোনো প্রাণী এবং কোনো উদ্ভিদও বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। বরং পানিও উধাও হয়ে যাবে। রোদ ও ছায়ার মধ্যে যদি হঠাৎ করে পরিবর্তন হতে থাকে তাহলে পৃথিবীর সৃষ্টিকুল পরিবেশের এসব আকস্মিক পরিবর্তন বেশীক্ষণ বরদাশ্‌ত করতে পারবে না। কিন্তু একজন মহাজ্ঞানী স্রষ্টা ও সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে এমন একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন যার ফলে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ধীরে ধীরে ছায়া পড়ে ও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় এবং রোদ ক্রমান্বয়ে বের হয়ে আসে এবং বাড়তে ও কমতে থাকে।[১৩০]

○

আল বাসিতু ঃ اَلْبَاسِطُ

অর্থ ঃ প্রশস্তকারী, বিস্তারকারী, সম্প্রসারণকারী।

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط - الرعد : ٢٦

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক সম্প্রসারিত করেন এবং যাকে চান মাপা-জোকা রিযিক দান করেন।"-সূরা আর রাআদ ঃ ২৬

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط - بنى اسراء يل : ٣٠

"নিশ্চয় তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন আবার যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন।"-সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩০

وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ج - القصص : ٨٢

"আফসোস আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সীমিত রিযিক দেন।"-সূরা আল কাসাস ঃ ৮২

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ط - العنكبوت : ٦٢

"আল্লাহই তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রসারিত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন।"-সূরা আনকাবূত ঃ ৬২

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط - الروم : ٣٧

"এরা কি দেখে না আল্লাহই যাকে চান তার রিযিক সম্প্রসারিত করেন এবং সংকীর্ণ করেন (যাকে চান) ?"-সূরা আর রূম ঃ ৩৭

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ - سبا : ٣٦

"হে নবী ! তাদেরকে বলে দাও, আমার রব যাকে চান প্রশস্ত রিযিক দান করেন এবং যাকে চান মাপ-জোকা দান করেন।"

-সূরা সাবা ঃ ৩৬

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ط - سبا : ٣٩

"হে নবী! তাদেরকে বলো, আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান মুক্তহস্তে রিযিক দান করেন এবং যাকে চান মাপাজোকা দেন।"–সূরা সাবা ঃ ৩৯

أَوَ لَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط - الزمر : ٥٢

"তারা কি জানে না, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রিযিক সংকীর্ণ করে দেন ?"–সূরা যুমার ঃ ৫২

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ الشورى : ١٢

"যাকে ইচ্ছা অঢেল রিযিক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা মেপে দেন। তিনি সবকিছু জানেন।"–সূরা আশ শূরা ঃ ১২

রিযিক কমবেশী হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত, তাঁর সন্তুষ্টির সাথে নয়। আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে ভালো-মন্দ সব রকমের মানুষ রিযিক লাভ করছে। যারা আল্লাহকে মেনে নিয়েছে তারাও রিযিক পাচ্ছে এবং যারা অস্বীকার করেছে তারাও। প্রচুর রিযিক লাভকারীর আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হবার কথা প্রমাণ করে না। আবার অন্যদিকে কম রিযিক লাভ বা রিযিকের অভাব অভাবীর প্রতি আল্লাহ্র ক্রোধান্বিত হবার আলামত পেশ করে না। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী একজন যালেম এবং বেঈমান লোকও আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। অথচ যুলুম ও বেঈমানী আল্লাহ্ পসন্দ করেন না। পক্ষান্তরে আল্লাহরই ইচ্ছার অধীনে একজন সত্যাশ্রয়ী ও ঈমানদার ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও কষ্টসহ্য করতে থাকে অথচ আল্লাহ্ সত্যবাদিতা ও ঈমানদারী পছন্দ করেন। কাজেই বস্তুগত স্বার্থ ও মুনাফা অর্জনকে যে ব্যক্তি ভালো ও মন্দের মাপকাঠি গণ্য করে সে বিরাট ভুলের শিকার ও পথভ্রষ্ট। আসল জিনিস হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং এটি অর্জিত হয় এমন সব নৈতিক গুণাবলীর মাধ্যমে যা আল্লাহ্ পসন্দ করেন। এ গুণাবলীর সাথে কেউ যদি দুনিয়ার নিয়ামতগুলোও লাভ করে তাহলে নিসন্দেহে তা হবে আল্লাহ্র দান এবং এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি নৈতিক গুণাবলীর দিক দিয়ে আল্লাহ্র বিদ্রোহী ও নাফরমান বান্দা হয়ে থাকে এবং এ সংগে তাকে দুনিয়ার নিয়ামতও দান করা হয়, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে কঠিন জাবাবদিহি ও নিকৃষ্টতম শাস্তি ভোগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।[১৩১]

○

মহান আল্লাহ্ নিজের বান্দাদের মধ্যে রিযিক কমবেশী করার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রেখেছেন তার উপযোগিতা বুঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই রিযিক বণ্টনের যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রয়েছে কৃত্রিম মানবিক কৌশলের মাধ্যমে তার মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা উচিত। প্রাকৃতিক অসাম্যকে কৃত্রিম সাম্যে পরিবর্তিত করা অথবা এ অসাম্যকে প্রাকৃতিক সীমার চৌহদ্দী পার করিয়ে বেইনসাফীর সীমানায় পৌঁছিয়ে দেয়া উভয়টিই সমান ভুল। একটি সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবস্থান আল্লাহ্ নির্ধারিত রিযিক বণ্টন পদ্ধতির নিকটতরই হয়ে থাকে।[১৩২]

○

আল খাফিদু : اَلْخَافِضُ

আর রাফিউ : اَلرَّافِعُ

অর্থ : পতনকারী, উন্নয়নকারী।

এ দুটি নাম কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলার নাম হিসেবে অবতীর্ণ হয়নি।

ব্যাখ্যা : সূরা আল মুজাদালায় বলা হয়েছে :

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ - المجادلة : ١١

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ উন্নীত করবেন।"–সূরা আল মুজাদালা : ১১

আল্লাহর কাছে মিথ্যা, কলুষিত ও ক্ষতিকারক কথা কখনো উচ্চ মর্যাদা লাভ করে না। তাঁর কাছে একমাত্র এমন কথা উচ্চ মর্যাদা লাভ করে যা হয় সত্য, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন, বাস্তব ভিত্তিক, যার মধ্যে সদিচ্ছা সহকারে একটি ন্যায়নিষ্ঠ আকীদা-বিশ্বাস ও একটি সঠিক চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। তারপর একটি পবিত্র কথাকে যে জিনিসটি উচ্চ মর্যাদার দিকে নিয়ে যায় সেটি হচ্ছে কথা অনুযায়ী কাজ। যেখানে কথা খুবই পবিত্র কিন্তু কাজ তার বিপরীত সেখানে কথার পবিত্রতা নিস্তেজ ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র মুখে কথার খই ফুটালে কোনো কথা উচ্চমর্যাদায় উন্নীত হয় না বরং এ জন্য সৎকাজের শক্তিমত্তার প্রয়োজন হয়।[১৩৩]

○

আল্লাহর কাছে অধিকতর মার্যাদা হবে সে ব্যক্তির যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য দ্বারা ঈমান ও ইসলামী জ্ঞানের মতো অমূল্য সম্পদ আহরণ করেছে এবং মু'মিন সুলভ স্বভাব ও চরিত্র অর্জন করেছে।[১৩৪]

○

সূরা আর রাহমানের সপ্তম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا 'আসমানকে তিনিই সুউচ্চ করেছেন।'

সূরা আল গাশিয়ায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ـ الغاشية : ١٨

"আকাশ দেখছে না কিভাবে তাকে উঠানো হয়েছে ?"

–সূরা আল গাশিয়া ঃ ১৮

সূরা ইউসুফের ৭৬নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ـ يوسف : ٧٦

"যাকে চাই তার মর্তবা আমি বুলন্দ করে দেই।"–সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬

এক ব্যক্তি যখন তার মানবিক দুর্বলতার কারণে নিজে কোনো পদস্খলনের শিকার হয় তখন আল্লাহ্ অদৃশ্য থেকে তাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন, তার জন্য এর চেয়ে বড় মর্যাদা আর কি হতে পারে। এ ধরনের উন্নত মর্যাদা একমাত্র তারাই লাভ করতে পারেন যাঁরা নিজেদের প্রচেষ্টা ও কর্মের মাধ্যমে বড় বড় পরীক্ষায় নিজেদের 'মুহসিন' তথা সৎকর্মশীল হওয়া প্রমাণ করে দিয়েছেন।[১৩৫]

○

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সূরা আনআমে বলা হয়েছে ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ط نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ط ـ

"ইবরাহীমকে তাঁর জাতির মুকাবিলায় আমি এ যুক্তি-প্রমাণ প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে চাই উন্নতমর্যাদা দান করি।"

-সূরা আল আনআম ঃ ৮৪

সূরা আর রাআদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ـ الرعد : ٢

"আল্লাহই আকাশসমূহ স্থাপন করেছেন এমন কোনো স্তম্ভ ছাড়াই যা তোমরা দেখতে পাও।"–সূরা আর রা'আদ ঃ ২

আকাশসমূহকে অদৃশ্য ও অনুনুভূত স্তম্ভসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপাতদৃষ্টে মহাশূন্যে এমন কোনো জিনিস নেই, যা এ

সীমাহীন মহাকাশ ও নক্ষত্র জগতকে ধরে রেখেছে। কিন্তু একটি অননুভূত শক্তি তাদের প্রত্যেককে তার নিজের স্থানে ও আবর্তন পথের ওপর আটকে রেখেছে এবং মহাকাশের এ বিশাল বিশাল নক্ষত্রগুলোকে পৃথিবী পৃষ্ঠে বা তাদের পরস্পরের ওপর পড়ে যেতে দিচ্ছে না।[১৩৬]

○

নবীগণের মর্যাদার ব্যাপারে সূরা আল বাকারায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ م مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ط - البقرة : ٢٥٣

"এ রসূলদের (যারা আমার পক্ষ থেকে মানবতার হেদায়াতের জন্য নিযুক্ত) একজনকে আর একজনের ওপর আমি অধিক মর্যাদাশালী করেছি। তাদের কারো সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, কাউকে তিনি অন্য দিক দিয়ে উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন।"—আয়াত ঃ ২৫৩

সূরা আয্ যুখরুফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ط -

"এদের মধ্য থেকে কিছু লোককে অপর কিছুসংখ্যক লোকের ওপর অনেক বেশী মর্যাদা দিয়েছি, যাতে এরা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে।"—সূরা আয্ যুখরুফে ঃ ৩২

আমিই মানুষের মধ্যে রিযিক, ক্ষমতা, মর্যাদা, খ্যাতি, সম্পদ ও শাসন কর্তৃত্ব ইত্যাদি বণ্টন করছি। যে আমার পক্ষ থেকে সৌভাগ্য লাভ করে কেউ তার মর্যাদাহানি করতে পারে না। আর আমার পক্ষ থেকে যার জন্য দুর্ভাগ্য ও অধপতন এসে যায় কেউ তাকে পতন থেকে রক্ষা করতে পারে না। আমার সিদ্ধান্তের মুকাবিলায় মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও কৌশল কোনো কাজেই আসে না। এ বিশ্বজনীন খোদায়ী ব্যবস্থাপনায় বিশ্বজাহানের অধিপতি কাকে তাঁর নবী বানাবেন আর কাকে বানাবেন না সে ব্যাপারে এসব লোক কি ফায়সালা করতে চায়?[১৩৭]

○

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

وَرَافِعُكَ اِلَىَّ - ال عمران : ٥٥

"এবং তোমাকে আমার নিজের দিকে উঠিয়ে নেবো।"-আলে ইমরান ঃ ৫৫

এবং সূরা আন নিসার ১৫৮নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ط - النساء : ١٥٨

"বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন।"-সূরা নিসা ঃ ১৫৮

এ ব্যাপারে দৃঢ়তা সহকারে যে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা কেবল এতটুকু যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে ইহুদীরা কামিয়াব হয়নি এবং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন।[১৩৮]

○

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হলো ঃ

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ○ الانشرح : ٤

"আর তোমার জন্য তোমার খ্যাতির কথা বুলন্দ করে দিয়েছি।"
–সূরা ইনশিরাহ ঃ ৪

যে সময় একথা বলা হয়েছিল তখন কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, মাত্র হাতে গোণা কয়েকজন লোক যে ব্যক্তির সংগী হয়েছে এবং কেবলমাত্র মক্কা শহরের মধ্যে যার সমস্ত কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ, তাঁর আওয়াজ আবার কেমন করে সারা দুনিয়ায় বুলন্দ হবে এবং কোনো ধরনের খ্যাতিই বা তিনি অর্জন করবেন। কিন্তু এই অবস্থায় আল্লাহ তাঁর রসূলকে এ সুসংবাদ দিলেন এবং অদ্ভূত পদ্ধতিতে তা বাস্তবায়িতও করলেন। সর্বপ্রথম তাঁর নাম বুলন্দ ও তাঁর চর্চা ব্যাপক করার কাজ সম্পন্ন করলেন তিনি তাঁর শত্রুদের সাহায্যে। মক্কার কাফেররা তাঁর ক্ষতি করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করলো। এর মধ্যে একটি পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ ঃ হজ্জের সময় আরবের সমগ্র এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক লোক মক্কা শহরে জমায়েত হতো। এ সময় কাফেরদের প্রতিনিধি দল হাজীদের প্রত্যেকটি তাঁবুতে যেতো এবং তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতো যে, এখানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে একজন ভয়ংকর লোকের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি লোকদের ওপর এমনভাবে যাদু করেন যার ফলে পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই ও স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কাজেই আপনারা তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবেন। হজ্জের মওসুম ছাড়া অন্যান্য

দিনেও যারা কাবা শরীফ যিয়ারত করতে আসতো অথবা ব্যবসায় উপলক্ষে যারা মক্কায় আসতো তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে দূর্ণাম রটাতো। কিন্তু এর ফলে আরবের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায়ও তাঁর নাম পৌছে গেলো। মক্কার অপরিচিত গণ্ডীর ভেতর থেকে বের করে এনে শত্রুরাই সারা আরব দেশের বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল। এরপর লোকদের মনে এ প্রশ্ন জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, এ লোকটি কে ? কি বলতে চায় ? সে কেমন লোক ? তার যাদুতে কারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং তাদের ওপর তার যাদুর কি প্রভাব পড়ছে? মক্কার কাফেরদের প্রচারণা যতবেশী বেড়েছে লোকদের মধ্যে এ জানার আগ্রহও ততবেশী বেড়েছে। তারপর অনুসন্ধানের মাধ্যমে লোকেরা তাঁকে জেনেছে। তাঁর চরিত্র ও কাজ কারবারের সাথে পরিচিত হয়েছে। লোকেরা কুরআন শুনেছে। তিনি যেসব বিষয় পেশ করেছেন সেগুলি জেনেছে। যখন তারা দেখলো, যে জিনিসকে যাদু বলা হচ্ছে, তাতে যারা প্রভাবিত হয়েছে তাদের জীবনধারা আরবের সাধারণ লোকদের জীবন-ধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে, তখন দুর্ণাম সুনামে রূপান্তরিত হয়ে যেতে লাগলো। এমন কি হিজরতের আগেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলো যার ফলে দূরের ও কাছের এমন কোনো আরব গোত্রই ছিল না যার কোনো না কোনো লোক বা পুরো পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং যার কিছু না কিছু লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দাওয়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল ও আগ্রহী হয়ে ওঠেনি। এটি ছিল তাঁর খ্যাতির কথা বুলন্দ হবার প্রথম পর্যায়। এরপর হিজরতের পর থেকে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়ে গেলো। এর মধ্যে একদিকে মুনাফিক, ইহুদি ও সমগ্র আরবের মুশরিক প্রধানরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্ণাম রটাতে তৎপর হয়ে উঠলো এবং অন্যদিকে মদীনা তাইয়েবার ইসলামী রাষ্ট্রটি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আল্লাহ ভীতি, তাকওয়া, ইবাদাত-বন্দেগী, চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা, সুষ্ঠু সামাজিকতা, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা, মানবিক সাম্য, ধনীদের বদান্যতা, গরীবদেরকে সাহায্য সহায়তা দান, অংগীকার ও শপথ রক্ষা এবং মানুষের সাথে ব্যবহার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সততার এমন বাস্তব নমুনা পেশ করছিল, যা মানুষের হৃদয় জয় করে চলছিল। শত্রুরা যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁর এই বর্ধিষ্ণু প্রভাব বিলীন করতে চাইলো। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে ঈমানদারদের শক্তিশালী জামায়াত তৈরী হয়েছিল : নিয়ম-শৃংখলা, বীরত্ব-সাহসিকতা, মৃত্যুকে ভয় না করা এবং যুদ্ধাবস্থায়ও নৈতিক সীমারেখাকে কঠোরভাবে

মেনে চলার মাধ্যমে এই জামায়াত নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যার ফলে সমগ্র আরব তার প্রভাবাধীন হয়ে গেলো। দশ বছরের মধ্যে তাঁর খ্যাতির কথা বুলন্দ হয়ে গেলো। অর্থাৎ যে দেশে তাঁর বিরোধীরা তাঁকে বদনাম করার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তার সমগ্র এলাকায় এবং প্রত্যন্ত প্রদেশে ও সর্বত্র "আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলূল্লাহ"-এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। তারপর এ তৃতীয় পর্যায়টি শুরু হলো খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামল থেকে। সে সময় তাঁর মুবারক নাম সারা দুনিয়ায় উচ্চারিত হতে থাকলো। এ সিলসিলাটি আজ পর্যন্ত বেড়েই চলছে। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বেড়ে যেতেই থাকবে। দুনিয়ার এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে মুসলমানদের কোনো জনপদ নেই এবং দিনের মধ্যে পাঁচবার আযানের মধ্যে বুলন্দ আওয়াজে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের ঘোষণা করা হচ্ছে না, নামাযে রসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর দরূদ পড়া হচ্ছে না, জুম'আর খুতবায় তাঁর পবিত্র নাম পাঠ করা হচ্ছে না এবং বছরের বারো মাসের মধ্যে কোনো সময় এমন নেই যখন সারা দুনিয়ার কোনো না কোনো জায়গায় তাঁর মুবারক নাম উচ্চারিত হচ্ছে না। নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে যখন আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন ঃ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (আর তোমার নাম ও খ্যাতির কথা আমি বুলন্দ করে দিয়েছি অর্থাৎ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সম্প্রচার করেছি।) তখন কেউ একথা অনুমানই করতে পারতো না যে, এমন সাড়ম্বরে ও ব্যাপকভাবে এ নাম বুলন্দ করার কাজটি সম্পন্ন হবে। এটি কুরআনের সত্যতার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জিবরাঈল আমার কাছে আসেন। আমাকে বলেন, আমার রব ও আপনার রব জিজ্ঞেস করেছেন —আমি কিভাবে তোমার নাম বুলন্দ رَفَعَ ذِكْر করেছি ? আমি আরজ করি, আল্লাহ ভালো জানেন। তিনি বলেন, আল্লাহর উক্তি হচ্ছে ঃ যখন আমার নাম বলা হয় তখন সেই সাথে তোমার নামও বলা হবে।" (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, মুসনাদে আবী লাইলা, ইবনুল মুনযির, ইবনে হিব্বান, ইবনে মারদুইয়া ও আবু নু'আইম) পরবর্তীকালের সমগ্র ইতিহাস সাক্ষ দিচ্ছে, একথাটি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছে।[১৩৯]

○

আল মু'য়িয্যু ঃ اَلْمُعِزُّ

অর্থ ঃ সম্মান দানকারী।

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ - ال عمران : ٢٦

"যাকে চাও মর্যাদা ও ইয্যত দান করো।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬

اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا - النساء : ١٣٩

"এরা কি মর্যাদা লাভের সন্ধানে তাদের কাছে যায় ? অথচ সমস্ত মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৩৯

আরবী ভাষায় 'ইয্যত' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সাধারণত ইয্যত শব্দটি বললে মান, মর্যাদা, সম্মান ইত্যাদি বুঝানো হয় ; কিন্তু আরবীতে 'ইয্যত' শব্দের অর্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির মর্যাদা এতই উন্নত ও সংরক্ষিত হয়ে যাওয়া, যার ফলে কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। অন্য কথায় 'ইয্যত' শব্দটির অর্থে বলা যায়, যে মর্যাদা বিনষ্ট করার ক্ষমতা কারো নেই।[১৪০]

○

সম্মান ও মর্যাদা মূলত আল্লাহর সত্তার জন্য নির্দিষ্ট আর রসূলের মর্যাদা রিসালাতের কারণে এবং ঈমানদারদের মর্যাদা তাদের ঈমানের কারণে। এরপর থাকে কাফের ফাসেক ও মুনাফিকদের মর্যাদার ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদায় তাদের কোনো অংশ নেই।[১৪১]

○

সূরা আল ফাতিরে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ط - فاطر : ١٠

"যে সম্মান চায় তার জানা উচিত সমস্ত সম্মান একমাত্র আল্লাহরই।"

আসল ও চিরস্থায়ী মর্যাদা, দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত যা কখনো হীনতা ও লাঞ্ছনার শিকার হতে পারে না, তা কেবলমাত্র আল্লাহর

বন্দেগীর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। তুমি যদি তাঁর হয়ে যাও, তাহলে তাঁকে পেয়ে যাবে এবং যদি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।[১৪২]

○

আল্লাহই যখন তাকে সত্য অনুসরণ করার মর্যাদা দান করেননি তখন তাকে এ মর্যাদায় অভিষিক্ত করার ক্ষমতা আর কার আছে ?[১৪৩]

○

আল মুযিল্লু : اَلْمُذِلُّ

অর্থ : অপমানকারী।

ব্যাখ্যা : সূরা আলে ইমরানে এরশাদ হয়েছে :

وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط - ال عمران : ٢٦

"যাকে চাও লাঞ্ছিত ও হেয় করো।"–সূরা আলে ইমরান : ২৬

যে ব্যক্তি চোখ মেলে প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল সত্য দেখে না এবং যে তাকে বুঝায় তার কথাও শোনে না, সে নিজেই নিজের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননার ডাক দেয়।[১৪৪]

○

যে ব্যক্তি ইতিহাসকে শুধুমাত্র ঘটনার সমষ্টি মনে করে না বরং এ ঘটনার যুক্তি প্রমাণ নিয়েও মাথা ঘামায় এবং তা থেকে ফলাফল গ্রহণ করতেও অভ্যস্ত হয় সে সহজেই তা অনুধানব করতে পারে। মানব জাতির হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে যে ধারাবাহিকতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে জাতি, সম্প্রদায় ও দলের উত্থান ও পতন ঘটতে থেকেছে এবং এ উত্থান ও পতনে যেমন সুস্পষ্টভাবে কিছু নৈতিক কার্যকারণ সক্রিয় থেকেছে আর পতনশীল জাতিগুলো যে ধরনের মারাত্মক ও শিক্ষণীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে পতন ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গেছে—এসব কিছুই এ অকাট্য সত্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিতবহ যে, মানুষ এ বিশ্বজাহানে এমন একটি রাষ্ট্রশক্তির অধীন যে নিছক অন্ধ প্রাকৃতিক আইনের ওপর রাজত্ব করছে না বরং তার নিজের এমন একটি ন্যায়সংগত নৈতিক বিধান আছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সে নৈতিকতার একটি বিশেষ সীমানার ওপরে অবস্থানকারীদেরকে পুরস্কৃত করে, যারা এ সীমানার নীচে নেমে আসে তাদেরকে কিছুকালের জন্য ঢিল দিতে থাকে এবং যখন তারা এর অনেক নীচে নেমে যায় তখন তাদেরকে এমনভাবে ঠেলে ফেলে দেয় যে, তারা ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য একটি শিক্ষণীয় ইতিহাস হয়ে যায়।[১৪৫]

○

৩৩

আস সামীউ : اَلسَّامِعُ, আস সামিউ : اَلسَّمِيْعُ

অর্থ : সবকিছু শ্রবণকারী।

ব্যাখ্যা : সূরা আল বাকারার ১২৭, ১৩৭, ১৮১, ২২৪, ২২৭, ২৪৪ এবং ২৫৪ আয়াতে এ পবিত্র নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ৩৪, ৩৫, ৩৮ ও ১২১ আয়াতেও এর উল্লেখ রয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য যেসব সূরায় এ নাম এসেছে তা হলো :

মায়িদাহ : ৭৬ ; আনআম : ১৩, ১১৫, আ'রাফ : ২০০ ; আনফাল : ১৭, ৪২, ৫৩, ৬১ ; তাওবা ; ৯৮, ১০৩ ; ইউনুস : ৬৫ ; হূদ : ২৪; ইউসুফ : ৩৪ ; ইবরাহীম : ৩৯ ; বনী ইসরাঈল : ১ ; আম্বিয়া : ৪ ; হাজ্জ : ৬১, ৭৫ ; নূর : ২১, ৬০ ; শুআরা : ২৬০ ; আনকাবূত : ৫, ৬০ ; লুকমান : ২৮ ; সাবা : ৫০ ; মু'মিন : ২০, ৫৬ ; হা-মীম আস সাজদা : ৩৬ ; শূরা : ১১ ; দুখান : ৬ ; হুজুরাত : ১ ; মুজাদালা : ১।

তাদের এ ভুল ধারণাও পোষণ করা উচিত নয় যে, এমন কোনো বাদশাহর সাথে তাদের ব্যাপার জড়িত, যিনি বিভিন্ন ব্যাপারে কোনো খোঁজ খবর রাখেন না। যে আল্লাহ্‌র সামনে তাদের জবাবদিহি করার জন্য হাজির হতে হবে তিনি বেখবর নন বরং সবকিছু শোনেন ও জানেন। তাঁর কাছে তাদের কোনো কথা গোপন নেই।[১৪৬]

○

তিনি একই সময় সমগ্র বিশ্বজাহানকে তার প্রত্যেকটি জিনিস ও ঘটনা সহকারে বিস্তারিত আকারেও দেখছেন এবং কোনো জিনিস দেখার ব্যাপারে তাঁর দর্শনেন্দ্রিয় এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না যে, একটিকে দেখতে গিয়ে তিনি অন্যগুলো দেখতে অপারগ হয়ে পড়েন।[১৪৭]

○

একজন মানুষ তো দূরের কথা সমস্ত মানুষ মিলেও যদি নিজেদের জন্য জীবনপদ্ধতি রচনা করে তবুও তার ন্যায়, সত্য ও বাস্তবানুগ হওয়ার কোনো গ্যারান্টি নেই। কারণ, গোটা মানবজাতি এক সাথে মিলেও একজন سَمِيْعٌ ও عَلِيْمٌ (সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী) হয় না। একটি সঠিক ও নির্ভুল জীবন পদ্ধতি রচনার জন্য যেসব জ্ঞান ও সত্য জানা জরুরী তার সবগুলো আয়ত্ত করা তার সাধ্যাতীত। এরূপ জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। তিনিই সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।[১৪৮]

তোমরা যেসব কথা তৈরি করো, সেগুলো জোরে জোরে বলো বা চুপিসারে কানে কানে বলো, আল্লাহ সবই শোনেন ও জানেন।[১৪৯]

○

প্রত্যেক ব্যক্তি একান্তে যেসব কথা বলে আল্লাহ্ তা সবই শুনে থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে মনে যা চিন্তা করে আল্লাহ্ তা থেকে মোটেই বেখবর থাকেন না। এ সরাসরি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ্ ফায়সালা করেন, কাকে পবিত্রতা দান করবেন ও কাকে পবিত্রতা দান করবেন না।[১৫০]

○

তিনি তোমাদের উপাস্যদের মত কোনো অন্ধ ও বধির আল্লাহ্ নন যে, যে ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন তার কৃতকর্ম সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না।[১৫১]

○

সূরা আশ্ শুআরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে আল্লাহ্ বলছেন ঃ

الَّذِىْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۙ وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ ۞ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

"যিনি তোমাকে দেখতে থাকেন যখন তুমি ওঠো এবং সিজদাকারীদের মধ্যে তোমার ওঠা বসা ও নড়া চড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।"–সূরা আশ শুআরা ঃ ২১৮-২২০

এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, আপনি যখন জামায়াতের সাথে নামায পড়ার সময় নিজের মুকতাদীদের সাথে ওঠা-বসা ও রুকূ'-সিজ্দা করেন তখন আল্লাহ্ আপনাকে দেখতে থাকেন। দুই, রাতের বেলা উঠে যখন নিজের সাথীরা (যাদের বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ হিসেবে "সিজ্দাকারী" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে) তাদের পরকাল গড়ার জন্য কেমন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তা দেখার উদ্দেশে ঘোরাফেরা করতে থাকেন, তখন আপনি আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকেন না। তিন, আপনি নিজের সিজ্দাকারী সাথীদেরকে সাথে নিয়ে আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন করার জন্য যেসব প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ্ তা অবগত আছেন। চার, সিজ্দাকারী লোকদের দলে আপনার যাবতীয় তৎপরতা আল্লাহর নজরে আছে। তিনি জানেন আপনি কিভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, কিভাবে ও

কেমন পর্যায়ে তাদের আত্মশুদ্ধি করছেন এবং কিভাবে ভেজাল সোনাকে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছেন।[১৫২]

○

সূরা হা-মীম আস সাজদায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

"যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো প্ররোচনা আঁচ করতে পার, তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো, তিনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন।"–সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ৩৬

বিরোধিতার তুফানের মুখে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার পর যে জিনিসটি মু'মিনের হৃদয়ে ধৈর্য, প্রশান্তি ও তৃপ্তির গভীর শীতলতা সৃষ্টি করে তা এই বিশ্বাস যে, আল্লাহ বিষয়টি সম্পর্কে অনবহিত নন। আমরা যা করছি তাও তিনি জানেন এবং আমাদের সাথে যা করা হচ্ছে তাও তিনি জানেন। আমাদের ও আমাদের বিরোধীদের সব কথাই তিনি শুনছেন এবং উভয়ের কর্মনীতি যা কিছুই হোক না কেন তা তিনি দেখছেন। এই আস্থার কারণেই মু'মিন বান্দা নিজের এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনের ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে যান।[১৫৩]

○

৩৪

আল বাসীরু : اَلْبَصِيْرُ

অর্থ : সবকিছু দর্শনকারী

ব্যাখ্যা : এ নামটি কুরআনের অনেক সূরায় এসেছে, যেমন–বাকারা : ৯৬, ১১০, ২৩৩, ২৩৭, ২৬৫ ; আলে ইমরান ১৫, ২০, ১৫৬, ১৬৩ ; মায়েদা : ৭১ ; আনফাল : ৩৯, ৭২ ; হূদ : ১১২ ; বনী ইসরাঈল : ১ ; হাজ্জ : ৬১, ৭৫ ; লুকমান : ২৮ ; সাবা : ১১ ; ফাতির : ৩১ ; মু'মিন : ২০, ৪৪, ৫৬ ; হা-মীম আস্-সাজদা : ৪০ ; শূরা : ১১, ২৭ ; হুজুরাত : ১৮ ; হাদীদ : ৪ ; মুজাদালা : ১০ ; মুমতাহিনা : ৩ ; তাগাবুন : ২ ; মুলক : ১৯।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ উল্লেখ করা হলো :

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ لا اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌo حم السجدة : ٤٠

"তোমরা যা চাও করতে থাকো, আল্লাহ তোমাদের সব কাজ দেখছেন।"–সূরা হা-মীম আস্ সাজদা : ৪০

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْئٌ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُo الشورى : ١١

"বিশ্বজাহানের কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।"–সূরা আশ শূরা : ১১

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ

اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌo الشورى : ٢٧

"আল্লাহ যদি তাঁর সব বান্দাদেরকে অঢেল রিযিক দান করতেন তাহলে তারা পৃথিবীতে বিদ্রোহের তাণ্ডব সৃষ্টি করতো। কিন্তু তিনি একটি হিসেব অনুসারে যতটা ইচ্ছা নাযিল করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।"

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَo

"আল্লাহ আসমান ও যমীনের প্রতিটি গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে জানেন। তোমরা যা কিছু করছো তা সবই তিনি দেখছেন।

–সূরা আল হুজুরাত : ১৮

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ الحديد : ٤

"তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যা করছো আল্লাহ্ তা দেখছেন।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ৪

وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ○ المجادلة : ١

"আল্লাহ তোমাদের দু'জনের কথা শুনছেন, তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখে থাকেন।"–সূরা মুজাদালা ঃ ১

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ج يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ الممتحنة : ٣

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দিবেন। আর তিনি তোমাদের কাজকর্মের দর্শক।"–সূরা মুমতাহিনা ঃ ৩

فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ التغابن : ٢

"অতপর তোমাদের কেউ কাফের ও কেউ মু'মিন। আর আল্লাহ্ সেসব কিছুই দেখেন যা তোমরা করে থাকো।"–সূরা আত তাগাবুন ঃ ২

مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلاَّ الرَّحْمٰنُ ط اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ ○ الملك : ١٩

"রহমান ছাড়া আর কেউ নেই যিনি তাদেরকে ধরে রাখেন। তিনিই সবকিছুর দর্শক।"–সূরা আল মুল্‌ক ঃ ১৯

তিনি একই সময় সমগ্র বিশ্বজাহানকে তার প্রত্যেকটি জিনিস ও ঘটনা সহকারে বিস্তারিত আকারেও দেখছেন এবং কোনো জিনিস দেখার ব্যাপারে তাঁর দর্শনেন্দ্রিয় এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না যে, একটিকে দেখতে গিয়ে তিনি অন্যগুলো দেখতে অপারগ হয়ে পড়েন।[১৫৪]

○

এক, তোমাদের রব যা কিছু করছেন দেখেশুনেই করছেন। তাঁর দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে কোনো অন্যায়, বেইনসাফী ও গাফলতি নেই। দুই, যে ধরনের আন্তরিকতা ও সত্যনিষ্ঠা নিয়ে তোমরা এ কঠিন কাজটি করছো তাও তোমাদের রবের চোখের সামনে আছে এবং যে ধরনের যুলুম, নির্যাতন ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তোমাদের কল্যাণ প্রচেষ্টার মুকাবিলা করা হচ্ছে তাও তাঁর অগোচরে নেই। কাজেই তোমাদের নিজেদের কাজের মর্যাদালাভ থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে না এবং নিজেদের যুলুম ও বাড়াবাড়ির বিপদ থেকেও নিষ্কৃতি পাবে না, এ ব্যাপারে তোমরা পূর্ণ নিশ্চিত থাকো।[১৫৫]

এ পৃথিবীতে যা আছে তা সবই আল্লাহর হিফাযত করার কারণে টিকে আছে। প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন তা তিনিই যোগান দিচ্ছেন। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির কাছে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সামগ্রী ঠিকমত পৌঁছানোর ব্যবস্থা তিনিই করেন।[১৫৬]

○

সূরা আত তাগাবুনে বলা হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ التغابن : ٢

"এবং আল্লাহ্ সেসব কিছু দেখেন যা তোমরা কর।"–সূরা তাগাবুন ঃ ২

এ আয়াতাংশে যে দেখার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ শুধু দেখাই নয়, বরং আপনা থেকেই এর এই অর্থ প্রকাশ পায় যে, তোমাদের আমল অনুপাতে তোমাদের প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে। এটা ঠিক এরূপ যেন কোনো শাসক কাউকে তার অধীনে চাকরিতে নিয়োগ করে বলছে যে, তুমি কিভাবে কাজ করো তা আমি দেখবো। এ ক্ষেত্রে এ ধরনের কথার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যদি ঠিকমত কাজ করো তাহলে পুরস্কার ও উন্নতি দান করবো। আর অন্যথা হলে কঠোরভাবে পাকড়াও করবো।[১৫৭]

○

সূরা আলে ইমরানের ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ○ ال عمران : ١٥

"আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের কর্মকাণ্ডের ওপর গভীর ও প্রখর দৃষ্টি রাখেন।"

আল্লাহ্ অপাত্রে দান করেন না। উপরি উপরি বা ভাসাভাসাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাঁর নীতি নয়। তিনি তাঁর বান্দাদের কার্যাবলী, সংকল্প ও ইচ্ছা পুরোপুরি ও ভালোভাবেই জানেন। কে পুরস্কার লাভের যোগ্য আর কে যোগ্য নয়, তাও তিনি ভালোভাবেই জানেন।[১৫৮]

○

কারণ বান্দার প্রকৃতি ও চাহিদা একমাত্র তিনিই জানেন এবং তার প্রকৃত প্রয়োজন ও কল্যাণের প্রতি একমাত্র তিনিই দৃষ্টি রাখেন।[১৫৯]

○

তিনি তোমাদের উপাস্যদে র মত কোনো অন্ধ ও বধির আল্লাহ নন যে, যে ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন তার কৃতকর্ম সম্পর্কে কিছু জানেন না।[১৬০]

○

আল হাকামু ঃ اَلْحَكَمُ, আল হাকিমু ঃ اَلْحَاكِمُ

অর্থ ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, নিষ্পত্তিকারী।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আল আনআমে বলা হয়েছে ঃ

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِىْ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً ـ

"আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মীমাংসাকারীর সন্ধান করবো ? অথচ তিনি পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ সহ তোমাদের কাছে কিতাব নাযিল করেছেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ১১৪

এ কুরআনী বক্তব্যের মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ নিজের কিতাবে সুস্পষ্টভাবে এ সত্যগুলো ব্যক্ত করে দিয়েছেন এবং এ সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিয়েছেন যে, অতি প্রাকৃতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই সত্যপন্থীদেরকে স্বাভাবিক পথেই সত্যের বিজয়ের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে হবে। এক্ষেত্রে আমি কি আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর সন্ধান করবো, যে আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে এবং এমন কোনো মুজিযা পাঠাবে যার বদৌলতে এরা ঈমান আনতে বাধ্য হবে ?[১৬১]

○

সূরা আন নিসার ৩৫ আয়াতেও حَكَم অর্থ 'ফয়সালাকারী' বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ـ النساء : ٣٥

"আর যদি কোথাও তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিগড়ে যাবার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে পুরুষের আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিস এবং স্ত্রীর আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিস নির্ধারিত করে দাও। তারা দুজন সংশোধন করে নিতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসা ও মিলমিশের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন।"

তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এরপর আর কোনো আবেদন নিবেদন খাটবে না। আর তুমি নির্ভেজাল জ্ঞান ও পূর্ণ ইনসাফের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকো।[১৬২]

○

৯—

আল আদলু ঃ اَلْعَدْلُ

অর্থ ঃ সর্বোত্তম ন্যায়বিচারক, চরম ন্যায়পরায়ণ।

ব্যাখ্যা ঃ নিরপেক্ষ সুবিচারকারী। নিজের সমস্ত সৃষ্টির প্রতি পার্থক্য করা ছাড়াই সরাসরি ন্যায় ও সুবিচারকারী। সবার জন্য সমান। তাঁর কাছে আপন, পর, বড়, ছোট, গরীব, ধনী, সম্ভ্রান্ত এবং নিচের জন্যে আলাদা আলাদা অধিকার সংরক্ষিত নেই। বরং যা কিছু আছে তা সবার জন্যই প্রাপ্য। তিনি পৃথিবীতে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের মাঝে ইনসাফ করেন। তাদের মধ্যকার অসমতা ও বেইনসাফীকে নির্মূল করেন।

প্রথম জিনিসটি হচ্ছে আদল বা ন্যায়পরায়ণতা। দুটি স্থায়ী সত্যের সমন্বয়ে এ ধারণাটি গঠিত। এক. লোকদের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সমতা থাকতে হবে। দুই. প্রত্যেককে নির্দ্বিধায় তার অধিকার দিতে হবে। আমাদের ভাষায় এ অর্থ প্রকাশ করার জন্য "ইনসাফ" শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ শব্দটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এ থেকে অনর্থক এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, দু' ব্যক্তির মধ্যে "নিস্ফ নিস্ক" বা আধাআধির ভিত্তিতে অধিকার বণ্টিত হতে হবে। তারপর এ থেকেই আদল ও ইনসাফের অর্থ মনে করা হয়েছে সাম্য ও সমান সমান ভিত্তিতে অধিকার বন্টন। এটা সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী। আসলে "আদল" সমতা বা সাম্য নয় বরং ভারসাম্য ও সমন্বয় দাবী করে। কোনো কোনো দিক দিয়ে "আদল" অবশ্যই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাম্য চায়। যেমন নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে। কিন্তু আবার কোনো কোনো দিক দিয়ে সাম্য সম্পূর্ণ "আদল" বিরোধী। যেমন পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক সাম্য এবং উচ্চপর্যায়ের কর্মজীবী ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মজীবীদের মধ্যে বেতনের সাম্য। কাজেই আল্লাহ যে জিনিসের হুকুম দিয়েছেন তা অধিকারের মধ্যে সাম্য নয় বরং ভারসাম্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা। এ হুকুমের দাবী হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে আদায় করতে হবে।[১৬৩]

○

আল্লাহ তাআলা বিশ্বজাহানের এ গোটা ব্যবস্থায় ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করেছেন। মহাকাশে আবর্তনরত এসব সীমা সংখ্যাহীন তারকা ও গ্রহ-উপগ্রহ বিশ্বজাহানে সক্রিয় এ বিশাল শক্তিসমূহ এবং এ বিশ্বলোকে বিদ্যমান অসংখ্য সৃষ্টি ও বস্তুরাজির মধ্যে যদি পূর্ণমাত্রার সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা না হতো তাহলে এ জগত এক মুহূর্তের জন্যও চলতে পারতো না। কোটি কোটি বছর ধরে এ পৃথিবীর বুকে বাতাস ও পানি এবং স্থলভাগে সৃষ্টিকুল আছে, তাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। তাদের জীবন তো এজন্যই টিকে আছে যে, তাদের জীবন ধারণের উপকরণের মধ্যে পুরোপুরি সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত আছে। এসব উপকরণের মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণ ভারসাম্যহীনতাও সৃষ্টি হয় তাহলে এখানে জীবনের নামগন্ধ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না।[১৬৪]

○

তোমরা যেহেতু এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বলোকে বাস করছো যার গোটা ব্যবস্থাপনাই সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তোমাদেরকেও সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যে গণ্ডীর মধ্যে তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে সেখানে যদি তোমরা বেইনসাফী করো এবং যে হকদারদের হক তোমাদের হাতে দেয়া হয়েছে তাদের হক যদি তোমরা হরণ কর, তাহলে তা হবে বিশ্বপ্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। এ মহাবিশ্বের প্রকৃতি যুলুম, বে-ইনসাফী ও অধিকার হরণকে স্বীকার করে না। এখানে বড় রকমের কোনো যুলুম তো দূরের কথা, দাঁড়ি পাল্লার ভারসাম্য বিঘ্নিত করে কেউ যদি খরিদ্দারকে এক তোলা পরিমাণ জিনিসও কম দেয় তাহলে সে বিশ্বলোকের ভারসাম্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।[১৬৫]

○

৩৭

আল লাতীফু : اَللَّطِيْفُ

অর্থ : গোপন সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত, সবার অজান্তে নিজের ইচ্ছা পূরণকারী, অনুকম্পাশীল ও দয়ালু।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ, মায়া ও বদান্যতাপ্রবণ। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে তার এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন যেখানে কারো দৃষ্টি যায় না। সে প্রয়োজনগুলো তিনি এমনভাবে পূরণ করেন যে, বান্দা নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না, কে কখন তার কোন্ প্রয়োজন পূরণ করেছে। তাছাড়া এখানে বান্দা অর্থ শুধু ঈমানদারেরাই নয়, বরং সমস্ত বান্দা। আল্লাহর এ দয়া ও মেহেরবানী তাঁর সব বান্দার জন্য সমান।[১৬৬]

○

তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করেন যার ফলে লোকেরা তার সূচনায় কখনো তার পরিণামের কল্পনাও করতে পারে না। লাখে লাখো শিশু দুনিয়ায় জন্মলাভ করে। কে জানতে পারে, তাদের মধ্যে কে হবে ইবরাহীম, যিনি নেতা হবেন দুনিয়ার চার ভাগের তিন ভাগ মানুষের ? আর কে হবে চেংগীশ, যে বিধ্বস্ত করে দেবে এশিয়া ও ইউরোপ ভূখণ্ডকে? দূরবীন যখন আবিষ্কার হয়েছিল তখন কে ধারণা করতে পেরেছিল যে, এর ফলে এটোম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা পর্যন্ত মানুষ পৌঁছে যাবে ? কলম্বাস যখন সফরে বের হচ্ছিল তখন কে জানতো এর মাধ্যমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্ গড়া হচ্ছে ? মোটকথা আল্লাহর পরিকল্পনা এমন সূক্ষ্মতর ও অজ্ঞাত পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয় যে, যতক্ষণ তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে না যায় ততক্ষণ কিসের জন্য কাজ চলছে তা কেউ জানতেও পারে না।[১৬৭]

○

আল কুরআনে বলা হয়েছে :

لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ج وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○

"দৃষ্টিশক্তি তাঁকে দেখতে অক্ষম কিন্তু তিনি দৃষ্টিকে আয়ত্ত করে নেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।"–সূরা আল আনআম : ১০৪

إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ط إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○ يوسف : ١٠٠

"আসলে আমার রব অননুভূত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেন। নিসন্দেহে তিনি সবকিছু জানেন ও সুগভীর প্রজ্ঞার অধিকারী।"–সূরা ইউসুফ ঃ ১০০

فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ط إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ○ الحج : ٦٣

"এবং তার বদৌলতে জমি সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে। আসলে তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৬৩

إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ○ لقمن : ١٦

"কোনো জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা লুকিয়ে থাকে পাথরের মধ্যে, আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও, তাহলে আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছু জানেন।"
–সূরা লুকমান ঃ ১৬

اَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ ج ـ الشورى : ١٩

"আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। যাকে যা ইচ্ছা তাই দান করেন।"–সূরা আশ শূরা ঃ ১৯

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ○ الملك : ١٤

"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানবেন না ? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয় ভালভাবে অবগত।"–সূরা আল মুলক ঃ ১৪

إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ○ الاحزاب : ٣٤

"অবশ্যই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ববিষয়ে অবহিত।"
–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৪

গোপনে এবং অতি সংগোপনে বলা কথাও তিনি জানতে পারেন। কোনো জিনিসই তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে না।[১৬৮]

○

আল খাবীরু : اَلْخَبِيْرُ

অর্থ : সুবিজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবগত।

ব্যাখ্যা : তিনি নিজের দুনিয়ার অবস্থা, প্রয়োজন ও উপকরণাদি সম্পর্কে অবগত। নিজের প্রভুত্বের কাজ কিভাবে করতে হয় তা তিনি জানেন।[১৬৯]

○

নিজের প্রত্যেকটি সৃষ্টি কোথায় আছে, কি অবস্থায় আছে, তার প্রয়োজন কি, তার প্রয়োজনের জন্য কি উপযোগী, এ পর্যন্ত সে কি করেছে এবং সামনের দিকে আরো কি করবে—এসব সম্পর্কে তিনি পূর্ণজ্ঞান রাখেন। নিজের তৈরি দুনিয়া সম্পর্কে তিনি বেখবর নন বরং প্রতিটি অণু-পরমাণুর অবস্থাও তিনি পুরোপুরি জানেন।[১৭০]

○

আল্লাহ অন্ধ ও বধির নন। কোনো অজ্ঞ ও গাফেল রাজার মতো চোখ বন্ধ করে আন্দাজে কাজ করা এবং নিজের দান ও দয়া-দাক্ষিণ্যের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দের পার্থক্য না করা তাঁর রীতি নয়। পূর্ণ সচেতনতার সাথে তিনি তাঁর এই বিশ্বজাহানের ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকের গ্রহণ ক্ষমতা, হিম্মত ও মনোবলের ওপর তিনি দৃষ্টি রেখেছেন। প্রত্যেকের গুণাবলী তিনি জানেন। তোমাদের কে কোন্ পথে নিজের শ্রম ও প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছে, তাও তিনি ভালো করেই জানেন।[১৭১]

○

স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর থাকবেন তা কি করে সম্ভব ? খোদ সৃষ্টি নিজের সম্পর্কে বেখবর বা অজ্ঞ থাকতে পারে। কিন্তু স্রষ্টা তার সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারেন না। তোমাদের প্রতিটি শিরা-উপশিরা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীও তাঁর সৃষ্টি। তোমাদের প্রতিটি নিশ্বাস-প্রশ্বাস তিনি চালু রেখেছেন বলেই তা চালু আছে। তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর ব্যবস্থাপনার অধীনে

কাজ করছে। তাই তোমাদের কোনো বিষয় তাঁর অগোচরে কি করে থাকতে পারে ?[১৭২]

○

সূরা আল বাকারার ২৩৪ ও ২৭১ আয়াতে বলা হয়েছে—

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ البقرة : ٢٣٤

সূরা আলে ইমরানের ১৫৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে—

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ ال عمران : ١٥٣

অন্যান্য যেসব সূরায় خَبِيْرٌ শব্দটি এসেছে তা হলো ঃ

মায়েদা ঃ ৮ ; আনআম ঃ ১৮, ৭৩ ও ১০৩ ; তাওবা ঃ ১৬ ; হুদ ঃ ১ ও ১১১ ; হাজ্জ ঃ ৬৩ ; নূর ঃ ৩০ ও ৫৩ ; নামল ঃ ৮৮ ; লুকমান ঃ ১৬, ২৯ ও ৩৪ ; সাবা ঃ ১ ; ফাতির ১৪ ও ৩১ ; শূরা ঃ ২৭ ; হুজুরাত ১৩ ; হাদীদ ঃ ১০ ; মুজাদালা ঃ ৩, ১১ ও ১৩ ; হাশর ঃ ১৮ ; মুনাফিকুন ঃ ১১; তাগাবুন ঃ ৮ ; তাহ্‌রীম ঃ ৩ ; মুলক ঃ ১৪ ; আদিয়াত ঃ ১১।

এছাড়া সূরা আন নিসার ৩৫, ৯৪, ১২৮ ও ১৩৫ ; বনী ইসরাঈলের ১৭, ৩০ ও ৯৬ ; ফুরকানের ৫৮ ও ৫৯ ; আহযাবের ২ ও ৩৪; আল ফাত্‌হ্‌-এর ১১ নং আয়াত خَبِيْرٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

বান্দার কল্যাণ কোন্ জিনিসের মধ্যে রয়েছে, তার নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের উপযোগী নীতি কি এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ নীতি-নিয়ম কি কি—এ সত্যগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াই হচ্ছে এখানে আল্লাহর এ গুণাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ; এ বিষয়গুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। (কারণ বান্দার প্রকৃতি ও চাহিদা একমাত্র তিনিই জানেন এবং তার প্রকৃত প্রয়োজন ও কল্যাণের প্রতি একমাত্র তিনিই দৃষ্টি রাখেন।) নিজেকে তত বেশী জানে না যত বেশী তার স্রষ্টা তাকে জানেন।[১৭৩]

○

যদি তোমরা কখনো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার নীতি গ্রহণ করো কিংবা নিজের মতামত ও ধ্যান-ধারণাকে তাঁদের নির্দেশের চেয়ে অগ্রাধিকার দান করো তাহলে জেনে রাখো তোমাদের বুঝাপড়া হবে সেই আল্লাহর সাথে যিনি তোমাদের সব কথা শুনছেন এবং মনের অভিপ্রায় পর্যন্ত অবগত আছেন।[১৭৪]

○

আল্লাহ্ যাকে যে প্রতিদান দেন ও মর্যাদা দান করেন তা এই দেখে দান করেন যে, সে কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ ধরনের আবেগ অনুভূতি নিয়ে কাজ করেছে। তিনি অন্ধভাবে বণ্টন করেন না। তিনি জেনে শুনেই প্রত্যেককে মর্যাদা ও তার কাজের প্রতিদান নির্ধারণ করে থাকেন।[১৭৫]

○

যেমন কেউ যদি বাড়িতে স্ত্রীর সাথে চুপে চুপে যিহার করে বসে এবং পরে কাফ্ফারা আদায় করা ছাড়াই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আগের মতই দাম্পত্য সম্পর্ক চলতে থাকে তাহলে সে সম্পর্কে দুনিয়াতে কেউ অবহিত থাক আর না থাক আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই তা জানেন। তার জন্য আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।[১৭৬]

○

মানুষ যদি একথা স্মরণ রাখে যে, সে স্বাধীন নয়, বরং এক আল্লাহর বান্দা। আর সে আল্লাহ তার সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত, একদিন তাঁর সামনে হাজির হয়ে নিজের সব কাজ-কর্মের জবাবদিহি তাকে করতে হবে, তাহলে সে কখনো কোনো খারাপ কাজ বা গোমরাহীতে লিপ্ত হতে পারবে না। মানবিক দুর্বলতার কারণে কোনো সময় তার পদস্খলন যদি ঘটেও তাহলে সম্বিত ফিরে পাওয়ামাত্র সে সংযত ও সংশোধিত হয়ে যাবে।[১৭৭]

○

আল হালীমু : اَلْحَلِيْمُ

অর্থ : অত্যন্ত সহনশীল।

ব্যাখ্যা : সূরা আল বাকারার ২২৫ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○ البقرة : ٢٢٥

"কিন্তু যেসব প্রতিজ্ঞা তোমরা আন্তরিকতার সাথে করে থাকো সে সম্পর্কে আল্লাহ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু।"–সূরা আল বাকারা : ২২৫

এছাড়া এ সূরার ২৩৫ ও ২৬৩ আয়াতে এবং আলে ইমরানের ১৫৫ আয়াত, সূরা আন নিসার ১২ আয়াত, আল মায়েদার ১০১ আয়াত, সূরা আল হাজ্জের ৫৯ আয়াত এবং সূরা আত তাগাবুনের ১৭ আয়াতে আল্লাহ্‌র নাম হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সূরা বনী ইসরাঈলের ৪৪ আয়াতে রয়েছে :

وَلٰكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○ بنى اسرائيل : ٤٤

"কিন্তু তোমরা ঐসবের তাসবীহ অনুধাবন করছো না। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি বড়ই ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল।"-বনী ইসরাঈল : ৪৪

সূরা আল আহ্‌যাবের ৫১ আয়াতে বলা হয়েছে—

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ○ الاحزاب : ٥١

"এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল।"–সূরা আল আহ্‌যাব : ৫১

এবং সূরা ফাতিরের ৪১ আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○ فاطر : ٤١

"নিসন্দেহে আল্লাহ বড়ই সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল।"-সূরা ফাতির : ৪১

আর 'হালীম' এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের মেজায সংযত রাখে—রাগে, শত্রুতায় ও বিরোধিতায় বেসামাল আচরণ করে না এবং অন্যদিকে ভালবাসায়, বন্ধুত্বে ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে যায় না।[১৭৮]

○

লোকদের ছোট ছোট ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতার কারণে তাদের বড় বড় কর্মকাণ্ড ও ত্যাগকে তিনি বিনষ্ট করে দেবেন না। তিনি সেগুলো উপেক্ষা করবেন এবং তাদের অপরাধ মাফ করে দেবেন।[১৭৯]

○

নিজের আন্তরিকতা সম্পন্ন মু'মিনদের সাথে আল্লাহ্ এমন সংকীর্ণমনা প্রভুর মতো ব্যবহার করেন না, যে কথায় কথায় পাকড়াও করে এবং সামান্য একটি ভুলের দরুন নিজের কর্মচারীর সমস্ত সেবা ও বিশ্বস্ততা অস্বীকার করে। তিনি মহানুভব দানশীল প্রভু। তাঁর বিশ্বস্ত বান্দার ভুল-ভ্রান্তি তিনি উপেক্ষা করে যান এবং তার পক্ষে যা কিছু সেবা করা সম্ভব হয়েছে তাকে যথার্থ মূল্য দান করেন।[১৮০]

○

তোমরা তাঁর সামনে অনবরত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে যাচ্ছো এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চলছো, এরপরও তিনি ক্ষমা করে চলছেন, রিযিক বন্ধ করছেন না, নিজের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিতও করছেন না এবং প্রত্যেক ঔদ্ধত্যকারীকে সংগে সংগেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে মৃত্যুদণ্ডও দিচ্ছেন না। এসবই তাঁর সহিষ্ণুতা ও অপরূপ ক্ষমাশীলতারই নিদর্শন। তাছাড়া তিনি ব্যক্তিকেও এবং জাতিকেও বুঝবার ও ভুল সংশোধন করার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দিচ্ছেন। তাদেরকে উপদেশ ও সঠিক পথনির্দেশনা দেবার জন্য নবী, সংস্কারক ও প্রচারক পাঠিয়ে চলছেন অনবরত। যে ব্যক্তিই নিজের ভুল বুঝতে পেরে সোজা পথ অবলম্বন করে তার অতীতের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেন।[১৮১]

○

তোমরা যে আল্লাহর বান্দা তিনি ভুল ত্রুটি মার্জনা করেন ও গোনাহ মাফ করে দেন। তাই তোমাদেরও সামর্থ অনুযায়ী মানুষের ভুলত্রুটি ও অপরাধ মার্জনা করা উচিত। মু'মিনরা ক্ষমাশীল, উদার হৃদয় ও ধৈর্যশীল, এগুলো তাদের চরিত্রের ভূষণ। প্রতিশোধ নেবার অধিকার অবশ্যই তাদের আছে। কিন্তু নিছক প্রতিশোধ স্পৃহা ও প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা লালন করা তাদের জন্য শোভনীয় নয়।[১৮২]

○

এটা তাঁর উদারতা, দয়া ও ক্ষমাশীলতা যার কল্যাণে কুফর, শিরক ও নাস্তিকতা এবং পাপাচার ও চরম জুলুম-নির্যাতনে লিপ্ত ব্যক্তিরাও বছরের পর বছর এমনকি এ ধরনের পুরো এক একটা সমাজ শত শত বছর পর্যন্ত এক নাগাড়ে অবকাশ পেয়ে থাকে। তারা শুধু রিযিকই লাভ করে না, পৃথিবীতে তাদের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া পৃথিবীর এমন সব উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম দ্বারা তারা অনুগৃহীত হয় যা দেখে নির্বোধ লোকেরা এ ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হয় যে, হয়তো এ পৃথিবীর কোনো খোদা-ই নেই।[১৮৩]

○

ইসলামের আহবায়কের জন্য যে গুণগুলো সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, তাকে কোমল স্বভাবের, সহিষ্ণু ও উদার হৃদয় হতে হবে। তাকে হতে হবে নিজের সংগী-সহযোগীদের জন্য স্নেহশীল, সাধারণ মানুষের জন্য দয়ার্দ্র হৃদয় এবং নিজের বিরোধীদের জন্য সহিষ্ণু। নিজের সাথীদের দুর্বলতাগুলোও তাকে সহ্য করে নিতে হবে এবং নিজের বিরোধীদের কঠোর ব্যবহারকেও। চরম উত্তেজনাকর অবস্থার মধ্যেও তার নিজের আচরণে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। অত্যন্ত বিরক্তিকর ও অপছন্দনীয় কথাগুলোও উদার মনে এড়িয়ে যেতে হবে। বিরোধীদের পক্ষ থেকে যতই কড়া ভাষায় কথা বলা হোক, যতই দোষারোপ করা ও মনে ব্যথা দেয়া হোক এবং যতই বর্বরোচিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা হোক না কেন, তাকে অবশ্যি এসব কিছুকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা, কর্কশ আচরণ করা, তিক্ত ও কড়া কথা বলা এবং প্রতিশোধমূলক মানসিক উত্তেজনায় ভোগা এ কাজের জন্য বিষতুল্য। এতে গোটা কাজ পণ্ড হয়ে যায়। এ জিনিসটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "আমার রব আমাকে হুকুম দিয়েছেন, আমি যেন ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায়ই ইনসাফের কথা বলি, যে আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তার সাথে সম্পর্ক জুড়ি, যে আমাকে আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাকে তার অধিকার দান করি, যে আমার প্রতি যুলুম করে আমি তাকে মাফ করে দেই।"[১৮৪]

○

(৪০)

আল আযীমু ঃ اَلْعَظِيْمُ

অর্থ ঃ মহান, শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○ البقرة : ٢٥٥

"মূলত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○ الشورى : ٤

"আসমান ও যমীনে যা আছে সবই তাঁর। তিনি সর্বোন্নত ও মহান।"–সূরা আশ শূরা ঃ ৪

اِنَّهٗ كَانَ لَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ○ الحاقة : ٣٣

"সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করতো না।"
–সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৩৩

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○ الحاقة : ٥٢

"অতএব হে নবী, তুমি তোমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করো।"–সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৫২

তিনি সর্বোন্নত ও মহান। তাই কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার এবং অধিকারের মধ্যে কোনোটিতেই অংশীদার হতে পারে না।[১৮৫]

○

(৪১)

আল গাফুরু ঃ اَلْغَفُوْرُ

অর্থ ঃ অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআনের যেসব সূরায় আল্লাহর এ নামটি বর্ণিত হয়েছে তাহলো ঃ

সূরা তাওবা ঃ ২৭, ৯১, ৯৯, ১০২ ; সূরা ইউনুস ঃ ১০৭ ; সূরা হুদ ঃ ৪১ ; সূরা ইউসুফ ঃ ৫৩, ৯৮ ; সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৬ ; সূরা আল হিজর ঃ ৪৯ ; সূরা আন নাহ্ল ঃ ১৮, ১১০, ১১৫, ১১৯ ; সূরা আল কাহফ ঃ ৫৮; সূরা আল হাজ্জ ঃ ৬০ ; সূরা আন নূর ঃ ৫, ২২, ৩৩, ৬২ ; সূরা আন নামল ঃ ১১ ; সূরা আল কাসাস ঃ ১৬ ; সূরা আস সাবা ঃ ২, ১৫ ; সূরা আল ফাতির ঃ ২৮, ৩০, ৩৪ ; সূরা আয্ যুমার ঃ ৫৩ ; সূরা হা-মীম আস্ সাজদা ঃ ৩২ ; সূরা আশ্ শূরা ঃ ৫, ২৩ ; সূরা আল আহকাফ ঃ ৮ ; সূরা আল হুজুরাত ঃ ৫, ১৪ ; সূরা আল হাদীদ ঃ ২৮; সূরা আল মুজাদালা ঃ ২, ১২ ; সূরা আল মুমতাহিনা ঃ ৭, ১২ ; সূরা আত্ তাগাবুন ঃ ১৪; সূরা আত্ তাহরীম ঃ ১ ; সূরা আল মুল্ক ঃ ২ ; সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ২০ ; সূরা আল বুরূজ ঃ ১৪।

এছাড়া غَفُوْرًا শব্দটি নিম্নিলিখিত সূরায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

সূরা আন নিসা ঃ ৪৩, ৯৬, ৯৯, ১০০, ১০৬, ১১০, ১২৯, ১৫২ ; সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৫, ৪৪ ; সূরা আল ফুরকান ঃ ৬, ৭০ ; সূরা আহ্যাব ঃ ৫, ২৪, ৫০, ৫৯, ৭৩ ; সূরা আল ফাতির ঃ ৪১ ; সূরা আল ফাত্হ ঃ ১৪।

তিনি মহা পরাক্রমশালী এবং সবার ওপর পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি যালেম ও কঠোর নন। দ্বিতীয়টি হলো, দুষ্কর্মকারীদের শাস্তি দেয়ার পুরো ক্ষমতা তাঁর আছে। এতো শক্তি কারো নেই যে, তাঁর শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু যারা লজ্জিত হয়ে দুষ্কর্ম পরিত্যাগ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের সাথে তিনি ক্ষমাশীলতার আচরণ করে থাকেন।[১৮৬]

○

কেউ কোনো দোষ করলে সাথে সাথেই তাকে পাকড়াও করে শাস্তি দিয়ে দেয়া আল্লাহর রীতি নয়। তাঁর দয়াগুণের দাবী অনুযায়ী

অপরাধীদেরকে পাকড়াও করার ব্যাপারে তিনি তাড়াহুড়া করেন না এবং তাদের সংশোধিত হবার জন্য সুযোগ দিতে থাকেন দীর্ঘকাল। কিন্তু বড়ই মূর্খ তারা যারা এ ঢিল দেয়াকে ভুল অর্থে গ্রহণ করে এবং মনে করে তারা যাই কিছু করুক না কেন তাদেরকে কখনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।[১৮৭]

○

অপরাধকারীও যদি তাওবা করে নিজের নীতি সংশোধন করে নেয় এবং খারাপ কাজের জায়গায় ভালো কাজ করতে থাকে, তাহলে আমার কাছে তার জন্য উপেক্ষা ও ক্ষমা করার দরজা খোলাই আছে।[১৮৮]

○

(৪২)

আশ শাকূর : اَلشَّكُوْرُ

অর্থ : গুণগ্রাহী।

ব্যাখ্যা : কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে :

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِه ط اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ○ فاطر : ٣٠

"যাতে তাদের প্রতিদান পুরোপুরি আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে দেন এবং নিজের অনুগ্রহ থেকে আরো বেশী করে তাদেরকে দান করেন। নিসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী।"–সূরা আল ফাতির : ৩০

اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ○ فاطر : ٣٤

"অবশ্যই আমাদের রব ক্ষমাশীল ও গুণের সমাদরকারী।"
–সূরা আল ফাতির : ৩৪

وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حَسْنًا ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ○

"যে কল্যাণ উপার্জন করবে আমি তার জন্য তার সেই কল্যাণের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেব। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও নেক কাজের মর্যাদাদাতা।"–সূরা আশ শূরা : ২৩

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ○ التغابن : ١٧

"আল্লাহ অতীব মর্যাদাদানকারী ও ধৈর্যশীল।"-সূরা আত তাগাবুন : ১৭

নিজের আন্তরিকতা সম্পন্ন মু'মিনদের সাথে আল্লাহ এমন সংকীর্ণমনা প্রভুর মতো ব্যবহার করেন না, যে কথায় কথায় পাকড়াও করে এবং সামান্য একটি ভুলের দরুন নিজের কর্মচারীর সমস্ত সেবা ও বিশ্বস্ততা অস্বীকার করে। তিনি মহানুভব দানশীল প্রভু। তাঁর বিশ্বস্ত বান্দার ভুল-ভ্রান্তি তিনি উপেক্ষা করে যান এবং তার পক্ষে যা কিছু সেবা করা সম্ভব হয়েছে তাকে যথার্থ মূল্য দান করেন।[১৮৯]

○

যারা জেনে বুঝে নাফরমানী করে সেই সব অপরাধীদের সাথে যে ধরনের আচরণ করা হয় নেক কাজে সচেষ্ট বান্দাদের সাথে আল্লাহর

আচরণ তেমন নয়। তাদের সাথে আল্লাহ্‌র আচরণ হচ্ছে (১) তারা নিজের পক্ষ থেকে যতটা সৎকর্মশীল হওয়ার চেষ্টা করে আল্লাহ্‌ তাদেরকে তার চেয়েও বেশী সৎকর্মশীল বানিয়ে দেন, (২) তাদের কাজকর্মে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায় অথবা সৎকর্মশীল হওয়ার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে গোনাহ্‌ সংঘটিত হয় আল্লাহ্‌ তা উপেক্ষা করেন এবং (৩) যে সামান্য পরিমাণ নেক কাজের পুঁজি তারা নিয়ে আসে সে জন্য আল্লাহ্‌ তাদেরকে মর্যাদা দেন এবং অধিক পুরস্কার দান করেন।[১৯০]

○

আশ শাকিরু : اَلشَّاكِرُ

অর্থ : সৎ কাজের মর্যাদা দানকারী ও সমাদরকারী।

ব্যাখ্যা : 'শোকর' শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে, নেয়ামতের স্বীকৃতি দেয়া ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা।

একজন অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক পদ্ধতি কি ? হৃদয়ের সমগ্র অনুভূতি দিয়ে তার অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়া, মুখে এ অনুভূতির স্বীকারোক্তি করা এবং নিজের কার্যকলাপের মাধ্যমে অনুগৃহীত হবার প্রমাণ পেশ করাই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক উপায়। এ তিনটি কাজের সমবেত রূপই হচ্ছে 'শোকর'। এ শোকরের দাবী হচ্ছে প্রথমতঃ অনুগ্রহকে অনুগ্রহকারীর অবদান বলে স্বীকার করতে হবে। অনুগ্রহের শোকর গোজারী করার এবং নেয়ামতের স্বীকৃতি দেবার ক্ষেত্রে অনুগ্রহকারীর সাথে আর কাউকে শরীক করা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ অনুগ্রহকারীর প্রতি প্রেম, প্রীতি, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের অনুভূতিতে নিজের হৃদয় ভরপুর থাকবে এবং অনুগ্রহকারীর বিরোধীদের প্রতি এ প্রসংগে বিন্দুমাত্র প্রীতি, আন্তরিকতা, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক থাকবে না। তৃতীয়তঃ কার্যত অনুগ্রহকারীর আনুগত্য করতে হবে, তাঁর হুকুম মেনে চলতে হবে এবং তিনি যে নেয়ামতগুলো দান করছেন সেগুলো তাঁর মর্জীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না।[১৯১]

○

আল্লাহর তরফ থেকে যখন বান্দার প্রতি শোকর করার কথা বলা হয় তখন এর অর্থ হয় 'কাজের স্বীকৃতি দেয়া বা কদর করা, মূল্য দান করা ও মর্যাদা দেয়া।' আর যখন বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি শোকর করার কথা বলা হয় তখন এ অর্থ হয়, নেয়ামতের স্বীকৃত দান বা অনুগৃহীত হবার কথা প্রকাশ করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার শোকরিয়া আদায় করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ বান্দার কাজের যথার্থ মূল্যদান করার ব্যাপারে কুণ্ঠিত নন। বান্দা তাঁর পথে যে ধরনের যতটুকু কাজ করে আল্লাহ তার কদর করেন, তার যথার্থ মূল্য দেন। বান্দার কোনো কাজ, পারিশ্রমিক ও পুরস্কার লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে না। বরং তিনি মুক্তহস্তে তার প্রত্যেকটি

কাজের তার প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশী প্রতিদান দেন। মানুষের অবস্থা হচ্ছে, মানুষ যা কিছু কাজ করে তার প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্য দেয় আর যা কিছু করে না সে সম্পর্কে কঠোরভাবে পাকড়াও করে। বিপরীত পক্ষে আল্লাহর অবস্থা হচ্ছে, মানুষ যে কাজ করেনি সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কোমল, উদার ও উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করেন। আর যে কাজ সে করেছে তার মূল্য তার চাইতে অনেক বেশী দেন, যা তার প্রকৃতপক্ষে পাওয়া উচিত।[১৯২]

○

যারা জেনে বুঝে নাফরমানী করে সেসব অপরাধীদের সাথে যে ধরনের আচরণ করা হয় নেক কাজে সচেষ্ট বান্দাদের সাথে আল্লাহর আচরণ তেমন নয়। তাদের সাথে আল্লাহর আচরণ হচ্ছে—(১) তারা নিজের পক্ষ থেকে যতটা সৎকর্মশীল হওয়ার চেষ্টা করে আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়েও বেশী সৎকর্মশীল বানিয়ে দেন (২) তাদের কাজকর্মে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায় অথবা সৎকর্মশীল হওয়ার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে গোনাহ সংঘটিত হয় আল্লাহ তা উপেক্ষা করেন এবং (৩) যে সামান্য পরিমাণ নেক কাজের পুঁজি তারা নিয়ে আসে সে জন্য আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদা দেন এবং অধিক পুরস্কার দান করেন।[১৯৩]

○

(৪৪)

আল আলিয়্যু ঃ اَلْعَلِىُّ

অর্থ ঃ অতীব উচ্চ মর্যাদাধারী।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর এ পবিত্র নামটির বর্ণনা সূরা আল বাকারার ২৫৫নং আয়াতে এসেছে এভাবে ঃ

وَلَا يَؤُدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○ البقرة : ٢٥٥

সূরা আল হাজ্জ ঃ ৬২ ; সূরা লুকমান ঃ ৩০ ; সূরা সাবা ঃ ২৩ এবং সূরা গাফিরের ১২ আয়াতে هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সূরা আশ শূরা ঃ ৪, ১৫ ; সূরা আয যুখরুফ ঃ ৪ ; সূরা আন নিসা ঃ ৩৪; এবং সুরা মারয়ামের ৫০ ও ৭৫ আয়াতেও এ নাম বর্ণিত হয়েছে।

প্রত্যেক জিনিসের ঊর্ধে এবং সবার শ্রেষ্ঠ। তাঁর সামনে সব জিনিসই নিচু।[১৯৪]

○

তিনি সর্বোন্নত ও মহান। তাই কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না এবং তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার এবং অধিকারের মধ্যে কোনোটিতেই অংশীদার হতে পারে না।[১৯৫]

○

তিনি কোনো মানুষের সাথে সামনাসামনি কথাবার্তা বলার বহু ঊর্ধে।[১৯৬]

○

৪৫

আল আ'লা : اَلْاَعْلٰى

অর্থ : সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ, মহত্তম, শ্রেষ্ঠতম।

ব্যাখ্যা : সূরা আল আ'লার প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى○ الاعلى :

"(হে নবী) তোমার সু মহান রবের নামের তাসবীহ পাঠ করো।"

অর্থাৎ তাঁকে এমন কোনো নামে স্মরণ করা যাবে না যার মধ্যে কোনো প্রকার ত্রুটি, অভাব, দোষ, দুর্বলতা বা সৃষ্টির সাথে কোনো দিক দিয়ে কোনো প্রকার মিল রয়ে গেছে। কারণ দুনিয়ায় যতগুলো ভ্রান্ত আকীদার জন্ম হয়েছে তার সবগুলোর মূলে রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কিত কোনো না কোনো ভুল ধারণা। আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য কোনো ভুল ও বিভ্রান্তির নাম অবলম্বন করার মাধ্যমে এ ভুল ধারণাগুলো বিকশিত হয়েছে। কাজেই আকীদা সংশোধনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, মহান আল্লাহকে কেবলমাত্র তাঁর উপযোগী পূর্ণ গুণান্বিত ও সর্বাংগ সুন্দর নামে স্মরণ করতে হবে।[১৯৭]

○

সূরা আল লাইলে বলা হয়েছে :

اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى○ اليل : ٢٠

"সেতো কেবলমাত্র নিজের শ্রেষ্ঠতম রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করে।"–সূরা আল লাইল : ২০

সূরা আন নাযিআতের ২৪ আয়াতে ফেরাউনের 'রব্বে আ'লা হবার মিথ্যা দাবীও উল্লেখ করা হয়েছে :

فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى○ النزعت : ٢٤

"সে লোকদের সম্বোধন করে বললো, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব।"–সূরা আন নাযিআত : ২৪

আসলে সে ধর্মীয় অর্থে নয় বরং রাজনৈতিক অর্থে নিজেকে ইলাহ্, উপাস্য ও প্রধান রব হিসেবে পেশ করতো। অর্থাৎ এর অর্থ ছিল, আমি হচ্ছি প্রধান কর্তৃত্বের মালিক। আমি ছাড়া আর কেউ আমার রাজ্যে হুকুম চালাবার অধিকার রাখে না। আর আমার ওপর আর কোনো উচ্চতর ক্ষমতাধরও নেই, যার ফরমান এখানে জারী হতে পারে।[১৯৮]

○

সে কার্যত মিসরের এবং আদর্শগতভাবে সমগ্র মানব জাতির রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের দাবীদার ছিল। সে একথা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে, অন্য কোনো সত্তা তার ওপর কর্তৃত্ব করবে, তার প্রতিনিধি এসে তাকে হুকুম দেবে এবং তার কাছে এ হুকুমের আনুগত্য করার দাবী জানাবে।[১৯৯]

○

আল কাবীরু : اَلْكَبِيْرُ

অর্থ : বড়, মহান, শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা : আল কুরআনে বলা হয়েছে :

وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ○

"এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা সবাই মিথ্যা। আর আল্লাহই পরাক্রমশালী ও মহান।"–সূরা আল হাজ্জ : ৬২

وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ لا وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ○

"এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব জিনিসকে এরা ডাকে তা সবই মিথ্যা, আর (এ কারণে যে) আল্লাহই সমুচ্চ ও শ্রেষ্ঠ।"

–সূরা লুকমান : ৩০

قَالُوْا مَاذَا لا قَالَ رَبُّكُمْ ط قَالُوْا الْحَقَّ ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ○

"তারা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন ? তারা বলবে, ঠিক জবাব পাওয়া গেছে এবং তিনি উচ্চতম মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতম।"–সূরা আস সাবা : ২৩

وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ط فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ○

"কিন্তু যখন তাঁর সাথে অন্যদেরকেও শামিল করা হতো তখন মেনে নিতে। এখন তো ফায়সালা মহান ও মর্যাদাবান আল্লাহর হাতে।"

–সূরা আল মু'মিন : ১২

কিয়ামতের দিন কোনো সুপারিশকারী যখন কারো পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি চাইবে তখনকার চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সে চিত্রে আমাদের সামনে যে অবস্থা ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে এই যে, অনুমতি চাওয়ার আবেদন পেশ করার পর সুপারিশকারী ও যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে তারা দু'জনই অত্যন্ত অস্থিরভাবে ভীতি ও উদ্বেগের সাথে জবাবের জন্য প্রতীক্ষারত। শেষ পর্যন্ত যখন ওপর থেকে অনুমতি এসে যায় এবং সুপারিশকারীর চেহারা দেখে যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে সে

ব্যাপারটা আর উদ্বেগজনক নয় বলে অনুমান করতে থাকে তখন তার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে আসে। সে এগিয়ে গিয়ে সুপারিশকারীকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, "কি জবাব এসেছে ?" সুপারিশকারী বলে, "ঠিক আছে, জবাব পাওয়া গেছে।" একথার মাধ্যমে যে বিষয়টি বুঝাতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, নির্বোধের দল! এ হচ্ছে যে দরবারের অবস্থা সে সম্পর্কে তোমরা কেমন করে এ ধারণা করতে পারলে যে, সেখানে কেউ নিজের বল প্রয়োগ করে তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দেবে অথবা কারো সেখানে ধরণা দিয়ে বসে পড়ে আল্লাহকে একথা বলার সাহস হবে যে, এ ব্যক্তি আমার প্রিয়পাত্র এবং আমার লোক, একে মাফ করতেই হবে ?[২০০]

○

(৪৭)

আল হাফীযু ঃ اَلْحَفِيْظُ

অর্থ ঃ সব জিনিসের রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা হূদে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ رَبِّى عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ - هود : ٥٧

"অবশ্যি আমার রব প্রতিটি জিনিসের সংরক্ষক।"–সূরা হূদ ঃ ৫৭

সূরা আশ শূরায় বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ - الشورى : ٦

"যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহই তাদের তত্ত্বাবধায়ক।"-সূরা আশ শূরা ঃ ৬

সূরা আস সাবায় এরশাদ হয়েছে ঃ

وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ - سبا : ٢١

"তোমার রব সব জিনিসের তত্ত্বাবধায়ক।"–সূরা সাবা ঃ ২১

আল্লাহই তাদের তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ তিনি তাদের সমস্ত কাজকর্ম দেখছেন এবং তাদের আমলনামা প্রস্তুত করছেন। তাদের কাছে জবাবদিহি চাওয়া ও তাদেরকে পাকড়াও করা তাঁরই কাজ। "তুমি তাদের যিম্মাদার নও"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের ভাগ্য তোমার হাতে তুলে দেয়া হয়নি যে, যারা তোমার কথা মানবে না তাদেরকে তুমি জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে, কিংবা ক্ষমতাচ্যুত করবে অথবা তছনছ করে ফেলবে। একথার অর্থ আবার এও নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে সে রকম মনে করতেন। তাই তাঁর ভুল ধারণা বা আত্মবিভ্রম দূর করার জন্য একথা বলা হয়েছে। বরং কাফেরদের শুনানোই এর মূল উদ্দেশ্য। যদিও বাহ্যিকভাবে নবী (স)-কেই সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাফেরদেরকে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহপ্রাপ্তি এবং আধ্যাত্মিকতার প্রহসন করে সাধারণত যেভাবে ঘটা করে তা দাবী করে আল্লাহর নবী তেমন কোনো দাবী করেন না। জাহেলী সমাজে সাধারণভাবে এ ধারণা প্রচলিত আছে যে, 'দরবেশ' শ্রেণীর লোকেরা

এমন প্রতিটি মানুষের ভাগ্য নষ্ট করে দেয় যারা তাদের সাথে বে-আদবী করে। এমনকি তাদের মৃত্যুর পরেও কেউ যদি তাদের কবরেরও অবমাননা করে এবং অন্য কিছু না করলেও যদি তাদের মনের মধ্যে কোনো খারাপ ধারণার উদয় হয় তাহলেই তাকে ধ্বংস করে দেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ ধারণা ঐসব "দরবেশ মহামান্যরা" নিজেরাই প্রচার করেন এবং সেসব নেককার লোক নিজেরা এ কাজ করেন না কিছু ধূর্ত লোক তাদের হাড্ডিসমূহকে নিজেদের ব্যবসায়ের পুঁজি বানানোর জন্য তাদের সম্পর্কে এ ধারণা প্রচার করতে থাকে। যাই হোক, মানুষের ভাগ্য গড়া ও ভাঙার ক্ষমতা-ইখতিয়ার থাকাকেই সাধারণ মানুষ রূহানিয়াত ও আল্লাহপ্রাপ্তির অতি আবশ্যকীয় দিক বলে মনে করেছে। প্রতারণার যাদুর এই মুখোশ খুলে দেয়ার জন্য আল্লাহ কাফেরদের শুনিয়ে তাঁর রসূলকে বলছেন, নিসন্দেহে তুমি আমার নবী এবং আমি তোমাকে আমার অহী দিয়ে সম্মানিত করেছি। শুধু মানুষকে সঠিক পথ দেখানোই তোমার কাজ। তাদের ভাগ্য তোমার হাতে তুলে দেয়া হয়নি। তা আমি নিজের হাতেই রেখেছি। বান্দার কাজকর্ম বিচার করা এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়া বা না দেয়া আমার নিজের দায়িত্ব।[২০১]

○

এ পৃথিবীতে তোমাদের টিকে থাকা এবং নিরাপত্তা লাভ করা সবসময় মহান আল্লাহর দয়া ও করুণার ওপর নির্ভর করে। তোমরা আপন শক্তির জোরে এ পৃথিবীতে সুখের জীবন যাপন করছো না। তোমাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত, যা এখানে অতিবাহিত হচ্ছে, তার সবই আল্লাহর হিফাযত ও তত্ত্বাবধানের ফল। অন্যথায় তাঁর ইংগিতে যে কোনো সময় এ পৃথিবীতে ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে এবং এ পৃথিবী তোমাদের জন্য মায়ের স্নেহময় কোল না হয়ে কবরে পরিণত হতো। অথবা যে কোনো সময় এমন ঝড়ঝঞ্ঝা আসতে পারে যা তোমাদের জনপদকে ধ্বংস করে ফেলবে।[২০২]

○

"রক্ষাকারী" দ্বারা এমন লোককে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, তাঁর ফরযসমূহ, হারামসমূহ এবং তার দায়িত্বে ন্যস্ত আমানতসমূহ রক্ষা করে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর আরোপিত অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করে, যে ঈমান এনে তার রবের সাথে যে চুক্তি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে তা রক্ষা করে, যে তার শক্তি, শ্রম ও চেষ্টা-সাধনার পাহারাদারী করে যাতে এসবের কোনোটি ভ্রান্ত কাজে নষ্ট না হয়।[২০৩]

○

৪৮

আল হাফিয্ ঃ اَلْحَافِظُ

অর্থ ঃ তত্ত্বাবধায়ক, সংরক্ষক।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আত তারিকে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ○ الطارق : ٤

"এমন কোনো প্রাণ নেই যার উপর কোনো হেফাযতকারী নেই।"
–সূরা আত তারিক ঃ ৪

হেফাযতকারী বলতে এখানে আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর ছোট বড় সকল সৃষ্টির দেখাশুনা, তত্ত্বাবধান ও হেফাযত করছেন। তিনিই সব জিনিসকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তিনিই সব কিছুকে টিকিয়ে রেখেছেন। তিনি সব জিনিসকে ধারণ করছেন বলেই প্রত্যেকটি জিনিস তার নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি সব জিনিসকে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বিপদমুক্ত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। রাতের আকাশে এই যে অসংখ্য গ্রহ তারকা ঝলমল করতে দেখা যায় এদের প্রত্যেকটির অস্তিত্ব এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, অবশ্যি কেউ একজন আছেন যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, এগুলোকে আলোকিত করেছেন, এগুলোকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং এমনভাবে এদেরকে হেফাযত করছেন যার ফলে এরা নিজেদের স্থান থেকে ছিটকে পড়ে না এবং অসংখ্য তারকা একসাথে আবর্তন করার সময় একটি তারকা অন্য তারকার সাথে ধাক্কা খায় না বা অন্য কোনো তারকা তাকে ধাক্কা দেয় না।

ঊর্ধজগতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর এবার মানুষকে তার নিজের সত্তা সম্পর্কে একটু চিন্তা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। তাকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? কে পিতার দেহ থেকে নির্গত কোটি কোটি শুক্রকীটের মধ্য থেকে একটি শুক্রকীট এবং মায়ের গর্ভ থেকে নির্গত অসংখ্য ডিম্বের মধ্য থেকে একটি ডিম্ব বাছাই করে নেয় এবং কোনো এক সময় তাদের সম্মিলন ঘটায় এবং তারপর এক বিশেষ মানবীর গর্ভধারণ সংঘটিত হয়? গর্ভ সঞ্চারের পর কে মায়ের উদরে তার ক্রমবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করে? তারপর কে তাকে একটি জীবিত শিশুর

আকারে জন্মলাভ করার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয় ? কে মায়ের গর্ভাধারের মধ্যেই তার শারীরিক কাঠামো এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতাসমূহের অনুপাত নির্ধারণ করে দেয় ? কে জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অনবরত তার তত্ত্বাবধান করে ? তাকে রোগমুক্ত করে, দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে, নানা প্রকার আপদবিপদ থেকে বাঁচায়। তার জন্য বহুতর সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে। তার নিজের এসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার কোনো ক্ষমতাই নেই। এমনকি এগুলো সম্পর্কে কোনো চেতনাই তার নেই। এসবকিছুই কি এক মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান ছাড়াই চলছে ?[২০৪]

○

আল কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হলো ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ الحجر : ٩

"আর এ বাণী আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।"–সূরা আল হিজর ঃ ৯

কাফিরদেরকে উদ্দেশ করে আল্লাহ বলছেন—'এ বাণী, যার বাহককে তোমরা পাগল বলছো, আমিই তা অবতীর্ণ করেছি, তিনি নিজে তা তৈরি করেননি। আর তোমরা যে এ বাণীর কিছু ক্ষতি করতে পারবে তা ভেবো না। এটি সরাসরি আমার হেফাযতে রয়েছে। তোমাদের চেষ্টায় একে বিলুপ্ত করা যাবে না। তোমরা একে ধামাচাপা দিতে চাইলেও দিতে পারবে না। তোমাদের আপত্তি ও নিন্দাবাদের ফলে এর মর্যাদা কমে যাবে না। তোমরা ঠেকাতে চাইলেও এর দাওয়াতকে ঠেকাতে পারবে না। একে বিকৃত বা এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার সুযোগও তোমরা কেউ কোনো দিন পাবে না।[২০৫]

○

আল মুকীতু ঃ اَلْمُقِيْتُ

অর্থ ঃ শক্তিমান, তত্ত্বাবধায়ক, জীবিকা দাতা, সাক্ষী।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আন নিসায় এরশাদ হয়েছে ঃ

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا - النساء : ٨٥

"আর আল্লাহ্ সব জিনিসের প্রতি নজর রাখেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ৮৫

সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রকারের যত মাখলুক আল্লাহ সৃষ্টি করবেন তাদের প্রত্যেকের সঠিক চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে খাদ্যের সব সরঞ্জাম হিসাব করে তিনি পৃথিবীর বুকে রেখে দিয়েছেন। স্থল ভাগে ও পানিতে অসংখ্য প্রকারের উদ্ভিদ রয়েছে। এদের প্রতিটি শ্রেণীর খাদ্য সংক্রান্ত প্রয়োজন অন্যসব শ্রেণী থেকে ভিন্ন। আল্লাহ বায়ুমণ্ডল, স্থল ও পানিতে অসংখ্য প্রজাতির জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি প্রজাতিরই স্বতন্ত্র ধরনের খাদ্য প্রয়োজন। তাছাড়া এসব প্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সৃষ্টি মানুষ। মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন শুধু দেহের লালন ও পরিপুষ্টি সাধনের জন্যই নয়, তার রুচির পরিতৃপ্তির জন্যও নানা রকম খাদ্যের প্রয়োজন। আল্লাহ্ ছাড়া আর কার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল মাটির তৈরী এই গ্রহটির ওপরে জীবনের উৎপত্তি থেকে শুরু করে তার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত কোন্ কোন্ শ্রেণীর সৃষ্টিকুল কত সংখ্যায় কোথায় কোথায় এবং কোন্ কোন্ সময় অস্তিত্ব লাভ করবে এবং তাদের প্রতিপালনের জন্য কোন্ প্রকারের খাদ্য কত পরিমাণে দরকার হবে। নিজের সৃষ্টি পরিকল্পনা অনুসারে যেভাবে তিনি খাদ্যের মুখাপেক্ষী এসব মাখলুককে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছিলেন অনুরূপভাবে তাদের চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য সরবরাহেরও পূর্ণ ব্যবস্থা করেছেন।

বর্তমান যুগে মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ধারক ও বাহকদের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, আল্লাহ পৃথিবীতে সব মানুষের জন্য সমপরিমাণে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন যা সবাইকে খাদ্যের সমান রেশন সরবরাহ করবে। কারণ এ কুরআন যে সাম্য দাবী করে ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থায় তা কায়েম হতে পারে না।

কিন্তু তারা একথা ভুলে যান যে, শুধু মানুষ নয় বিভিন্ন শ্রেণীর অন্যান্য সৃষ্টিও রয়েছে, জীবন ধারণের জন্য যাদের খাদ্যের প্রয়োজন। আল্লাহ কি প্রকৃতই এসব সৃষ্টির মধ্যে কিংবা তাদের এক একটি শ্রেণীর সবার মধ্যে জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে সাম্যের ব্যবস্থা রেখেছেন ? প্রকৃতির গোটা ব্যবস্থাপনায় কোথাও কি আপনি সমানভাবে খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা দেখতে পান ? প্রকৃত ব্যাপার যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ হচ্ছে, উদ্ভিদ এবং জীবজগতের মধ্যে যেখানে মানুষের পরিচালিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা নেই, বরং আল্লাহর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সরাসরি রিযিক বণ্টনের ব্যবস্থা করছে সেখানে আল্লাহ নিজেই এ "কুরআনী বিধান" লংঘন করেছেন—এমনকি (নাউযুবিল্লাহ) বে-ইনসাফী করেছেন ? তারা এ কথাও ভুলে যায়, মানুষ যেসব জীবজন্তু পালন করে এবং যাদের খাদ্য যোগানোর দায়িত্ব মানুষেরই তারাও سَائِلِيْنَ এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন — ভেড়া, বকরী, গরু, মহিষ, ঘোড়া, গাঁধা, খচ্চর ও উট প্রভৃতি। সব প্রার্থীকে সমান খাদ্য দিতে হবে এটাই যদি কুরআনী বিধান হয় এবং এ বিধান চালু করার জন্য "নেযামে রবুবিয়াত" পরিচালনাকারী একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকে তাহলে সেই রাষ্ট্র কি মানুষ এবং এসব জীবজন্তুর মধ্যেও আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করবে ?[২০৬]

○

আল হাসীবু ঃ اَلْحَسِيْبُ

অর্থ ঃ হিসাব গ্রহণকারী।

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

"তারপর তাদের সম্পদ যখন তাদের হাতে সোপর্দ করতে যাবে তখন তাতে লোকদেরকে সাক্ষী বানাও। আর হিসেব নেবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا ○النساء : ٨٦

"আল্লাহ সব জিনিসের হিসেব গ্রহণকারী।"–সূরা আন নিসা ঃ ৮৬

وَلاَ يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلاَّ اللّٰهَ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○الاحزاب : ٣٩

"এবং এক আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করো না। আর হিসেব গ্রহণের জন্য কেবলমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট।"-সূরা আল আহযাব ঃ ৩৯

এর দুটি অর্থ। এক. প্রত্যেকটি ভয় ও বিপদের মুকাবিলায় আল্লাহই যথেষ্ট। দুই. হিসেব নেয়ার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তাঁর ছাড়া আর কারো কাছে জবাবদিহির ভয় করার কোনো প্রয়োজন নেই।[২০৭]

○

প্রত্যেক ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহর কাছে দায়ী হবে এবং এককভাবে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। পৃথিবী ও আকাশের যে একচ্ছত্র অধিপতির কাছে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞান রাখেন। এমনকি লোকদের গোপন সংকল্প এবং তাদের মনের সংগোপনে যেসব চিন্তা জাগে সেগুলোও তাঁর কাছে অপ্রকাশ নেই।[২০৮]

○

যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, তার কাছে হালকা হিসেব নেয়া হবে অর্থাৎ তার হিসেব নেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না, অমুক অমুক কাজ তুমি কেন করেছিলে ?

ঐসব কাজ করার ব্যাপারে তোমার কাছে কি কি ওযর আছে ? নেকীর সাথে সাথে গুনাহও তার আমলনামায় অবশ্যি লেখা থাকবে। কিন্তু গুনাহের তুলনায় নেকীর পরিমাণ বেশী হবার কারণে তার অপরাধগুলো উপেক্ষা করা হবে এবং সেগুলো মাফ করে দেয়া হবে। কুরআন মজিদে অসৎ কর্মশীল লোকদের কঠিন হিসাব নিকাশের জন্য "সূউল হিসাব" (খারাপভাবে হিসেব নেয়া) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (আর্-রাআদ আয়াত ১৮) সৎলোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "এরা এমন লোক যাদের সৎ কাজগুলো আমি গ্রহণ করে নেবো এবং অসৎ কাজগুলো মাফ করে দেবো।" (সূরা আল আহ্কাফ ঃ ১৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তাকে ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, হাকেম, ইবনে জারীর, আব্দ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মারদুইয়া বিভিন্ন শব্দাবলীর সাহায্যে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এক বর্ণনা মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যার থেকেই হিসেব নেয়া হয়েছে, সে মারা পড়েছে।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কি একথা বলেননি, "যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, তার থেকে হাল্কা হিসেব নেয়া হবে ?" রাসূলুল্লাহ (স) জবাব দেন ঃ "সেটি তো হলো কেবল আমলের উপস্থাপনা। কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে সে মারা পড়েছে।" আর একটি রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি একবার নামাযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তে শুনি ঃ "হে আল্লাহ! আমার থেকে হাল্কা হিসেব নাও।" তিনি সালাম ফেরানোর পর আমি তাঁকে এর অর্থ জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন ঃ "হাল্কা হিসেব মানে বান্দার আমলনামা দেখা হবে এবং উপেক্ষা করা হবে। হে আয়েশা! সেদিন যার কাছ থেকে হিসেব নেয়া হয়েছে সে মারা পড়েছে।"[২০৯]

○

৫১

আল জালীলু : اَلْجَلِيْلُ

অর্থ : প্রতাপশালী, মহান, শ্রেষ্ঠ।

এর ব্যাখ্যার জন্য 'যুল জালালি ওয়াল ইকরাম' দ্রষ্টব্য।

আল কারীমু : اَلْكَرِيْمُ

অর্থ : সদাচার ও উপকারকারী, স্বভাবসুলভ মহৎ।

ব্যাখ্যা : সূরা ইন্‌ফিতারে বলা হয়েছে :

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ○ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ○ فِىْٓ اَىِّ

صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ○ الانفطار : ٦-٨

"হে মানুষ, কোন্ জিনিসটি তোমাকে তোমার মহান রবের পক্ষ থেকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করে গড়েছেন এবং যে আকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন।"–সূরা আল ইনফিতার : ৬-৮

অর্থাৎ প্রথমে তো তোমার উচিত ছিল সেই পরম করুণাময় ও গ্রহকারীর অনুগ্রহ লাভ করে তাঁর শোকরগুযারী করা এবং তাঁর সমস্ত ম মেনে চলা। তাঁর নাফরমানী করতে গিয়ে তোমার লজ্জিত হওয়া ত ছিল কিন্তু নিজের যাবতীয় যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতাকে তুমি নিজের কৃতিত্ব মনে করার ধোঁকায় পড়ে গেছো। তোমাকে যিনি অস্তিত্বদান করেছেন তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেবার চিন্তা তোমার মনে একবারও উদয় হয় না। দ্বিতীয়ত, দুনিয়ায় তুমি যা ইচ্ছে করে ফেলতে পারো, এটা তোমার রবের অনুগ্রহ। তবে কখনো এমন হয়নি যে, যখনই তুমি কোনো ভুল করেছো অমনি তিনি তোমাকে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত করে বিকল করে দিয়েছেন অথবা তোমার চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন বা তোমাকে বজ্রপাতে হত্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর এ অনুগ্রহ ও কোমলতাকে তুমি দুর্বলতা ভেবে বসেছো এবং তোমার খোদার খোদায়ীত্বে ইনসাফের নামগন্ধও নেই মনে করে নিজেকে প্রতারিত করেছো।[২১০]

○

এ ধরনের ধোঁকা খাওয়ার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। তোমার অস্তিত্ব নিজেই ঘোষণা করছে যে, তুমি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে যাওনি, তোমার বাপ মাও তোমাকে সৃষ্টি করেনি, তোমার মধ্যে যেসব উপাদান আছে সেগুলো নিজে নিজে একত্র হয়ে যাওয়ার ফলেও ঘটনাক্রমে তুমি

১১—

মানুষ হিসেবে তৈরী হয়ে যাওনি। বরং এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিধর আল্লাহ তোমাকে এ পূর্ণাঙ্গ মানবিক আকৃতি দান করেছেন। তোমার সামনে সর্ব রকমের প্রাণী রয়েছে, তাদের মুকাবিলায় তোমার সবচেয়ে সুন্দর শারীরিক কাঠামো এবং শ্রেষ্ঠ ও উন্নত শক্তি একেবারেই সুস্পষ্ট। বুদ্ধির দাবী তো এই ছিল, এসব কিছু দেখে কৃতজ্ঞতায় তোমার মাথা নত হয়ে যাবে এবং সেই মহান রবের মুকাবিলায় তুমি কখনো নাফরমানী করার দুঃসাহস করবে না। তুমি এও জানো যে, তোমার রব কেবলমাত্র রহীম ও করীম—করুণাময় ও অনুগ্রহশীলই নন, তিনি জাব্বার ও কাহ্হার—মহাপরাক্রমশালী এবং কঠোর শাস্তি দানকারীও। তাঁর পক্ষ থেকে যখন কোনো ভূমিকম্প, তুফান বা বন্যা আসে তখন তার প্রতিরোধের জন্য তোমরা যতই ব্যবস্থা অবলম্বন করো না কেন সবকিছুই নিষ্ফল হয়ে যায়। তুমি একথাও জানো, তোমার রব মূর্খ-অজ্ঞ নন বরং তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ। জ্ঞান ও বিজ্ঞতার অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, যাকে বুদ্ধি-জ্ঞান দান করা হবে তাকে তার কাজের জন্য দায়ীও করতে হবে। যাকে ক্ষমতা ইখতিয়ার দেয়া হবে সেই ক্ষমতা ইখতিয়ার সে কিভাবে ব্যবহার করেছে তার হিসেবও তার কাছ থেকে নিতে হবে। যাকে নিজ দায়িত্বে সৎ ও অসৎকাজ করার ক্ষমতা দেয়া হবে তাকে তার সৎকাজের জন্য পুরস্কার ও অসৎকাজের জন্য শাস্তিও দিতে হবে। এসব সত্য তোমার কাছে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। তাই তোমার মহান রবের পক্ষ থেকে তুমি যে ধোঁকায় পড়ে গেছো তার পেছনে কোনো যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে, একথা তুমি বলতে পারবে না। তুমি নিজে যখন কারোর কর্মকর্তা হবার দায়িত্ব পালন করে থাকো তখন তোমার নিজের অধীন ব্যক্তি যদি তোমার ভদ্রতা ও কোমল ব্যবহারকে দুর্বলতা মনে করে তোমার মাথায় চড়ে বসে, তাহলে তখন তুমি তাকে নীচ প্রকৃতির বলে মনে করে থাকো। কাজেই তোমার প্রকৃতি একথা সাক্ষ্য দেবার জন্য যথেষ্ট যে, প্রভুর দয়া, করুণা ও মহানুভবতার কারণে তাঁর চাকর ও কর্মচারীর কখনো তার মুকাবিলায় দুঃসাহসী হয়ে যাওয়া উচিত নয়। তার এ ভুল ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, সে যা ইচ্ছা তাই করে যাবে এবং এজন্য কেউ তাকে পাকড়াও করতে ও শাস্তি দিতে পারবে না।[২১১]

○

এটা আল্লাহ তাআলার চরম উদারতা ও দানশীলতা যে, মানুষ যদি তাঁরই দেয়া সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করে তাহলে তিনি তা নিজের জন্য ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্য শর্ত এই যে, তা "কর্যে হাসানা" (উত্তম

ঋণ) হতে হবে। অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছাড়াই তা দিতে হবে, তার মধ্যে কোনো প্রকার প্রদর্শনীর মনোবৃত্তি, খ্যাতি ও নামধামের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, তা দিয়ে কাউকে খোঁটা দেয়া যাবে না, দাতা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেবে এবং এছাড়া অন্য কারো প্রতিদান বা সন্তুষ্টি লক্ষ্য হবে না। এ ধরনের ঋণের জন্য আল্লাহর দুটি প্রতিশ্রুতি আছে। একটি হচ্ছে, তিনি তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন। অপরটি হচ্ছে, এজন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারও দান করবেন।[২১২]

○

আল আকরামু ঃ اَلْاَكْرَمُ

অর্থ ঃ শ্রেষ্ঠতম, মহত্তম, উদারতম, সর্বাধিক হৃদয়বান।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আল আলাকে বলা হয়েছে ঃ

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - العلق : ٣

"পড়ো এবং তোমার রব, যিনি সবচেয়ে বেশী মেহেরবান।"-আলাক ঃ ৩

এটা তাঁর অশেষ মেহেরবানী যে, এ হীনতম অবস্থা থেকে শুরু করে তিনি মানুষকে জ্ঞানের অধিকারী করেছেন। এটি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় গুণ হিসেবে স্বীকৃত। আর তিনি মানুষকে কেবল জ্ঞানের অধিকারীই করেননি, কলম ব্যবহার করে তাকে লেখার কৌশল শিখিয়েছেন। এর ফলে কলম জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার, উন্নতি এবং বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যদি তিনি ইলহামী চেতনার সাহায্যে মানুষকে কলম ব্যবহার করার ও লেখার কৌশল না শেখাতেন তাহলে মানুষের জ্ঞানগত যোগ্যতা স্তব্ধ ও পঙ্গু হয়ে যেতো। তার বিকশিত ও সম্প্রসারিত হবার এবং বংশানুক্রমিক অগ্রগতি তথা এক বংশের জ্ঞান আর এক বংশে পৌঁছে যাবার এবং সামনের দিকে আরো উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করার সুযোগই তিরোহিত হতো।[২১৩]

○

অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী শুধুমাত্র মহা সম্মানিত ও সুমহান আল্লাহর সত্তা, এ বিশাল বিশ্বজাহান যার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং যাঁর বদান্যতায় তোমাদের ভাগ্যে এসব নিয়ামত জুটেছে। এখন যদি তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ "আমার চেয়ে কেউ বড় নেই" এ গর্বে গর্বিত হয় তাহলে এটা তার বুদ্ধির সংকীর্ণতা ছাড়া কিছুই নয়। কোনো নির্বোধ যদি তার ক্ষমতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ডঙ্কা বাজায়, কিংবা কতিপয় মানুষ তার কর্তৃত্ব স্বীকার করায় সে তাদের খোদা হয়ে বসে, তাহলে তার এ মিথ্যার বেসাতী কত দিন চলতে পারে? মহাবিশ্বের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে পৃথিবীর অনুপাত যেখানে মটরশুটির দানার মতও নয় তার এক নিভৃত কোণে দশ বিশ কিংবা পঞ্চাশ ষাট বছর যে কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চলে এবং তারপরই অতীত কাহিনীতে রূপান্তরিত হয় তা এমন কোন্ কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যার জন্য কেউ গর্ব করতে পারে?[২১৪]

○

আর রাকীবু : اَلرَّقِيْبُ

অর্থ : সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক, প্রতীক্ষারত।

ব্যাখ্যা : সূরা আল মায়েদায় বলা হয়েছে :

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ط ـ المائدة : ١١٧

"যখন আপনি আমাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন তখন আপনিই ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক।"–সূরা আল মায়েদা : ১১৭

সূরা হূদে এরশাদ হয়েছে :

وَارْتَـقِبُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ○ هود : ٩٣

"তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত রইলাম।"–সূরা হূদ : ৯৩

সূরা আল ক্বাফে বলা হয়েছে :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ○ ق : ١٨

"এমন কোনো শব্দ তার মুখ থেকে বের হয় না যা সংরক্ষিত করার জন্য একজন সদা প্রস্তুত রক্ষক উপস্থিত থাকে না।"-সূরা ক্বাফ : ১৮

এক দিকে আমি নিজে সরাসরি মানুষের প্রতিটি গতিবিধি এবং চিন্তা ও কল্পনা সম্পর্কে অবহিত। অপর দিকে প্রত্যেক মানুষের জন্য দু'জন করে ফেরেশতা নিয়োজিত আছে যারা তার প্রত্যেকটি তৎপরতা লিপিবদ্ধ করছে। তার কোনো কাজ ও কথাই তাদের রেকর্ড থেকে বাদ পড়ে না। অর্থাৎ আল্লাহর আদালতে যে সময় মানুষকে পেশ করা হবে তখন কে কি করে এসেছে সে বিষয়ে আল্লাহ নিজ থেকেই অবহিত থাকবেন। তাছাড়া সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য এমন দু'জন সাক্ষীও উপস্থিত থাকবেন যারা তার কাজ-কর্মের লিখিত নথিভুক্ত প্রমাণাদি এনে সামনে পেশ করবেন। লিখিত এ প্রমাণাদি কেমন ধরনের হবে তার সঠিক ধারণা করা আমাদের জন্য কঠিন। তবে আজ আমাদের সামনে যেসব সত্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে তা দেখে এ বিষয়টি একেবারে নিশ্চিত মনে হয় যে, যে পরিবেশে মানুষ অবস্থান ও কাজ-কর্ম করে তাতে চতুর্দিকের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ওপর

তার কণ্ঠস্বর, ছবি ও গতিবিধির ছাপ পড়ে যাচ্ছে। এসব জিনিসের প্রত্যেকটিকে পুনরায় হুবহু সেই আকার-আকৃতি ও স্বরে এমনভাবে পেশ করা যেতে পারে যে, আসল ও নকলের মধ্যে সামান্যতম পার্থক্যও থাকবে না। মানুষ যন্ত্রপাতির সাহায্যে এ কাজটি অত্যন্ত সীমিত মাত্রায় করছে। কিন্তু আল্লাহর ফেরেশতাগণ এসব যন্ত্রপাতিরও মুখাপেক্ষী নন, এসব প্রতিবন্ধকতায়ও আবদ্ধ নন। মানুষের নিজ দেহ এবং তার চারপাশের প্রতিটি জিনিস তাঁদের জন্য টেপ ও ফিল্ম স্বরূপ। তাঁরা এসব টেপ ও ফিল্মের ওপর প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি ছবি অতি সূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটি বিষয়সহ অবিকল ধারণ করতে পারেন এবং পৃথিবীতে ব্যক্তি যেসব কাজ করতো কিয়ামতের দিন তাকে তার নিজ কানে নিজ কণ্ঠস্বরে সেসব কথা শুনিয়ে দিতে পারেন, নিজ চোখে তার সকল কর্মকাণ্ডের এমন জ্বলজ্যান্ত ছবি তাকে দেখিয়ে দিতে পারেন যা অস্বীকার করা তার জন্য সম্ভব হবে না।

এখানে একথাটিও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, আল্লাহ্ তাআলা আখেরাতের আদালতে কোনো ব্যক্তিকে কেবল নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে শাস্তি প্রদান করবেন না, বরং ন্যায় বিচারের সমস্ত পূর্বশর্ত পূরণ করে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। এ কারণে দুনিয়াতেই প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত কথা ও কাজের পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড তৈরি করা হচ্ছে যাতে অনস্বীকার্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রমাণাদি পেশ করা যায়।[২১৫]

○

এছাড়া 'রাকীব' নামটি সূরা আন নিসার ১ ও সূরা আল আহ্যাবের ৫২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

আল-মুজীবু ঃ اَلْمُجِيْبُ

অর্থ ঃ জবাব দাতা, গ্রহণকারী।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ....

"আর হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই ...।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৬

যদিও তোমরা আমাকে দেখতে পাওনা এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভবও করতে পারো না তবুও আমাকে তোমাদের থেকে দূরে মনে করো না। আমি আমার প্রত্যেক বান্দার অতি নিকটেই অবস্থান করছি। যখনই তারা চায় আমার কাছে আর্জি পেশ করতে পারে। এমনকি মনে মনে আমার কাছে তারা যা কিছু আবেদন করে তাও আমি শুনতে পাই। আর কেবল শুনতেই পাই না বরং সে সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করি। নিজেদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে যে সমস্ত অলীক, কাল্পনিক ও অক্ষম সত্তাদেরকে তোমরা উপাস্য ও প্রভু গণ্য করেছো তাদের কাছে তোমাদের নিজেদের দৌড়িয়ে যেতে হয় এবং তারপরও তারা তোমাদের কোনো আবেদন নিবেদন শুনতে পায় না। তোমাদের আবেদনের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাও তাদের নেই। অন্যদিকে আমি হচ্ছি এ বিশাল বিস্তৃত বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি। সমস্ত সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমারই হাতে কেন্দ্রীভূত। তোমাদের এতো কাছে আমি অবস্থান করি যে, কোনো প্রকার মাধ্যম ও সুপারিশ ছাড়াই তোমরা নিজেরাই সরাসরি সর্বত্র ও সবসময় আমার কাছে নিজেদের আবেদন নিবেদন পেশ করতে পারো। কাজেই একের পর এক অক্ষম ও বানোয়াট খোদার দ্বারে দ্বারে মাথা ঠুকে মরার অজ্ঞতা ও মূর্খতার বেড়াজাল তোমরা ছিঁড়ে ফেলো। আমি তোমাদের যে আহ্বান জানাচ্ছি সে আহ্বানে সাড়া দাও। আমার আদর্শকে আঁকড়ে ধরো। আমার দিকে ফিরে এসো। আমার ওপর নির্ভর করো। আমার বন্দেগী ও আনুগত্য করো।[২১৬]

○

সূরা হুদে বলা হয়েছে ঃ

فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ط إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ○ هود : ٦١

“কাজেই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার রব নিকটেই আছেন, তিনি ডাকের জবাব দেন।”

—সূরা হূদ ঃ ৬১

এখানে মুশরিকদের একটি মস্তবড় বিভ্রান্তির প্রতিবাদ করা হয়েছে। সাধারণভাবে প্রায় তাদের প্রত্যেকেই এর শিকার। যেসব মারাত্মক বিভ্রান্তি প্রতি যুগে মানুষকে শিরকে লিপ্ত করেছে, এটি তাদের অন্যতম। তারা আল্লাহকে দুনিয়ার অন্যান্য রাজা, মাহারাজা ও বাদশাহদের সমান মনে করে। অথচ এ রাজা-বাদশাহরা প্রজাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে নিজেদের প্রাসাদসমূহে বিলাসী জীবন যাপন করে। তাদের দরবারে সাধারণ প্রজারা পৌঁছুতে পারে না এবং সেখানে কোনো আবেদন পৌঁছাতে হলে ঐ রাজাদের প্রিয়পাত্রদের কারো শরণাপন্ন হতে হয়। এরপর আবার সৌভাগ্যক্রমে কারো আবেদন যদি তাদের সুউচ্চ বালাখানায় পৌঁছে যায়ও তাহলেও প্রভুত্বের অহমিকায় মত্ত হয়ে তারা নিজেরা এর জবাব দিতে পসন্দ করে না। বরং প্রিয় পাত্রদের মধ্যে থেকে কারো ওপর এর জবাব দেবার দায়িত্ব অর্পণ করে। এ ভুল ধারণার কারণে তারা মনে করে এবং ধুরন্ধর লোকেরা তাদের একথা বুঝাবার চেষ্টাও করেছে যে, বিশ্বজাহানের অধিপতি মহাশক্তিধর আল্লাহর মহিমান্বিত দরবার সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে বহুদূরে অবস্থিত। কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁর দরবারে পৌঁছে যাওয়া কেমন করে সম্ভবপর হতে পারে! মানুষের দোয়া ও প্রার্থনা সেখানে পৌঁছে যাওয়া এবং সেখান থেকে তার জবাব আসা তো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তবে হাঁ যদি পবিত্র আত্মাসমূহের ‘অসীলা’ ধরা হয় এবং যেসব ধর্মীয় পদাধিকারীরা ওপর তলায় নযর-নিয়ায ও আবেদন নিবেদন পেশ করার কায়দা জানেন তাদের সহায়তা গ্রহণ করা হয় তাহলে এটা সম্ভব হতে পারে। এ বিভ্রান্তিটিই বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে বহু ছোটবড় মাবুদ এবং বিপুল সংখ্যক সুপারিশকারী দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আর এই সাথে পুরোহিত-গিরির (Priesthood) এক সুদীর্ঘ ধারা চালু হয়ে গেছে, যার মাধ্যম ছাড়া জাহেলী ধর্মসমূহের অনুসারীরা তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও পালন করতে সক্ষম নয়।

হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম জাহেলিয়াতের এ গোটা ধূম্রজালকে শুধুমাত্র দুটি শব্দের সাহায্যে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। শব্দ দুটির একটি হচ্ছে 'কারীব'—আল্লাহ নিকটবর্তী এবং দ্বিতীয়টি 'মুজীব'—আল্লাহ জবাব দেন। অর্থাৎ তিনি দূরে আছেন, তোমাদের এ ধারণা যেমন ভুল তেমনি তোমরা সরাসরি তাঁকে ডেকে নিজেদের আবেদন নিবেদনের জবাব হাসিল করতে পারো না, এ ধারণাও একই রকম ভুল। তিনি যদিও অনেক উচ্চস্থানের অধিকারী ও অনেক উচ্চ মর্যাদাশালী তবুও তিনি তোমাদের নিকটেই থাকেন। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁকে নিজের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে পেতে পারে এবং তাঁর সাথে সংগোপনে কথা বলতে পারে। প্রকাশ্য জনসমক্ষে এবং একান্ত গোপনে একাকী অবস্থায়ও নিজের আবেদন নিবেদন তাঁর কাছে পেশ করতে পারে। তারপর তিনি সরাসরি প্রত্যেক বান্দার আবেদনের জবাব নিজেই দেন। কাজেই বিশ্বজাহানের বাদশাহর সাধারণ দরবার যখন সবসময় সবার জন্য খোলা আছে এবং তিনি সবার কাছাকাছি রয়েছেন তখন তোমরা বোকার মতো এ জন্য মাধ্যম ও অসীলা খুঁজে বেড়াচ্ছো কেন?[২১৭]

○

আল ওয়াসি'উ ঃ اَلْوَاسِعُ

অর্থ ঃ উদারমনা, প্রশস্ত দৃষ্টিসম্পন্ন।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ ال عمران : ٧٣

"তিনি ব্যাপক দৃষ্টির অধিকারী এবং সবকিছু জানেন।"–ইমরান ঃ ৭৩

কুরআনে সাধারত তিনটি জায়গায় 'ওয়াসি'উ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এক. যেখানে কোনো একটি মানব গোষ্ঠীর সংকীর্ণমনতা ও সংকীর্ণ চিন্তার উল্লেখ করা হয় এবং আল্লাহ তাদের মতো সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী নন, একথা তাদের জানিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দুই. যেখানে কারো কৃপণতা, সংকীর্ণমনতা এবং স্বল্পসাহস ও হিম্মতের কারণে তাকে তিরস্কার করে মহান আল্লাহ যে উদার হস্ত এবং তার মতো কৃপণ নয়, একথা বুঝাবার প্রয়োজন হয়। তিন. যেখানে লোকেরা নিজেদের চিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণে আল্লাহর ওপরও এক ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের একথা জানাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ সকল প্রকার সীমাবদ্ধতার উর্ধে, তিনি অসীম।[২১৮]

○

তেমনি সূরা আল বাকারার ১১৫ আয়াতে বলা হচ্ছে اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ আল্লাহ বড়ই ব্যাপকতার অধিকারী এবং তিনি সব কিছু জ্ঞাত। অর্থাৎ মহান আল্লাহ সীমাবদ্ধ নন। তিনি সংকীর্ণ মন, সংকীর্ণ দৃষ্টি ও সংকীর্ণ হাতের অধিকারী নন। অথচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের মতো ভেবে এ রকম মনে করে রেখেছো। বরং তাঁর খোদায়ী কর্তৃত্ব বিশাল-বিস্তৃত এবং তাঁর দৃষ্টিকোণ ও অনুগ্রহ দানের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁর কোন্ বান্দত কোথায় কোন্ সময় কি উদ্দেশ্যে তাঁকে স্মরণ করছে—একথাও তিনি জানেন।[২১৯]

○

আল হাকীমু ঃ اَلْحَكِيْمُ

অর্থ ঃ অত্যন্ত সূক্ষ্ম জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী ও প্রজ্ঞাময়, সূক্ষ্মজ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী অনুসারে কর্মসম্পাদনকারী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।

ব্যাখ্যা ঃ যিনি হিকমত, প্রজ্ঞা ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। যিনি নিজের সৃষ্টির প্রয়োজন ও কল্যাণ এবং তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে পুরোপুরি জানেন। বান্দাদের সংশোধন ও পথনির্দেশনার জন্য যাঁর জ্ঞান সর্বোত্তম কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করে।[২২০]

○

আল্লাহর পক্ষ থেকে এ পুরস্কারের ঘোষণা পুরোপুরি তাঁর জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার ওপর নির্ভরশীল। সেখানে হকদারকে বঞ্চিত করে নাহকদারকে দান করার কোনো কারবার নেই। প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকেরাই এ পুরস্কারের হকদার এবং আল্লাহ এ পুরস্কার তাদেরকেই দেবেন।[২২১]

○

যে ফায়সালাই তিনি করেন পুরোপুরি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই করেন। কাউকে দিলে সেটি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন এবং কাউকে না দিলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন না।[২২২]

○

এ গ্রন্থে (কুরআনে) তিনি যে পথনির্দেশনা দিচ্ছেন, তা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে দিচ্ছেন। একমাত্র কোনো অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তিই এ পথনির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করতে পারে।–তাফহীম, সূরা আল আহ্‌যাব টীকা–১।

মানুষের হেদায়াত ও দিকনির্দেশনার জন্য যখনই তিনি কোনো বান্দার সাথে যোগাযোগ করতে চান তখন কোনো অসুবিধাই তাঁর ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এ কাজের জন্য তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা অহী পাঠানোর পথ অবলম্বন করেন।[২২৩]

○

তিনি কোনো মানুষের সাথে সামনাসামনি কথাবার্তা বলার বহু উর্ধে। নিজের কোনো বান্দার কাছে নির্দেশনা পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য সামনাসামনি বাক্যালাপ করা ছাড়া আর কোনো কৌশল উদ্ভাবন করতে তাঁর জ্ঞান অক্ষম নয়।[২২৪]

○

তাঁর মহাজ্ঞানী হওয়ার দাবী হলো মানুষ পূর্ণ মানসিক প্রশান্তিসহ স্বেচ্ছায় আগ্রহ নিয়ে তাঁর হেদায়াত ও আদেশ-নিষেধ পালন করবে। কারণ, তাঁর শিক্ষা ভ্রান্ত, অসংগত ও ক্ষতিকর হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।[২২৫]

○

তিনি জ্ঞানময়, অর্থাৎ যা কিছু করেন, বুদ্ধি-বিবেক ও প্রজ্ঞার দাবীও হুবহু তাই। আর তাঁর কৌশল ও ব্যবস্থাপনা এতোই সুদৃঢ় হয়ে থাকে যে, বিশ্বজাহানের কেউ তা ব্যর্থ করতে পারে না।[২২৬]

○

আল্লাহর কাছে এমন বাহিনী আছে, যার সাহায্যে তিনি যখন ইচ্ছা কাফেরদের ধ্বংস করে দিতে পারেন। কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে ইচ্ছা করেই তিনি ঈমানদারদের ওপরে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যাতে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে চেষ্টা-সাধনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করেন। এ কাজের দ্বারাই তাদের মর্যাদা উন্নত এবং আখেরাতের সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়।[২২৭]

○

তিনি যাই করেন, জ্ঞান ও যুক্তি-বুদ্ধির সাহায্যে করেন। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ব্যবস্থাপনা, তাঁর শাসন, তাঁর আদেশ-নিষেধ, তাঁর নির্দেশনা সবকিছুই জ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর। তাঁর কোনো কাজেই অজ্ঞতা, বোকামি ও মূর্খতার লেশমাত্র নেই।[২২৮]

○

এটি তাঁর শক্তি-সামর্থ ও জ্ঞানের বিস্ময়কর দিক যে, তিনি এ ধরনের এক অশিষ্ট উম্মী কওমের মধ্য থেকে এমন মহান নবী সৃষ্টি করেছেন যাঁর শিক্ষা ও হেদায়াত এতটা বিপ্লবাত্মক ও এমন বিশ্বজনীন স্থায়ী নীতিমালার

ধারক, যার ওপর ভিত্তি করে গোটা মানবজাতি একটি মাত্র জাতিতে পরিণত হতে পারে এবং এ নীতিমালা থেকে চিরদিন দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারে। যত চেষ্টাই করা হোক না কেন কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে কোনো মানুষই এ স্থান ও মর্যাদা লাভ করতে পারতো না। আরবদের মত পশ্চাদপদ জাতি তো দূরের কথা, দুনিয়ার কোনো বড় জাতির সর্বাধিক মেধা-সম্পন্ন ব্যক্তিও এভাবে কোনো জাতির চেহারা পুরোপুরি পাল্টে দিতে এবং গোটা মানবজাতিকে চিরদিনের জন্য একটি আদর্শ এবং একটি সংস্কৃতির বিশ্বজনীন সর্বাত্মক আদর্শ পরিচালনার যোগ্য হওয়ার মত একটা ব্যাপক নীতিমালা গোটা বিশ্বকে উপহার দিতে পারতো না। এটি আল্লাহর কুদরতে সংঘটিত একটি মু'জিযা। আল্লাহ তাঁর কৌশল অনুসারে যে ব্যক্তি, যে দেশ এবং যে জাতিকে চেয়েছেন এ উদ্দেশ্যে বাছাই করে নিয়েছেন। এতে কোনো নির্বোধ যদি মনে কষ্ট পায় তাহলে পেতে থাকুক।[২২৯]

○

আল্লাহ তোমাদের প্রভু এবং সমস্ত কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক। কিসে তোমাদের কল্যাণ তা তিনিই সবচেয়ে ভাল করে জানেন আর যে আদেশ-নিষেধ তিনি তোমাদের দিয়েছেন তাও সরাসরি হিকমত তথা গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও যুক্তিনির্ভর। প্রথম কথাটি বলার অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেরা স্বাধীন নও। বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা আর তিনি তোমাদের রব। তাই তাঁর নির্ধারিত পন্থা ও পদ্ধতিতে রদবদল করার অধিকার তোমাদের কারো নেই। তোমাদের কর্তব্য হলো, নিজেদের সব ব্যাপার তাঁর ওপর সোপর্দ করে কেবল তাঁরই আনুগত্য করতে থাকো।[২৩০]

○

আল্লাহর কাজগুলোকে তাঁর শক্তিমত্তার দিক দিয়ে দেখলে মন সাক্ষ্য দেবে যে, তিনি যখনই চাইবেন সকল মৃতকে আবার জীবিত করতে পারবেন, ইতিপূর্বে যাদের অস্তিত্ব ছিল না, তাদেরকে তিনি অস্তিত্ব দান করেছিলেন। আর যদি তাঁর কার্যাবলীকে তাঁর প্রজ্ঞার দিক দিয়ে দেখা যায় তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি সাক্ষ দেবে যে, এ দুটি কাজও তিনি অবশ্যই করবেন। কারণ, এগুলো ছাড়া যুক্তির দাবী পূর্ণ হয় না এবং একজন প্রাজ্ঞ সত্তা এ দাবী পূর্ণ করবেন না, এটা অসম্ভব ব্যাপার। মানুষ যে সীমিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করছে তার ফল আমরা দেখি যে, সে যখনই নিজের টাকা-পয়সা, সম্পত্তি বা ব্যবসা-বাণিজ্য কারো হাতে সোপর্দ করে দেয় তার

কাছ থেকে কোনো না কোনো পর্যায়ে হিসেব অবশ্যই নেয়। অর্থাৎ আমানত ও হিসেব-নিকেশের মধ্যে যেন একটি অনিবার্য যৌক্তিক সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের সীমিত প্রজ্ঞাও কোনো অবস্থায় এ সম্পর্ককে উপেক্ষা করতে পারে না। তারপর এ প্রজ্ঞার ভিত্তিতে মানুষ ইচ্ছাকৃত কাজ ও অনিচ্ছাকৃত কাজের মধ্যে ফারাক করে থাকে। ইচ্ছাকৃত কাজের সাথে নৈতিক দায়িত্বের ধারা সম্পৃক্ত করে। কাজের মধ্যে ভালো-মন্দের পার্থক্য করে। ভালো কাজের ফল হিসেবে প্রশংসা ও পুরস্কার পেতে চায় এবং মন্দ কাজের দরুন শাস্তি দাবী করে। এমনকি এ উদ্দেশ্যে নিজেরাই একটি বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলে। যে স্রষ্টা মানুষের মধ্যে এ প্রজ্ঞা সৃষ্টি করেছেন তিনি নিজে এ প্রজ্ঞা হারিয়ে ফেলবেন একথা কি কল্পনা করা যেতে পারে ? একথা কি মেনে নেয়া যায় যে, নিজের এত বড় দুনিয়াটা এত বিপুল সাজ-সরঞ্জাম ও ব্যাপক ক্ষমতা সহকারে মানুষের হাতে সোপর্দ করার পর তিনি ভুলে গেছেন এবং এর হিসেব কখনো নেবেন না ? কোনো সুস্থ ও বোধসম্পন্ন মানুষের বুদ্ধি কি সাক্ষ্য দিতে পারে যে, মানুষের যে সমস্ত খারাপ কাজ শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যায় অথবা যেসব খারাপ কাজের উপযুক্ত শাস্তি তাকে দেয়া যেতে পারেনি, সেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য কখনো আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে না, এবং যেসব ভালো কাজ তাদের ন্যায়সংগত পুরস্কার থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে সেগুলো চিরকাল বঞ্চিতই থেকে যাবে ? যদি এমনটি না হয়ে থাকে, তাহলে কিয়ামত ও মৃত্যু পরের জীবন জ্ঞানবান ও প্রাজ্ঞ আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার একটি অনিবার্য দাবী। এ দাবী পূরণ হওয়া নয় এবং পূরণ না হওয়াটাই সম্পূর্ণ বুদ্ধিবিরোধী ও অযৌক্তিক।[২৩১]

○

এখন চিন্তা করুন, অজস্র রকমের উদ্ভিদের জীবনের জন্য যে ধরনের উপাদান প্রয়োজন, ভূমিতে তার ঠিক উপরিভাগে অথবা উপরিভাগের কাছাকাছি এসব জিনিসের মজুত থাকা এবং পানির মধ্যে ঠিক এমন ধরনের গুণাবলী থাকা যা প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ করে এবং এ পানিকে অনবরত সমুদ্র থেকে উঠানো এবং জমির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময় যথানিয়মে বর্ষণ করা আর মাটি, বাতাস, পানি ও তাপমাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন শক্তির মধ্যে এমন পর্যায়ের আনুপাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা যার ফলে উদ্ভিদ জীবন বিকাশ লাভ করতে পারে এবং সবরকমের জৈব জীবনের জন্য তার অসংখ্য প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম হয়, এসব কিছু কি একজন জ্ঞানবান সত্তার পরিকল্পনা ও সুবিজ্ঞ

ব্যবস্থাপনা এবং প্রবল শক্তি ও সংকল্প ছাড়াই আপনা আপনি হয়ে যেতে পারে ? আর এ ধরনের আকস্মিক ঘটনা কি অনবরত হাজার বছর বরং লাখো কোটি বছর ধরে যথানিয়মে ঘটে যাওয়া সম্ভবপর ? প্রবল আক্রোশ ও বিদ্বেষে অন্ধ একজন চরম হঠকারী ব্যক্তিই কেবল একে একটি আকস্মিক ঘটনা বলতে পারে। কোনো সত্যপ্রিয় বুদ্ধি ও বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে এ ধরনের অযৌক্তিক ও অর্থহীন দাবী করা এবং তা মেনে নেয়া সম্ভব নয়।[২৩২]

○

উদ্ভিদের প্রতিটি প্রজাতির মধ্যে বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা এত বেশী যে, তার যদি শুধু একটি মাত্র চারাকে দুনিয়ায় বংশ বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া হয় তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর চতুরদিকে শুধু তারই চারা দেখা যাবে, অন্যকোন উদ্ভিদের জন্য আর কোনো জায়গা খালি থাকবে না। কিন্তু একজন মহাজ্ঞানী ও অসীম শক্তিধরের সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ এ বিশ্ব চরাচরে উৎপন্ন হচ্ছে। প্রত্যেক প্রজাতির উৎপাদন একটি বিশেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়ার পর থেমে যায়। এ প্রক্রিয়ার আর একটি দিক হচ্ছে, প্রত্যেক প্রজাতির উদ্ভিদের আয়তন, বিস্তৃতি, উচ্চতা ও বিকাশের একটি সীমা নির্ধারিত আছে। কোনো উদ্ভিদ এ সীমা অতিক্রম করতে পারে না। পরিষ্কার জানা যায়, প্রতিটি বৃক্ষ, চারা ও লতাপাতার জন্য কেউ শরীর, উচ্চতা, আকৃতি, পাতা, ফুল, ফল ও উৎপাদনের একটি মাপাজোকা পরিমাণ পুরোপুরি হিসেব ও গণনা করে নির্ধারিত করে দিয়েছে।[২৩৩]

○

এখানে এ সত্যটি সম্পর্কে সজাগ করে দেয়া হয়েছে যে, সীমিত ও পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধির এই নিয়ম কেবল উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং যাবতীয় সৃষ্টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বায়ু, পানি, আলো, শীত, গ্রীষ্ম, জীব, জড়, উদ্ভিদ তথা প্রত্যেকটি জিনিস, প্রত্যেকটি প্রজাতি, প্রত্যেকটি শ্রেণী ও প্রত্যেকটি শক্তির জন্য একটি সীমা নির্ধারিত রয়েছে। তার মধ্যে তারা অবস্থান করছে। তাদের জন্য একটি পরিমাণও নির্ধারিত রয়েছে, তার চাইতে তারা কখনো বাড়েও না আবার কমেও না। এ নির্ধারিত অবস্থা এবং পরিপূর্ণ প্রজ্ঞামূলক নির্ধারিত অবস্থার বদৌলতেই পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বব্যবস্থায় এ ভারসাম্য, সমন্বয় ও পরিপাট্য দেখা যাচ্ছে। এ বিশ্বজাহানটি যদি একটি আকস্মিক ঘটনার ফসল হতো অথবা

বহু খোদার কর্মকুশলতা ও কর্মতৎপরতার ফল হতো, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অসংখ্য বস্তু ও শক্তির মধ্যে এই পর্যায়ের পূর্ণ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা কেমন করে সম্ভব হতো ?[২৩৪]

○

মহাকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক, পৃথিবীর সাথে সূর্য ও চন্দ্রের সম্পর্ক, পৃথিবীর অসংখ্য সৃষ্টির প্রয়োজনের সাথে পাহাড়-পর্বত ও নদী-সাগরের সম্পর্ক—এসব জিনিস এ মর্মে সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কোনো পৃথক এক স্রষ্টা এদেরকে সৃষ্টি করেনি এবং বিভিন্ন স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা এদেরকে পরিচালনা করছে না। যদি এমনটি হতো তাহলে এসব জিনিসের মধ্যে এত বেশী পারস্পরিক সম্পর্ক, সামঞ্জস্য ও একাত্মতা সৃষ্টি হতো না এবং তা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতেও পারতো না। পৃথক পৃথক স্রষ্টার জন্য এটা কেমন করে সম্ভবপর ছিল যে, তারা সবাই মিলে সমগ্র বিশ্বজাহানের সৃষ্টি ও পরিচালনার জন্য এমন পরিকল্পনা তৈরী করতেন, যার প্রত্যেকটি জিনিস পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত একটার সাথে আর একটা মিলে যেতে থাকতো এবং কখনো তাদের স্বার্থের মধ্যে কোনো প্রকার সংঘাত হতো না ?

পৃথিবীর এ বিশাল গ্রহটির মহাশূন্যে ঝুলে থাকা, এর উপরিভাগে এত বড় বড় পাহাড় জেগে ওঠা, এর বুকের ওপর এ বিশালকায় নদী ও সাগরগুলো প্রবাহিত হওয়া, এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য বৃক্ষরাজির ফলে ফুলে সুশোভিত হওয়া এবং অত্যন্ত নিয়ম-শৃংখলাবদ্ধভাবে অনবরত রাত ও দিনের নিদর্শনের বিস্ময়করভাবে আবর্তিত হওয়া—এসব জিনিস যে আল্লাহ এদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর শক্তিমত্তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এহেন অসীম শক্তিধর মহান সত্তাকে মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্বার তাঁকে জীবন দান করতে অক্ষম মনে করা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার নয়, নিরেট নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ।

পৃথিবীর ভৌগোলিক রূপকাঠামো, তার ওপর পর্বতমালা সৃষ্টি, পাহাড় থেকে নদী ও ঝরণাধারা প্রবাহিত হবার ব্যবস্থা, সকল প্রকার ফলের মধ্যে দু' ধরনের ফল সৃষ্টি এবং রাতের পরে দিন ও দিনের পরে রাতকে নিয়মিতভাবে আনার মধ্যে যে সীমাহীন প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা সরবে সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে যে, যে আল্লাহ সৃষ্টির এ নকশা তৈরী করেছেন তিনি একজন পূর্ণ জ্ঞানী। এ সমস্ত জিনিসই এ সংবাদ পরিবেশন করে যে, এগুলো কোনো সংকল্পবিহীন শক্তির কার্যক্রম

এবং কোনো উদ্দেশ্যবিহীন খেলোয়াড়ের খেলনা নয়। এর প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে একজন জ্ঞানীর জ্ঞান এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিপক্ক প্রজ্ঞার সক্রিয়তা দৃষ্টিগোচর হয়।[২৩৫]

○

সারা পৃথিবীকে তিনি একই ধরনের একটি ভূখণ্ড বানিয়ে রেখে দেননি। বরং তার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য ভূখণ্ড, এ ভূখণ্ডগুলো পরস্পর সংলগ্ন থাকা সত্ত্বেও আকার-আকৃতি, রং, গঠন, উপাদান, বৈশিষ্ট্য, শক্তি ও যোগ্যতা এবং উৎপাদন ও রাসায়নিক বা খনিজ সম্পদে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। এ বিভিন্ন ভূখণ্ডের সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যে নানা প্রকার বিভিন্নতার অস্তিত্ব এত বিপুল পরিমাণ জ্ঞান ও কল্যাণে পরিপূর্ণ যে, তা গণনা করে শেষ করা যেতে পারে না। অন্যান্য সৃষ্টির কথা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মানুষের স্বার্থকে সামনে রেখে যদি দেখা যায়, তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে, মানুষের বিভিন্ন স্বার্থ ও চাহিদা এবং পৃথিবীর এ ভূখণ্ডগুলোর বৈচিত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য পাওয়া যায় এবং এসবের বদৌলতে মানুষের সমাজ সংস্কৃতি বিকশিত ও সম্প্রসারিত হবার যে সুযোগ লাভ করে তা নিশ্চিতভাবেই কোনো জ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় সত্তার চিন্তা তাঁর সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং বিজ্ঞতাপূর্ণ সংকল্পের ফলশ্রুতি। একে নিছক একটি আকস্মিক ঘটনা মনে করা বিরাট হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।[২৩৬]

○

যে বৈজ্ঞানিক সমতা ও সামঞ্জস্যশীলতার মাধ্যমে এ গ্রহটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বিষয়াবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারে না। সে অনুভব করতে থাকে, এমন ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যশীলতা একজন জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ ও পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন সত্তার ব্যবস্থাপনা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। এ ভূ-গোলকটি মহাশূন্যে ঝুলছে। কারো ওপর ভর দিয়ে অবস্থান করছে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও এর মধ্যে কোনো দোদুল্যমানতা ও অস্থিরতা নেই। পৃথিবীর কোথাও মাঝে মধ্যে সীমিত পর্যায়ে ভূমিকম্প হলে তার যে ভয়াবহ চিত্র আমাদের সামনে আসে, তাতে গোটা পৃথিবী যদি কোনো কম্পন বা দোদুল্যমানতার শিকার হতো, তাহলে এখানে কোনো মানব বসতি গড়ে ওঠা সম্ভবপর হতো না। এ গ্রহটি নিয়মিতভাবে সূর্যের সামনে আসে আবার পেছনে ফেরে। এর ফলে দিনরাতের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যদি এর

একটি দিক সবসময় সূর্যের দিকে ফেরানো থাকতো এবং অন্য দিকটা সবসময় থাকতো আড়ালে, তাহলে এখানে কোনো প্রাণী বসবাস করতে পারতো না। কারণ একদিকের সার্বক্ষণিক শৈত্য ও আলোকহীনতা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্মলাভের উপযোগী হতো না এবং অন্যদিকের ভয়াবহ দাবদাহ প্রচণ্ড উত্তাপ তাকে পানিহীন, উদ্ভিদহীন ও প্রাণীহীন করে দিতো। এ ভূ-মণ্ডলের পাঁচশো মাইল উপর পর্যন্ত বাতাসের একটি পুরু স্তর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। উল্‌কা পতনের ভয়াবহ প্রভাব থেকে তা পৃথিবীকে রক্ষা করে। অন্যথায় প্রতিদিন কোটি কোটি উল্‌কাপিণ্ড সেকেন্ডে ৩০ মাইল বেগে পৃথিবী পৃষ্ঠে আঘাত হানতো। ফলে এখানে যে ধ্বংস লীলা চলতো তাতে মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা কিছুই জীবিত থাকতো না। এ বাতাসই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, সমুদ্র থেকে মেঘ উঠিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে এবং মানুষ, পশু ও উদ্ভিদের জীবনে প্রয়োজনীয় গ্যাসের যোগান দেয়। এ বাতাস না হলে এ পৃথিবী কোনো বসতির উপযোগী অবস্থান স্থলে পরিণত হতে পারতো না। এ ভুমণ্ডলের ভূত্বকের কাছাকাছি বিভিন্ন জায়গায় খনিজ ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বিপুল পরিমাণে স্তূপীকৃত করা হয়েছে। উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের জীবনের জন্য এগুলো একান্ত অপরিহার্য। যেখানে এ জিনিসগুলো থাকে না সেখানকার ভূমি জীবন ধারণের উপযোগী হয় না। এ গ্রহটিতে সাগর, নদী, হ্রদ, ঝরণা ও ভূগর্ভস্থ স্রোতধারার আকারে বিপুল পরিমাণ পানির ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে। পাহাড়ের ওপরও এর বিরাট ভাণ্ডার ঘনীভূত করে এবং পরে তা গলিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যবস্থাপনা ছাড়া এখানে জীবনের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। আবার এ পানি, বাতাস এবং পৃথিবীতে অন্যান্য যেসব জিনস পাওয়া যায় সেগুলোকে একত্র করে রাখার জন্য এ গ্রহটিতে অত্যন্ত উপযোগ্য মধ্যাকর্ষণ (Gravitation) সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এ মাধ্যাকর্ষণ যদি কম হতো, তাহলে বাতাস ও পানি উভয়কে এখানে আটকে রাখা সম্ভব হতো না এবং তাপমাত্রা এত বেশী বেড়ে যেতো যে, জীবনের টিকে থাকা এখানে কঠিন হয়ে উঠতো। এ মাধ্যাকর্ষণ যদি বেশী হতো, তাহলে বাতাস অনেক বেশী ঘন হয়ে যেতো, তার চাপ অনেক বেশী বেড়ে যেতো এবং জলীয়বাষ্প সৃষ্টি হওয়া কঠিন হয়ে পড়তো, ফলে বৃষ্টি হতো না, ঠাণ্ডা বেড়ে যেতো, ভূ-পৃষ্টের খুব কম এলাকাই বাসযোগ্য হতো বরং ভারিত্বের আকর্ষণ অনেক বেশী হলে মানুষ ও পশুর শারীরিক দৈর্ঘ-প্রস্থ কম হতো কিন্তু তাদের ওজন এত বেড়ে যেতো যে, তাদের পক্ষে চলাফেরা

করা কঠিন হয়ে যেতো। তাছাড়া এ গ্রহটিকে সূর্য থেকে জনবসতির সবচেয়ে উপযোগী একটি বিশেষ দূরত্বে রাখা হয়েছে। যদি এর দূরত্ব বেশী হতো, তাহলে সূর্য থেকে সে কম উত্তাপ লাভ করতো, শীত অনেক বেশী হতো এবং অন্যান্য অনেক জিনিস মিলেমিশে পৃথিবী নামের এ গ্রহটি আর মানুষের মতো সৃষ্টির বসবাসের উপযোগী থাকতো না।

এগুলো হচ্ছে বাসোপযোগিতার কয়েকটি দিক মাত্র। এগুলোর বদৌলতে ভূপৃষ্ঠ তার বর্তমান মানব প্রজাতির জন্য অবস্থান স্থলে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই এসব বিষয় সামনে রেখে চিন্তা-ভাবনা করলে এক মুহূর্তের জন্যও একথা ভাবতে পারে না যে, কোনো পূর্ণ জ্ঞানময় স্রষ্টার পরিকল্পনা ছাড়া এসব উপযোগিতা ও ভারসাম্য নিছক একটি আকস্মিক ঘটনার ফলে আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং একথাও ধারণা করতে পারে না যে, এ মহাসৃষ্টি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং একে বাস্তব রূপদান করার ব্যাপারে কোনো দেব-দেবী বা জিন অথবা নবী-ওলী কিংবা ফেরেশতার কোনো হাত আছে।[২৩৭]

○

মানুষ জলে-স্থলে যেসব সফর করে, সেখানে তাকে পথ দেখাবার জন্য আল্লাহ এমন সব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার সাহায্যে সে নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে নিজের চলার পথ নির্ধারণ করে নিতে পারে। দিনে ভূ-প্রকৃতির বিভিন্ন আলামত এবং সূর্যের উদয়াস্তের দিক তাকে সাহায্য করে এবং অন্ধকার রাতে আকাশের তারকারা তাকে পথ দেখায়। এসবই আল্লাহর জ্ঞানগর্ভ ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনারই একটি অংশ।[২৩৮]

○

আল্লাহ এ বিশ্বজাহানে কোথাও এক রকম অবস্থা রাখেননি। একই পৃথিবী কিন্তু এর ভূখণ্ডগুলোর প্রত্যেকের বর্ণ, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলাদা। একই জমি ও একই পানি, কিন্তু তা থেকে বিভিন্ন প্রকার ফল ও ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। একই গাছ কিন্তু তার প্রত্যেকটি ফল একই জাতের হওয়া সত্ত্বেও তাদের আকৃতি, আয়তন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। একই মূল থেকে দুটি ভিন্ন গাছ বের হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজের একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যে ব্যক্তি এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে সে কখনো মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি, ঝোঁক-প্রবণতা ও মেজাজের

মধ্যে এতবেশী পার্থক্য দেখে পেরেশান হবে না। যেমন এ সূরার সামনের দিকে গিয়ে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে সকল মানুষকে একই রকম তৈরি করতে পারতেন কিন্তু যে জ্ঞান ও কৌশলের ভিত্তিতে আল্লাহ এ বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন তা সমতা, সাম্য ও একাত্মতা নয় বরং বৈচিত্র ও বিভিন্নতার প্রয়াসী। সবাইকে এক ধরনের করে সৃষ্টি করার পর তো এ অস্তিত্বের সমস্ত জীবন প্রবাহই অর্থহীন হয়ে যেতো।[২৩৯]

○

আল ওয়াদূদু ঃ اَلْوَدُوْدُ

অর্থ ঃ অতিশয় স্নেহময় ও প্রেমময়।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা হূদে বলা হয়েছে ঃ

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اِلَيْهِ ط اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۝ هود : ٩٠

"আর তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও ও তাওবা কর। নিশ্চয় আমার প্রভু দয়ালু ও প্রেমময়।"-সূরা হূদ ঃ ৯০

সূরা আল বুরুজে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۝ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝ البروج : ١٣ـ١٤

"নিশ্চয় তিনি প্রথম সৃষ্টি করেন ও পুন সৃষ্টি করেন। আর তিনি ক্ষমাশীল ও প্রেমময়।"-সূরা আল বুরুজ ঃ ১৩-১৪

মহান আল্লাহ পাষাণ হৃদয় ও নির্দয় নন। নিজের সৃষ্টির সাথে তাঁর কোনো শত্রুতা নেই। তাদেরকে অযথা শাস্তি দিতে তিনি চান না। নিজের বান্দাদেরকে মারপিট করে তিনি খুশী হন না। তোমরা যখন নিজেদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে সীমা অতিক্রম করে যাও এবং কোনো প্রকারেই বিপর্যয় সৃষ্টিতে বিরত হও না তখন তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাদের শাস্তি দেন। নয়তো তাঁর অবস্থা হচ্ছে এই যে, তোমরা যতই দোষ কর না কেন যখনই তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে ফিরে আসবে তখনই তাঁর হৃদয়কে নিজেদের জন্য প্রশস্ততর পাবে। কারণ নিজের সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসার অন্ত নেই।[২৪০]

○

আল মাজীদু : اَلْمَجِيْدُ

অর্থ : উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, মহীয়ান, গরীয়ান।

ব্যাখ্যা : সূরা হূদের ৭৩ আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ○ هود : ٧٣

"আর অবশ্যি আল্লাহ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং বড়ই শানশওকতের অধিকারী।"–সূরা হূদ : ৭৩

মাজীদ শব্দটি আরবীতে দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, মহীয়ান, গরীয়ান, মহিমান্বিত ও সম্মানিত। দ্বিতীয়তঃ মহানুভব, মহাদাতা, মহোপকারী। আল্লাহর এ গুণটির উল্লেখ করে মানুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, এত বড় মহিমান্বিত সত্তার সাথে তারা যেন বেয়াদবীর আচরণ করার ধৃষ্টতা না দেখায়।[২৪১]

○

আল বা'ঈছু : اَلْبَاعِثُ

অর্থ : প্রেরণাকারী, উত্থানকারী, মৃতকে জীবন দানকারী

ব্যাখ্যা : সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে :

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً قف فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص

"প্রথমে সব মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। (তারপর এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকেনি, তাদের মধ্যে মতভেদের সূচনা হয়) তখন আল্লাহ্ নবী পাঠান। তারা ছিলেন সত্য সঠিক পথের অনুসারীদের জন্যে সুসংবাদদাতা এবং অসত্য ও বেঠিক পথ অবলম্বনের পরিণতির ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শনকারী।"–সূরা আল বাকারা : ২১৩

তারপর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বনী আদম সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন তারা একটি উম্মত ও একই দলভুক্ত ছিল। অতঃপর লোকেরা নতুন নতুন পথ ও বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে থাকে। তাদের প্রকৃত সত্যের জ্ঞান ছিল না বলে তারা এমনটি করেছিল তা নয় এবং প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত থাকার পরও তাদের কেউ কেউ নিজেদের বৈধ অধিকারের চাইতে বেশী মর্যাদা, স্বার্থ ও লাভ অর্জন করতে চাইতো। এজন্য তারা পরস্পরের ওপর যুলুম, উৎপীড়ন ও বাড়াবাড়ি করার ইচ্ছা পোষণ করতো। এ গলদ ও অনিষ্টকারিতা দূর করার জন্য মহান আল্লাহ্ নবী পাঠাতে শুরু করেন। নবীদেরকে এজন্য পাঠানো হয়নি যে, তাঁরা প্রত্যেকে একটি পৃথক ধর্মের ভিত্ গড়ে তুলবেন এবং প্রত্যেকের পৃথক উম্মত গড়ে উঠবে। বরং মানুষের সামনে তাদের হারানো সত্যপথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে তাদেরকে পুনরায় একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করাই ছিল তাঁদের পাঠাবার উদ্দেশ্য।[২৪২]

○

সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ج وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ ال عمران : ١٦٤

"আসলে ঈমানদারদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন নবী পাঠিয়ে আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সে তাঁর আয়াত তাদেরকে শোনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেয়। অথচ এর আগে এ লোকেরাই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪

সূরা আল জুমআয় ইরশাদ হয়েছে ঃ

هُوَالَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ○

"তিনিই (আল্লাহ) যিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল স্বয়ং তাদেরই মধ্য থেকে পাঠিয়েছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শোনায়, তাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেয়। অথচ এর আগে এ লোকেরাই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল।"
–সূরা আল জুমআ ঃ ২

কুরআন মজীদের চারটি স্থানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেক স্থানেই বর্ণনা করার ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। সূরা আল বাকারার ১২৯ আয়াতে এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে আরববাসীদের একথা বলার জন্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী হয়ে আসাকে তারা যে নিজেদের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত বলে মনে করছে, তা ঠিক নয় বরং প্রকৃতপক্ষে তা তাদের জন্য একটি বড় নিয়ামত। এটি লাভের জন্য হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম তাঁদের সন্তানদের জন্য দোয়া করতেন। সূরা আল বাকারার ১৫১ আয়াতে এসব গুণাবলী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরা যেন নবী (সা)-এর মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবী বানানোর মাধ্যমে যে নিয়ামত তাঁদের দিয়েছেন তা থেকে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারে। সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ আয়াতে আবার এসব গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের মানুষগুলোকে একথা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে তাঁর রাসূল পাঠিয়ে কত বড় ইহসান করেছেন। কিন্তু তারা এমনই অপদার্থ যে, তাঁকে কোনো মর্যাদাই দিচ্ছে না। চতুর্থবারের মত এ সূরাতে ঐ সব গুণাবলী পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ইহুদীদের একথা জানিয়ে দেয়া

যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের চোখের সামনে যেসব কাজ করছেন তা স্পষ্টত একজন রাসূলের কাজ। তিনি আল্লাহর আয়াত শুনাচ্ছেন। এসব আয়াতের ভাষা, বিষয়বস্তু, বর্ণনাভঙ্গি সবকিছুই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তা প্রকৃতই আল্লাহর আয়াত। তা মানুষের জীবনকে সুন্দর, পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত করছে, তাদের নৈতিক চরিত্র, অভ্যাস ও রীতিনীতি এবং লেনদেন ও জীবনাচরণকে সব রকমের কলুষ-কালিমা থেকে পবিত্র করছে এবং উন্নতমানের নৈতিক মর্যাদায় ভূষিত করছে। এটা ঠিক সেই কাজ যা ইতিপূর্বে সমস্ত নবী-রাসূলও করেছেন। তাছাড়া তিনি শুধু আয়াতসমূহ শুনানোকেই যথেষ্ট মনে করেন না, বরং সবসময় নিজের কথা ও কাজ দ্বারা এবং নিজের বাস্তব জীবনের উদাহরণ দ্বারা মানুষকে আল্লাহর কিতাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝাচ্ছেন। তিনি তাদের এমন যুক্তি, বুদ্ধি ও জ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন যা কেবল নবী-রাসূলগণ ছাড়া আর কেউ-ই শিক্ষা দেয়নি। এ ধরনের চরিত্র ও কাজ নবী-রাসূলদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণ। এর সাহায্যেই তাঁদের চেনা যায়। সত্যিকার অর্থে নিজের কর্মকাণ্ড থেকে যার রাসূল হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে তাঁকে তোমরা কেবল এ জন্য অস্বীকার করছো যে, তাঁকে তোমাদের কওমের মধ্য থেকে না পাঠিয়ে এমন এক কওমের মধ্য থেকে পাঠানো হয়েছে যাদেরকে তোমরা 'উম্মী' বলে অবজ্ঞা করে থাকো।[২৪৩]

○

জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের ব্যাপারে বলা যেতে পারে, আল্লাহর কাছে তাদের উত্থান-পতনের সময়-কাল নির্দিষ্ট হওয়ার বিষয়টি তাদের গুণগত অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। একটি ভালো জাতি যদি তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিকৃতির সৃষ্টি করে তাহলে তার কর্মের অবকাশ কমিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে ধ্বংস করে ফেলা হয়। আর একটি ভ্রষ্ট জাতি যদি নিজেদের অসৎ গুণাবলীকে শুধরে নিয়ে সৎগুণাবলীতে পরিবর্তিত করে তাহলে তার কর্মের অবকাশ বাড়িয়ে দেয়া হয়। এমনকি তা কিয়ামত পর্যন্তও দীর্ঘায়িত হতে পারে। এ বিষয়বস্তুর দিকেই সূরা আর রাআদের ১১ আয়াতে ইংগিত করে আল্লাহ্ বলেছেন, আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থার ততক্ষণ পরিবর্তন ঘটান না যতক্ষণ না সে নিজের গুণাবলীর পরিবর্তন করে।[২৪৪]

○

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا ○ النحل : ٨٤

"(তাদের কি কোনই চেতনা নেই যে, সেদিন কি হবে) যখন প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী দাঁড় করানো হবে।"

সেই উম্মতের নবী বা এমন কোনো ব্যক্তি নবীর তিরোধানের পর যিনি সেই উম্মতকে তাওহীদ ও আল্লাহর আনুগত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তাদেরকে শিরক ও মুশরিকী চিন্তা-ভাবনা, ভ্রষ্টাচার ও কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন এবং কিয়ামতের ময়দানে জবাবদিহি করার ব্যাপারে সজাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি এ মর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি তাদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই যাকিছু তারা করেছে তা অজ্ঞতার কারণে নয় বরং জেনে বুঝেই করেছে।[২৪৫]

○

সূরা আন নাহলে বলা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلَى هٰؤُلَاءِ ـ النحل : ٨٩

"(হে মুহাম্মাদ, এদেরকে সেই দিন সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দাও)। যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করিয়ে দেবো, যে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে এবং এদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমি তোমাকে নিয়ে আসবো।"-সূরা আন্ নাহল ঃ ৮৯

সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ○ بنى اسرائيل : ١٥

"আর আমি (হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝাবার জন্য একজন পয়গাম্বর না পাঠিয়ে দেয়া পর্যন্ত কাউকে আযাব দেই না।"-বনী ইসরাঈল ঃ ১৫

আল্লাহর বিচার ব্যবস্থায় নবী এক অতীব মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী। নবী এবং তার নিয়ে আসা কর্মসূচীই বান্দার ওপর আল্লাহর দাবী প্রতিষ্ঠার অকাট্য প্রমাণ। এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হলে বান্দাকে আযাব দেয়া হবে ইনসাফ বিরোধী। কারণ এ অবস্থায় সে এ ওযর পেশ করতে পারবে যে, তাকে তো জানানোই হয়নি কাজেই কিভাবে তাকে পাকড়াও করা হচ্ছে। কিন্তু এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর যারা আল্লাহর পাঠানো পয়গাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অথবা তাকে পাওয়ার পর আবার তা থেকে সরে এসেছে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া ইনসাফের দাবী হয়ে দাঁড়াবে।

নির্বোধরা এ ধরনের আয়াত পড়ে যাদের কাছে কোনো নবীর পয়গাম পৌঁছেনি তাদের অবস্থান কোথায় হবে, এ প্রশ্ন নিয়ে মাথাঘামাতে থাকে। অথচ একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত, তার নিজের কাছে তো পয়গাম পৌঁছে গেছে, এখন তার অবস্থা কি হবে ? আর অন্যের ব্যাপারে বলা যায়, কার কাছে, কবে, কিভাবে এবং কি পরিমাণ আল্লাহর পয়গাম পৌঁছেছে এবং সে তার সাথে কি আচরণ করেছে এবং কেন করেছে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আলিমুল গাইব ছাড়া কেউ বলতে পারেন না কার ওপর আল্লাহর প্রমাণ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কার ওপর হয়নি।২৪৬

○

সূরা আন নাহলে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ النحل : ٣٨

"এরা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে, 'আল্লাহ কোনো মৃতকে পুনর্বার জীবিত করে উঠাবেন না।'—কেন উঠাবেন না ? এতো একটি ওয়াদা, যেটি পুরা করা তিনি নিজের ওপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।"-সূরা আন নাহল ঃ ৩৮

দুনিয়ায় যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, সত্য সম্পর্কে অসংখ্য মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এসব মতবিরোধের ভিত্তিতে বংশ, গোত্র, জাতি ও পরিবারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোরই ভিত্তিতে বিভিন্ন মতাদর্শের ধারকরা নিজেদের জন্য আলাদা আলাদা ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা তৈরি অথবা গ্রহণ করে নিয়েছে। এক একটি মতাদর্শের সমর্থন ও পক্ষপাতিত্বে হাজার হাজার লাখো লাখো লোক বিভিন্ন সময় ধন-প্রাণ, ইয্যত-আবরু সবকিছু কুরবান করে দিয়েছে। আর এ মতাদর্শের সমর্থকদের মধ্যে বহু সময় এমন মারাত্মক সংঘর্ষ হয়েছে যে, তারা একদল অন্যদলকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা করেছে এবং যারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল তারা এ অবস্থায়ও নিজেদের দৃষ্টিভংগী পরিহার করেনি। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর মননশীল মতবিরোধের ক্ষেত্রে বিবেকের দাবী এই যে, এক সময় না এক সময় সঠিক ও নিশ্চিতভাবে প্রতিভাত হোক যথার্থই তাদের মধ্যে হক কি ছিল এবং বাতিল কি ছিল,

কে সত্যপন্থী ছিল এবং কে মিথ্যাপন্থী। এ দুনিয়ায় এ যবনিকা সরে য়াওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যায় না। এ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাই এমন যে, এখানে সত্য কোনোদিন পরদার বাইরে আসতে পারে না। কাজেই বিবেকের এ দাবী পূরণ করার জন্য ভিন্ন আরেকটি জগতের প্রয়োজন।

আর এটি শুধুমাত্র বিবেক-বুদ্ধির দাবীই নয় বরং নৈতিকতারও দাবী। কেনো, এসব মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বহু দল অংশ নিয়েছে। কেউ যুলুম করেছে এবং কেউ যুলুম সহ্য করেছে। কেউ কুরবানী দিয়েছে এবং কেউ সেই কুরবানী আদায় করে নিয়েছে। প্রত্যেকে নিজের মতাদর্শ অনুযায়ী একটি নৈতিক দর্শন ও একটি নৈতিক দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করেছে এবং তা থেকে কোটি কোটি মানুষের জীবন ভালো বা মন্দ প্রভাব গ্রহণ করেছে। শেষ পর্যন্ত এমন একটি সময় অবশ্যি হওয়া উচিত যখন এদের সবার নৈতিক ফলাফল ভালো বা মন্দের আকারে প্রকাশিত হবে। এ দুনিয়ার ব্যবস্থা যদি সঠিক ও পূর্ণাংগ নৈতিক ফলাফলের প্রকাশকে ধারণ করতে অপারগ হয় তাহলে অবশ্যি অন্য একটি দুনিয়া সৃষ্টি হওয়া উচিত যেখানে এ ফলাফলের প্রকাশ সম্ভব হতে পারে।[২৪৭]

○

লোকেরা মনে করে, মরার পর মানুষকে পুনরবার সৃষ্টি করা এবং সামনের পেছনের সমগ্র মানবকুলকে একই সংগে পুনরুজ্জীবিত করা বড়ই কঠিন কাজ। অথচ আল্লাহর ক্ষমতা অসীম। নিজের কোনো সংকল্প পূর্ণ করার জন্য তাঁর কোনো সাজ-সরঞ্জাম, উপায়-উপকরণ ও পরিবেশের আনুকূল্যের প্রয়োজন হয় না। তাঁর প্রত্যেকটি ইচ্ছা শুধুমাত্র তাঁর নির্দেশেই পূর্ণ হয়। তাঁর নির্দেশই সাজ-সরঞ্জামের জন্ম দেয়। তাঁর নির্দেশেই উপায়-উপকরণের উদ্ভব হয়। তাঁর নির্দেশই তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবেশ তৈরি করে। বর্তমানে যে দুনিয়ার অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, এটিও নিছক হুকুম থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং অন্য দুনিয়াটিও মুহূর্তকালের মধ্যে শুধুমাত্র একটি হুকুমেই জন্ম লাভ করতে পারে।[২৪৮]

○

সূরা আল হাজ্জে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيْهَا لا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ○

"কিয়ামতের সময় অবশ্যই আসবে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে উঠাবেন যারা কবরে চলে গেছে।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭

"আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করেন।" আল্লাহ কখনো মৃতদেরকে জীবিত করবেন, একথা শুনে লোকেরা অবাক হয়ে যায়। কিন্তু তারা চোখ মেলে তাকালে দেখতে পাবে, তিনি তো প্রতি মুহূর্তে মৃতকে জীবিত করছেন। যেসব উপাদান থেকে মানুষের শরীর গঠিত হয়েছে এবং যেসব খাদ্যে সে প্রতিপালিত হচ্ছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে রয়েছে কয়লা, লোহা, চুন, কিছু লবণজাত উপাদান ও কিছু বায়ু এবং এ ধরনের আরো কিছু জিনিস। এর মধ্যে কোনো জিনিসেও জীবন ও মানবাত্মার বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এসব মৃত নির্জীব উপাদানগুলোই একত্র করে তাকে একটি জীবিত ও প্রাণময় অস্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। তারপর এসব উপাদান সম্বলিত খাদ্য মানুষের দেহে পরিবেশিত হয় এবং সেখানে এর সাহায্যে পুরুষের মধ্যে এমন শুক্রকীট এবং নারীর মধ্যে এমন ডিম্বকোষের সৃষ্টি হয় যাদের মিলনের ফলে প্রতিদিন জীবন্ত ও প্রাণময় মানুষ তৈরি হয়ে বের হয়ে আসছে। এরপর নিজের আশপাশের মাটির ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নিন। পাখি ও বায়ু অসংখ্য জিনিসের বীজ চারদিকে ছড়িয়ে রেখেছিল এবং অসংখ্য জিনিসের মূল এখানে সেখানে মাটির সাথে মিশে পড়েছিল। তাদের কারো মধ্যেও উদ্ভিদ জীবনের সামান্যতম লক্ষণও ছিল না। মানুষের চারপাশের বিশুষ্ক জমি এ লাখো লাখো মৃতের কবরে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু যখনই এদের ওপর পড়লো পানির একটা ফোঁটা, অমনি চারদিকে জেগে উঠলো জীবনের বিপুল সমারোহ। প্রত্যেকটি মৃত বৃক্ষমূল তার কবর থেকে মাথা উঁচু করলো এবং প্রত্যেকটি নিষ্প্রাণ বীজ একটি জীবন্ত চারাগাছের রূপ ধারণ করলো। মৃতকে জীবিত করার এ মহড়া প্রত্যেক বর্ষা ঋতুতে মানুষের চোখের সামনে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।[২৪৯]

○

সূরা আল আনআমে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝ الانعام : ٣٦

"আর মৃতদেরকে তো আল্লাহ কবর থেকেই ওঠাবেন। তারপর তাদেরকে (তাঁর আদালতে হাযির হবার জন্য) ফিরিয়ে আনা হবে।"

সূরা আল মুজাদালায় বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط - المجادلة : ٦

"সেই দিন যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন এবং তারা কি কাজ করে এসেছে তা জানিয়ে দেবেন।"

সূরা আত তাগাবুনে বলা হয়েছে ঃ

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط - التغابن : ٧

"অমান্যকারীরা ধৃষ্টতার সাথে বললো, মৃত্যুর পর কখনোই তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে না। তাদেরকে বল ঃ না, আমার রবের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে। পরে তোমাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেয়া হবে, তোমরা দুনিয়ায় কি কি করেছো।"

সূরা আল কাসাসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْٓ اُمِّهَا رَسُوْلاً يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا

"আর তোমার রব জনপদগুলো ধ্বংস করেন না যতক্ষণ না তাদের কেন্দ্রে একজন রাসূল পাঠান, যে তাদের কাছে আমার আয়াত শুনায়।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৫৯

পূর্বে যেসব জাতি ধ্বংস হয়েছিল তাদের লোকেরা যালেম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করার পূর্বে নিজের রসূল পাঠিয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। রসূলদের সতর্ক করে দেবার পরও যখন তারা বাঁকা পথে চলা থেকে বিরত হয়নি তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তোমরা এখন এ একই অবস্থায় পতিত হয়েছো। তোমরাও যালেম হয়ে গেছো। একজন রাসূল তোমাদেরকেও সতর্ক করার জন্য এসেছেন। এখন তোমরা কুফরী ও অস্বীকারের নীতি অবলম্বন করে নিজেদের আয়েশ-আরাম ও সমৃদ্ধিকে রক্ষা করতে পারবে না বরং উল্টা বিপদের মুখে ঠেলে দেবে। যে ধ্বংসের আশংকা তোমরা করছো তা ঈমান আনার জন্য নয় বরং অস্বীকার করার কারণে তোমাদের ওপর আপতিত হবে।[২৫০]

○

আশ্ শাহীদু ঃ اَلشَّهِيْدُ

অর্থ ঃ সাক্ষী, দর্শক, তদারককারী।

ব্যাখ্যা ঃ শহীদ শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে সাক্ষী। শহীদ বলতে এমন ব্যক্তি বুঝায় যে নিজের জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তার ঈমানের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে। আল্লাহর পথে লড়াই করে প্রাণ উৎসর্গকারীকেও এ কারণেই শহীদ বলা হয় যে, সে প্রাণ উৎসর্গ করে একথা প্রমাণ করে দেয় যে, সে যে জিনিসের ওপর ঈমান এনেছিল তাকে যথার্থই সাচ্চা দিলে সত্য মনে করতো এবং তা তার কাছে এত বেশী প্রিয় ছিল যে, তার জন্য নিজের প্রাণ অকাতরে বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি। আবার এমন ধরনের সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরকেও শহীদ বলা হয় যারা এতই নির্ভরযোগ্য হয় যে, তারা কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে তাকে নির্দ্বিধায় সত্য ও সঠিক বলে স্বীকার করে নেয়া হয়।[২৫১]

○

মানুষকে মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করার জন্য এতটুকু কথা কি যথেষ্ট নয় যে, ন্যায় ও সত্যের এই আন্দোলনকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন ও ব্যর্থ করার জন্য তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তাদের প্রতিটি আচরণ ও তৎপরতা দেখছেন।[২৫২]

○

আল্লাহর জন্য 'শহীদ' শব্দটির উল্লেখ কুরআন মজীদের বিভিন্ন সূরায় রয়েছে যেমন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ○ النساء : ٣٣

"নিশ্চিত জেনে রাখো আল্লাহ সব জিনিসের তদারক ও তত্ত্বাবধানকারী।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৩

وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○ النساء : ٧٩

"হে মুহাম্মাদ ! আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি এবং এর ওপর আল্লাহর সাক্ষ্য যথেষ্ট।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৭৯

اَنْزَلَه بِعِلْمِهِ ج وَالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○ النساء : ١٦٦

"তিনি যা কিছু তোমাদের ওপর নাযিল করেছেন নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে নাযিল করেছেন এবং এর ওপর ফেরেশতারাও সাক্ষী, যদিও আল্লাহর সাক্ষী হওয়াই যথেষ্ট।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৬৬

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ج فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ط وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○ المائدة : ١١٧

"আমি যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম ততক্ষণ আমি ছিলাম তাদের তদারককারী। যখন আপনি আমাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন তখন আপনিই ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধায়ক। আর আপনি তো সমস্ত জিনিসের তত্ত্বাবধায়ক।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১১৭

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ○

"আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ্য যথেষ্ট, তোমরা আমাদের ইবাদাত করতে থাকলেও) আমরা তোমাদের এ ইবাদাত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।"-সূরা ইউনুস ঃ ২৯

এমন সব ফেরেশতা যাদেরকে দুনিয়ায় দেবদেবী বানিয়ে পূজা করা হয়েছে এবং এমন সব জিন, রূহ, পূর্ববর্তী মনীষী, পূর্বপুরুষ, নবী, অলী, শহীদ ইত্যাদি যাদেরকে আল্লাহর গুণাবলীতে অংশীদার করে এমন অধিকারসমূহ দান করা হয়েছে যেগুলো ছিল আল্লাহর অধিকার। তারা সেখানে নিজেদের পূজারীদেরকে পরিষ্কার বলে দেবে, তোমরা যে আমাদের পূজা করতে তা তো আমরা জানতামই না। তোমাদের কোনো দোয়া, আকুতি, আবেদন, নিবেদন, ফরিয়াদ, নযরানা, মানত, শিরনী, প্রশংসা, স্তবস্তুতি, জপতপ এবং কোনো সিজদা, বেদী চুম্বন ও দরগাহ প্রদক্ষিণ আমাদের কাছে পৌছেনি।[২৫৩]

○

আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ط قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ لا

"এ অস্বীকারকারীরা বলে, তুমি আল্লাহর প্রেরিত নও। বলো, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ্য যথেষ্ট।"–সূরা আর রা'আদ ঃ ৪৩

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ○

"(হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে) বলে দাও, আমার ও তোমাদের মধ্যে শুধু একমাত্র আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি নিজের বান্দাদের অবস্থা জানেন এবং সবকিছু দেখছেন।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৬

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ع - العنكبوت : ٥٢

"(হে নবী)! বলো, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"–সূরা আল আনকাবুত ঃ ৫২

وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا ○ الاحزاب : ٥٥

"(হে নারীগণ)! তোমরা আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাকো। আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ৫৫

স্ত্রীদের কখনো এমন নীতি অবলম্বন করা উচিত নয় যার ফলে স্বামীর উপস্থিতিতে তারা পর্দার নিয়ন্ত্রণ মেনে চলবে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে পর্দা উঠিয়ে দেবে। তাদের এ কর্ম স্বামীর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না।[২৫৪]

○

সূরা আল আহকাফে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِىْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ

فِيْهِ ط كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ - الاحقاف : ٨

"তাদের বলে দাও, আমি নিজেই যদি তা রচনা করে থাকি তাহলে কোনো কিছু আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবে না। যেসব কথা তোমরা তৈরি করছো আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। আমার ও তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য তিনিই যথেষ্ট।"

মুশরিকদের অপবাদ যে ভিত্তিহীন এবং সরাসরি হঠকারিতামূলক তা যেহেতু সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিল তাই তার প্রতিবাদে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অতএব, শুধু একথা বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, যদি প্রকৃতই আমি নিজে একটি বাণী রচনা করে তা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করার মত মহাঅপরাধ করে থাকি—যে অভিযোগে তোমরা

আমাকে অভিযুক্ত করছো—তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য তোমরা আসবে না। কিন্তু এটা যদি আল্লাহরই বাণী হয়ে থাকে আর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তোমরা তা প্রতিরোধ করে থাকো তাহলে তোমাদের সাথে আল্লাহই বুঝাপড়া করবেন। প্রকৃত সত্য আল্লাহর অজানা নয়। সুতরাং মিথ্যা ও সত্যের ফায়সালার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। সারা পৃথিবী যদি কাউকে মিথ্যাবাদী বলে আর আল্লাহর কাছে সে সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই তার পক্ষে হবে। আর গোটা পৃথিবী যদি কাউকে সত্যবাদী বলে কিন্তু আল্লাহর কাছে সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত সে মিথ্যাবাদীই সাব্যস্ত হবে। অতএব, আবোলতাবোল না বলে নিজের পরিণামের কথা চিন্তা করো।[২৫৫]

○

সূরা আল ফাত্‌হ-এ ইরশাদ হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○ الفتح : ٢٨

"আল্লাহই তো সে মহান সত্তা যিনি তার রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন তাকে সমস্ত দীনের ওপর বিজয়ী করে দেন। আর এ বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।"

যখন হুদাইবিয়াতে সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিলো সে সময় মক্কার কাফেররা নবী (সা)-এর সম্মানিত নামের সাথে "রাসূলুল্লাহ" কথাটি লিখতে আপত্তি জানিয়েছিলো, তাদের একগুঁয়েমির কারণে নবী (সা) নিজে চুক্তিপত্র থেকে একথাটি মুছে ফেলেছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমার রাসূলের রাসূল হওয়া একটি অনিবার্য সত্য, কারোর মানা বা না মানাতে তাতে কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না। কিছু লোক যদি তা না মানে না মানুক। তা সত্য হওয়ার জন্য আমার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তাদের অস্বীকৃতির কারণে এ সত্য পরিবর্তিত হয়ে যাবে না। তাদের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও এ রাসূল আমার পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও দীন নিয়ে এসেছেন তা অন্য সব দীনের ওপর বিজয় লাভ করবে। তা ঠেকিয়ে রাখার জন্য এসব অস্বীকারকারীরা যত চেষ্টাই করুক না কেন।[২৫৬]

* এছাড়া এ নামটি নিম্নলিখিত সূরাসমূহেও বর্ণিত হয়েছে ঃ আলে ইমরান ঃ ৯৮ ; আল মায়েদা ঃ ১১৭ ; আল আনআম ঃ ১৯ ; আল হাজ্জ ঃ ১৭ ; আস সাবা ঃ ৪৭ ; হা-মীম আস সাজদা ঃ ৫৩ ; আল মুজাদালা ঃ ৯ ; আল বুরূজ ঃ ৯ ; আল আদিয়াত ঃ ৭।

যে আল্লাহ্ বিশ্বজাহানের সমস্ত তত্ত্ব, সত্য ও রহস্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান রাখেন, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আবরণহীন অবস্থায় দেখছেন এবং যাঁর দৃষ্টি থেকে পৃথিবী ও আকাশের কোনো একটি বস্তুও গোপন নেই—এটি তাঁর সাক্ষ্য এবং তাঁর চাইতে আর বেশী নির্ভরযোগ্য চাক্ষুষ সাক্ষ্য আর কে দিতে পারে ? কারণ সমগ্র সৃষ্টিজগতে তিনি ছাড়া আর কোনো সত্তা খোদায়ী গুণে গুণান্বিত নয়। আর কোনো সত্তা খোদায়ী কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং আর কারো খোদায়ী করার যোগ্যতাও নেই।[২৫৭]

○

আল হাক্কু ঃ اَلْحَقُّ

অর্থ ঃ আসল, সত্য, প্রকৃত।

ব্যাখ্যা ঃ সুরা আল আনআমে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰـهُمُ الْحَقِّ ط ـ الانعام : ٦٢

"তারপর তাদের প্রকৃত মালিক ও প্রভু আল্লাহর দিকে তাদের সবাইকে ফিরিয়ে আনা হয়।"–সূরা আল আনআম ঃ ৬২

সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ

وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰـهُمُ الْحَقِّ ـ يونس : ٣٠

"সবাইকে তার প্রকৃত মালিক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।"

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ج فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلاَّ الضَّلٰلُ ج

"তাহলে তো এ আল্লাহই তোমাদের আসল রব। কাজেই সত্যের পরে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি বাকি আছে ?"সূরা ইউনুস ঃ ৩২

একমাত্র আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত মালিক, প্রতিপালক, প্রভু এবং তোমাদের বন্দেগী ও ইবাদাতের হকদার।২৫৮

সূরা ত্বহায় বলা হয়েছে ঃ ○

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج ـ طه : ١١٤

"কাজেই প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহই হচ্ছেন উন্নত ও মহান।"

সূরা আন নূরে বলা হয়েছে ঃ

وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ○ النور : ٢٥

"আর তারা জানতে পারবে যে, আলাহ সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসেবে প্রকাশ করেন।"–সূরা আন নূর ঃ ২৫

সূরা আল হাজ্জে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى ـ

"এসব কিছু এজন্য যে, আল্লাহ সত্য, তিনি মৃতদের জীবিত করেন।"

আল্লাহর অস্তিত্ব নিছক কাল্পনিক নয়। কতিপয় বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতা দূর করার জন্য এ ধারণা গ্রহণ করা হয়নি। তিনি নিছক দার্শনিকদের চিন্তার আবিষ্কার, অনিবার্য সত্তা ও সকল কার্যকারণের প্রথম কারণই (First cause) নয় বরং তিনি প্রকৃত স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তা, যিনি প্রতি মুহূর্তে নিজের শক্তিমত্তা, সংকল্প, জ্ঞান ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বজাহান ও এর প্রতিটি বস্তু পরিচালনা করছেন। তিনি কোনো খেলোয়াড় নন যে, নিছক মন ভুলাবার জন্য খেলনা তৈরি করেন এবং তারপর অযথা তা ভেঙেচুরে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। বরং তিনি সত্য, তাঁর যাবতীয় কাজ গুরুত্বপূর্ণ, উদ্দেশ্যমূলক ও বিজ্ঞানময়।[২৫৯]

○

সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার কথা বাদ দিয়ে মানুষ যদি শুধুমাত্র নিজেরই জন্মের ওপর চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে জানতে পারবে যে, এক একটি মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহর প্রকৃত ও বাস্তব ব্যবস্থাপনা ও কলা-কৌশল সর্বক্ষণ সক্রিয় রয়েছে। প্রত্যেকের অস্তিত্ব, বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ই তাঁর স্বেচ্ছামূলক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই স্থিরীকৃত হয়। একদল বলে, একটা অন্ধ, বধির এবং জ্ঞান ও সংকল্পহীন প্রকৃতি একটা ধরাবাঁধা আইনের ভিত্তিতে এসব কিছু চালাচ্ছে। কিন্তু তারা চোখ মেলে তাকালে দেখতে পাবে যে, এক একটি মানুষ যেভাবে অস্তিত্ব লাভ করে এবং তারপর যেভাবে অস্তিত্বের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে, তার মধ্যে একজন অতিশয় জ্ঞানী ও একচ্ছত্র শক্তিশালী সত্তার ইচ্ছামূলক সিদ্ধান্ত কেমন সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষ যে খাদ্য খায়, তার মধ্যে কোথাও মানবিক বীজ লুকিয়ে থাকে না এবং তার মধ্যে এমন কোনো জিনিস থাকে না যা মানবিক প্রাণের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। এ খাদ্য শরীরে গিয়ে কোথাও চুল, কোথাও গোশত এবং কোথাও হাড়ে পরিণত হয়, আবার একটি বিশেষ স্থানে পৌঁছে এ খাদ্যই এমন শুক্রে পরিণত হয়, যার মধ্যে মানুষে পরিণত হবার যোগ্যতার অধিকারী বীজ থাকে। এ বীজগুলোর সংখ্যা এত অগণিত যে, একজন পুরুষ থেকে একবারে যে শুক্র নির্গত হয় তার মধ্যে কয়েক কোটি শুক্রকীট পাওয়া যায় এবং তাদের প্রত্যেকেই স্ত্রী-ডিম্বের সাথে মিলে মানুষের রূপ লাভ করার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু একজন জ্ঞানী, সর্বশক্তিমান ও একচ্ছত্র শাসকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এ অসংখ্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে মাত্র একজনকে কোনো বিশেষ সময় ছাটাই বাছাই করে এনে স্ত্রী-ডিম্বের সাথে মিলনের সুযোগ দেয়া হয় এবং এভাবে গর্ভধারণ প্রক্রিয়া চলে। তারপর গর্ভধারণের সময় পুরুষের

শুক্রকীট ও স্ত্রীর ডিম্বকোষের (Egg cell) মিলনের ফলে প্রথমদিকে যে জিনিসটি তৈরি হয় তা এত ছোট হয় যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা সম্ভব নয়। এ ক্ষুদ্র জিনিসটি নয় মাস ও কয়েক দিন গর্ভাশয়ে লালিত হয়ে যে অসংখ্য স্তর অতিক্রম করে একটি জ্বলজ্যান্ত মানুষের রূপ গ্রহণ করে তার মধ্য থেকে প্রতিটি স্তরের কথা চিন্তা করলে মানুষের মন নিজেই সাক্ষ দেবে যে, এখানে প্রতি মুহূর্তে একজন সদা তৎপর বিচক্ষণ জ্ঞানীর ইচ্ছামূলক সিদ্ধান্ত কাজ করে চলছে। তিনিই সিদ্ধান্ত দেন, কাকে পূর্ণতায় পৌছাবেন এবং কাকে রক্তপিণ্ডে অথবা গোশ্‌তের টুকরায় কিংবা অসম্পূর্ণ শিশুর আকারে খতম করে দেবেন। তিনিই সিদ্ধান্ত নেন, কাকে জীবিত বের করবেন এবং কাকে মৃত। কাকে সাধারণ মানবিক আকার আকৃতিতে বের করে আনবেন এবং কাকে অসংখ্য অস্বাভাবিক আকারের মধ্য থেকে কোনো একটি আকার দান করবেন। কাকে পূর্ণাংগ মানবিক অবয়ব দান করবেন আবার কাকে অন্ধ, বোবা, বধির বা লুলা ও পংগু বানিয়ে বের করে আনবেন। কাকে সুন্দর করবেন এবং কাকে কুৎসিত। কাকে পুরুষ করবেন এবং কাকে নারী, কাকে উচ্চ পর্যায়ের শক্তি ও যোগ্যতা দিয়ে পাঠাবেন এবং কাকে নির্বোধ ও বেকুফ করে সৃষ্টি করবেন। সৃজন ও আকৃতিদানের এ কাজটি প্রতিদিন কোটি কোটি নারীর গর্ভাশয়ে চলছে। এর মাঝখানে কোনো সময় কোনো পর্যায়েও এক আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোনো শক্তি সামান্যতমও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বরং কোন্ পেটে কি জিনিস তৈরি হচ্ছে এবং কি তৈরি হয়ে বের হয়ে আসবে এতটুকুও কেউ বলতে পারে না। অথচ মানব সন্তানদের কমপক্ষে শতকরা ৯০জনের ভাগ্যের ফায়সালা এ স্তরগুলোতেই হয়ে যায় এবং এখানেই কেবল ব্যক্তিদেরই নয় জাতিসমূহেরও, এমনকি সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যতের ভাঙাগড়া সম্পন্ন হয়। এরপর যেসব শিশু দুনিয়ায় আসে তাদের কাকে প্রথম শ্বাস নেবার পরই মরে যেতে হবে, কাকে বড় হয়ে যুবক হতে হবে এবং কার যৌবনের পর বার্ধক্যের পাঠ চুকাতে হবে, তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে কে এ সিদ্ধান্ত নেয়? এখানে একটি প্রবল ইচ্ছা কার্যকর দেখা যায়। গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা করলে অনুভব করা যাবে তাঁর কর্মতৎপরতা কোনো বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপনা ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং এরি ভিত্তিতে তিনি কেবল ব্যক্তিদেরই নয়, জাতির ও দেশের ভাগ্যেরও ফায়সালা করছেন। এসব কিছু দেখার পরও যদি আল্লাহ "সত্য" এবং একমাত্র আল্লাহই "সত্য"—এ ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করে তাহলে নিসন্দেহে সে বুদ্ধিভ্রষ্ট।[২৬০]

○

তিনিই সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী ও যথার্থ রব। তাঁর বন্দেগীকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। আর অন্যান্য সকল মাবুদই আসলে পুরোপুরি অসত্য ও অর্থহীন। তাদেরকে যেসব গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক মনে করা হয়েছে সেগুলোর মূলত কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের ভরসায় যারা বেঁচে থাকে তারা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না।[২৬১]

○

এসব বানোয়াট ইলাহদের গোষ্ঠীই তাদের বান্দাদের মুখাপেক্ষী। একমাত্র সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রকৃত একচ্ছত্র মালিক ও প্রভু আল্লাহই সে আসল আল্লাহ, যাঁর কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব, উপাস্যত্ব ও প্রভুত্বের গৌরব তাঁর আপন শক্তি ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।[২৬২]

○

সূরা লুকমানে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ - لقمن : ٣٠

"এসব হচ্ছে এ কারণে যে, আল্লাহই হচ্ছে সত্য।"–সূরা লুকমান ঃ ৩০

প্রকৃত সার্বভোম ক্ষমতার কর্তা, সৃষ্টি ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনার আসল ও একচ্ছত্র মালিক।

তারা সবাই নিছক তোমাদের কাল্পনিক খোদা। তোমরা কল্পনার জগতে বসে ধারণা করে নিয়েছো যে, অমুক জন আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার এবং অমুক মহাত্মা সংকট নিরসন ও অভাব মোচন করার ক্ষমতা রাখেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের কেউ কোনো কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না।[২৬৩]

○

আল ওয়াকীলু ঃ اَلْوَكِيْلُ

অর্থ ঃ কর্ম সম্পাদনকারী, যার কাছে নিজের দায়দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায়, তত্ত্বাবধায়ক।

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ق وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○ ال عمران : ١٧٣

"তা শুনে তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেছে এবং তারা জবাবে বলেছে—আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে ভালো কার্য উদ্ধারকারী।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৩

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○ الانعام : ١٠٣

"সবকিছুর তিনিই স্রষ্টা। কাজেই তোমরা তাঁরই বন্দেগী করো। তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।"–সূরা আল আনআম ঃ ১০৩

اِنَّمَا اَنْتَ نَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○ هود : ١٢

"তুমি তো নিছক সতর্ককারী। এরপর আল্লাহই সব কাজের ব্যবস্থাপক।"–সূরা হূদ ঃ ১২

فَلَمَّا اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ○ يوسف : ٦٦

"যখন তারা তার কাছে অঙ্গীকার করলো তখন সে বললো, দেখো, আল্লাহ আমাদের একথার তত্ত্বাবধায়ক।"–সূরা ইউসুফ ঃ ৬৬

اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ط وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ

"এ দুটি মেয়াদের মধ্য থেকে যেটাই আমি পূরণ করে দেবো তারপর আমার ওপর যেন আর চাপ দেয়া না হয়। আর যা কিছু দাবী ও অঙ্গীকার আমরা করছি আল্লাহ তার তত্ত্বাবধায়ক।"-সূরা কাসাস ঃ ২৮

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○ الزمر : ٦٢

"আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক।"
–সূরা আয্ যুমার ঃ ৬২

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○ النساء : ٨١

"তুমি তাদের পরোয়া করো না, আল্লাহর ওপর ভরসা করো, ভরসা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"–সূরা আন নিসা ঃ ৮১

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاًO النساء : ١٣٢

"আল্লাহ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। আর কার্য সম্পাদনের জন্য তিনিই যথেষ্ট।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৩২

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً O النساء : ١٧١

"পৃথিবী ও আকাশের সবকিছুই তাঁর মালিকানাধীন এবং সে সবের প্রতিপালক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট।"
–সূরা আন নিসা ঃ ১৭১

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاًO الاحزاب : ٣

"আল্লাহর প্রতি নির্ভর করো। কর্ম সম্পাদনের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৩

وَدَعْ اَذٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاًO الاحزاب : ٤٨

"পরোয়া করো না তাদের পীড়নের এবং ভরসা করো আল্লাহর প্রতি। আল্লাহই যথেষ্ট এজন্য যে, মানুষ তাঁর হাতে তার যাবতীয় বিষয় সোপর্দ করে দেবে।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৪৮

বান্দা তার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেবে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি পথ দেখাবার জন্যও যথেষ্ট এবং সাহায্য করার জন্যও। আর তিনিই এ বিষয়ের নিশ্চয়তাও দেন যে, তাঁর পথনির্দেশের আলোকে কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তি কখনো অশুভ ফলাফলের সম্মুখীন হবে না।[২৬৪]

O

তিনি কেবল পৃথিবী সৃষ্টিই করেননি বরং তিনিই এর সব জিনিসের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যেমন তাঁর সৃষ্টি করার কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি তাঁর টিকিয়ে রাখার কারণেই টিকে আছে, তাঁর প্রতিপালনের কারণেই বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের কল্যাণেই তা কাজ করছে।[২৬৫]

O

যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং যারা তাঁর পথনির্দেশনা, সুযোগ দান ও সাহায্যের ওপর আস্থা রাখবে তাদের এ আস্থা ভুল প্রমাণিত হবে না। তাদের অন্য কোনো সহায় ও নির্ভয়ের প্রয়োজন হবে না। তাদের পথ দেখাবার এবং হাতে ধরার ও সাহায্য করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন। তবে যারা নিজেদের শক্তির ওপর ভরসা করে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর নির্ভর করে তারা এ পরীক্ষা পর্ব সাফল্যের সাথে অতিক্রম করতে পারবে না।[২৬৬]

○

সূরা আল মুয্যাম্মিলে বলা হয়েছে ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً۝ المزمل : ٩

"তিনি পূর্ব পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাই তাঁকেই নিজের উকীল হিসেবে গ্রহণ করো।"–মুযযাম্মিল ঃ ৯

উকীল বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার প্রতি আস্থা রেখে কোনো ব্যক্তি নিজের ব্যাপার তার ওপর সোপর্দ করে। বাংলা ভাষায় প্রায় এ অর্থেই আমরা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উকীল শব্দটি ব্যবহার করি, আমাদের মামলা-মোকদ্দমা যার হাতে অর্পণ করে এতটা নিশ্চিন্ত হয়ে যাই যে, সে আমাদের পক্ষ থেকে ভালভাবেই মামলাটি লড়বে এবং আমাদের এ মামলা লড়ার কোনো দরকার হবে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতটির অর্থ হলো, দীনের দাওয়াত পেশ করার কারণে তোমার বিরোধিতার যে তুফান সৃষ্টি হয়েছে এবং তোমার ওপর যেসব বিপদ-মুসিবত আসছে, সে জন্য তুমি অস্থির বা উৎকণ্ঠিত হয়ো না। তোমার প্রভু তো সেই সত্তা যিনি পূর্ব ও পশ্চিম তথা সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিক। খোদায়ী ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁর ছাড়া আর কারো হাতে নেই। তুমি তোমার সমস্ত ব্যাপার তাঁর হাতে সোপর্দ করে দাও এবং নিশ্চিন্ত হয়ে যাও যে, এখন তোমার মোকদ্দমা তিনি নিজে লড়বেন, তোমার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে তিনিই বুঝাপড়া করবেন এবং তোমার সব কাজ তিনিই সম্পন্ন করবেন।[২৬৭]

○

আল কাবিয়্যু ঃ اَلْقَوِىُّ

অর্থ ঃ অত্যন্ত শক্তিশালী, পরাক্রমশালী, ক্ষমতাশালী।

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ○ الانفال : ٥٢

"আল্লাহ ক্ষমতাশালী এবং কঠোর শাস্তিদাতা।"

–সূরা আল আনফাল ঃ ৫২

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ○ هود : ٦٦

"নিসন্দেহে তোমার রবই আসলে শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী।"

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ○ الحج : ٤٠

"আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত।"–সূরা হাজ্জ ঃ ৪০

مَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ○ الحج : ٧٤

তাঁরা আল্লাহর কদরই বুঝলো না, যেমন তা বুঝা উচিত। আসল ব্যাপার হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহই শক্তিমান ও মর্যাদা সম্পন্ন।"

তাঁর দান ও পুরস্কারের এ ব্যবস্থা নিজের শক্তিতেই চলছে। কারো ক্ষমতা নেই তা পরিবর্তন করতে পারে বা জোরপূর্বক তাঁর কাছ থেকে কিছু নিতে পারে, কিংবা কাউকে দান করার ব্যাপারে তাকে বিরত রাখতে পারে।[২৬৮]

○

আল্লাহ তাআলার সবসময় এ ক্ষমতা আছে যে, যখন ইচ্ছা তিনি তাঁর একটি ইংগিতেই সমস্ত কাফেরকে পরাস্ত করে তাঁদের ওপর তাঁর রসূলদের আধিপত্য দান করতে পারেন। কিন্তু তাতে রসূলদের ওপর ঈমান আনায়নকারীদের কি কৃতিত্ব থাকবে যে, তারা পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাই আল্লাহ তাআলা এ কাজকে তাঁর বিজয়ী শক্তির সাহায্যে আঞ্জাম দেয়ার পরিবর্তে এ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন যে, তার রসূলদেরকে 'বাইয়েনাত' স্পষ্ট নিদর্শনাদী, কিতাব ও মিযান দিয়ে মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন।[২৬৯] ○

আল মাতীনু : اَلْمَتِيْنُ.

যুল কুওয়্যাতিল মাতীন : ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ

অর্থ : অজেয়, অব্যর্থ, অনমনীয়, যাঁকে কেউ নাড়াতে পারে না, দমাতে পারে না, পরাজিত করতে পারে না।

ব্যাখ্যা : সূরা আল অ'রাফের ১৮৩ এবং সূরা আল কালামের ৪৫ আয়াতে বলা হয়েছে :

اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ - الاعراف : ١٨٣، القلم : ٤٥

"আমার কৌশল অব্যর্থ।"-সূরা আ'রাফ : ১৮৩, সূরা কালাম : ৪৫

সূরা আয্ যারিয়াতের ৫৮ আয়াতে বলা হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ٥ الذريت : ٥٨

"আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।"-সূরা আয্ যারিয়াত : ৫৮

আল ওয়ালিয়্যু ঃ اَلْوَلِىُّ

অর্থ ঃ সহায়, রক্ষক, সংগী, বন্ধু, প্রভু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী, তদারককারী ও তত্ত্বাবধায়ক।

ব্যাখ্যা ঃ অলী অর্থ এমন সত্তা যিনি তাঁর নিজের তৈরী সমস্ত সৃষ্টির সব ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক, যিনি বান্দাদের সমস্ত অভাব ও প্রয়োজন পূরণের সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।[২৭০]

○

অভিভাবকত্ব কোনো মনগড়া বস্তু নয় যে, আপনি যাকে ইচ্ছা আপনার অভিভাবক বানিয়ে নিবেন আর বাস্তবেও সে আপনার অভিভাবক হয়ে যাবে এবং অভিভাবকত্বের হক আদায় করবে। এটা এমন এক বাস্তব জিনিস যা মানুষের আশা আকাংখা অনুসারে হয় না বা পরিবর্তিতও হয় না। আপনি মানেন আর না মানেন বাস্তবে যিনি অভিভাবক তিনিই আপনার অভিভাবক। আর বাস্তবে যে অভিভাবক নয় আপনি মৃত্যু পর্যন্ত তাকে মানলেও এবং অভিভাবক মনে করলেও সে অভিভাবক নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু আল্লাহই অভিভাবক আর কেউ অভিভাবক নয় তার প্রমাণ কি ? এর জবাব হচ্ছে, মানুষের প্রকৃত অভিভাবক হতে পারেন তিনি যিনি মৃত্যুকে জীবনে রূপ দেন, যিনি প্রাণহীন বস্তুর মধ্যে জীবন দান করে জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করার শক্তি ও ইখতিয়ারের অধিকারী। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ যদি তেমন থাকে তাহলে তাকে অভিভাবক বানান। আর যদি শুধু আল্লাহই তেমন হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা এবং আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।[২৭১]

○

সূরা আল আনকাবূতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○ العنكبوت : ٢٢

"এবং আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার মতো কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী তোমাদের নেই।"–সূরা আল আনকাবূত ঃ ২২

অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদের শক্তির জোরে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং তোমাদের এমন কোনো অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক বা সাহায্যকারীও নেই যে আল্লাহর মুকাবিলায় তোমাদের আশ্রয় দিতে পারে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারে। যারা শির্ক ও কুফরী করেছে, আল্লাহর বিধানের সামনে নত হতে অস্বীকার করেছে এবং বুক ফুলিয়ে আল্লাহর নাফরমানী করেছে এবং তাঁর যমীনে ব্যাপকভাবে যুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, সমগ্র বিশ্বজাহানে তাদের সাহায্য ও সহায়তা দানকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবার এবং আল্লাহর আযাবের ফায়সালাকে তাদের ওপর কার্যকর হওয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নেই। অথবা সমগ্র বিশ্বজগতে এমন একজনও নেই যে, আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে একথা বলার সাহস রাখে যে, এরা আমার লোক, কাজেই এরা যা কিছু করেছে তা মাফ করে দেয়া হোক।[২৭২]

○

যে যালেম আল্লাহর দিক থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে নিজের অভিভাবক বানিয়ে নেয়, অযথা জোর করে তাঁর অভিভাবক হওয়ার এমন কোনো প্রয়োজন আল্লাহর পড়েনি। সে অন্য যাদেরকে অভিভাবক বানায় তাদের আদৌ এমন কোনো জ্ঞান, শক্তি বা ক্ষমতা-ইখতিয়ার নেই যার ভিত্তিতে অভিভাবকত্বের হক আদায় করে তাকে সফল করিয়ে দিতে পারে।[২৭৩]

○

এটা আল্লাহর বিশ্বজাহানের অধিপতি এবং সত্যিকার অভিভাবক হওয়ার স্বাভাবিক ও যৌক্তিক দাবী। রাজত্ব ও অভিভাবকত্ব যখন তাঁরই তখন শাসকও অনিবার্যরূপে তিনিই এবং মানুষের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও মতানৈক্যের ফায়সালা করাও তাঁরই কাজ।[২৭৪]

○

সূরা আশ শূরায় বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ط - الشورى : ٤٤

"আল্লাহ নিজেই যাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন আল্লাহ ছাড়া তাকে সামলানোর আর কেউ নেই।"–সূরা আশ শূরা ঃ ৪৪

অর্থাৎ আল্লাহ এসব লোকের হেদায়াতের জন্য কুরআনের মত সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব পাঠিয়েছেন, যা অত্যন্ত যুক্তিসংগত এবং অত্যন্ত কার্যকর

ও চিত্তাকর্ষক উপায়ে প্রকৃত সত্যের জ্ঞান দান করছে এবং জীবনের সঠিক পথ বলে দিচ্ছে। তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত নবী পাঠিয়েছেন যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীবন ও চরিত্রের অধিকারী মানুষ তাদের দৃষ্টি কখনো দেখেনি। আল্লাহ এ কিতাব ও এ রাসূলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুফলসমূহ ও ঈমান গ্রহণকারীদেরকে তাদের নিজ চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন। এসব দেখার পর যদি কোনো ব্যক্তি হেদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ পুনরায় তাকে সেই গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করবেন যেখান থেকে সে বেরিয়ে আসতে আগ্রহী নয়। আর আল্লাহই যখন তাকে তাঁর দরজা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেন তখন তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব কে নিতে পারে?[২৭৫]

○

সূরা আল জাসিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ○ الجاثية : ١٩

"যালেমরা একে অপরের বন্ধু এবং মুত্তাকীদের বন্ধু আল্লাহ।"

পবিত্র কুরআনের আলোকে অলী শব্দটির নিম্নোক্ত চারটি অর্থ জানা যায় ঃ

এক ঃ মানুষ যার কথামত কাজ করে, যার নির্দেশনা মেনে চলে এবং যার রচিত নিয়ম-পন্থা, রীতিনীতি এবং আইন-কানুন অনুসরণ করে (আন নিসা ঃ ১১৮–১২০ ; আল আ'রাফ ঃ ৩ ও ২৭–৩০)।

দুই ঃ যার দিকনির্দেশনার (Guidance) ওপর মানুষ আস্থা স্থান করে এবং মনে করে সে তাকে সঠিক রাস্তা প্রদর্শনকারী এবং ভ্রান্তি থেকে রক্ষাকারী। (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৭ ; সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৭ ; আল কাহ্ফ ঃ ১৭ ও আল জাসিয়া ঃ ১৯)।[২৭৬]

○

তিন ঃ যার সম্পর্কে মানুষ মনে করে, আমি পৃথিবীতে যাই করি না কেন সে আমাকে তার কুফল থেকে রক্ষা করবে। এমনকি যদি আল্লাহ থাকেন এবং আখেরাত সংঘটিত হয় তাহলে তার আযাব থেকেও রক্ষা করবেন (সূরা আন নিসা ঃ ১২৩-১৭৩ ; সূরা আল আনআম ঃ ৫১ ; সূরা আর রা'দ ৩৭ ; আল আনকাবুত ঃ ২২ ; সূরা আল আহ্যাব ঃ ৬৫ ; সূরা আয্ যুমার ঃ ৩)।

চার ঃ যার সম্পর্কে মানুষ মনে করে, পৃথিবীতে তিনি অতি প্রাকৃতিক উপায়ে তাকে সাহায্য করেন, বিপদাপদে তাকে রক্ষা করেন। রুজি-রোজগার দান করেন, সন্তান-সন্ততি দান করেন, ইচ্ছা পূরণ করেন এবং অন্যান্য সব রকম প্রয়োজন পূরণ করেন।–(সূরা হূদ ঃ ২০, সূরা আর রা'দ ঃ ১৬ ও সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪১)।

অলী (ولى) শব্দটি কুরআন মজীদের কোনো কোনো জায়গায় ওপরে বর্ণিত অর্থসমূহের কোনো একটি বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কোথাও কোথাও সবগুলো অর্থ একত্রেও বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটি তারই একটি। এখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অলী বা অভিভাবক বানানোর অর্থ ওপরে বর্ণিত চারটি অর্থেই তাদেরকে পৃষ্ঠপোষক, সহযোগী ও সাহায্যকারী মনে করা।[২৭৭]

○

প্রকৃতপক্ষে মানুষের ও গোটা সৃষ্টিকুলের অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ। অন্যরা না প্রকৃত অভিভাবক, না আছে তাদের প্রকৃত অভিভাবকত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার ক্ষমতা। মানুষ তার স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার প্রয়োগ করে নিজের অভিভাবক নির্বাচনে ভুল করবে না এবং যে প্রকৃতই অভিভাবক তাকেই অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে। এর ওপরেই তার সফলতা নির্ভর করে।[২৭৮]

○

আল মাওলা ঃ اَلْمَوْلٰى

অর্থ ঃ অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু, সহযোগী, সহায়ক, রক্ষক।

ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষায় (مولى) শব্দটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয় যে কোনো সম্পর্কের কারণে অন্য কোনো ব্যক্তিকে সহযোগিতা করে। সেই সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্ক হোক কিংবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হোক অথবা অন্য কোনো প্রকারের সম্পর্ক হোক তা দেখার বিষয় নয়।[২৭৯]

○

ওহুদ যুদ্ধে নবী (স) যখন আহত হয়ে কতিপয় সাহাবীর সাথে একটি ঘাঁটিতে অবস্থান করছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বলছিল— لَنَا عُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ "আমাদের উয্যা আছে এবং তোমাদের উয্যা নেই।"

এরপর নবী (স) সাহাবীদের বললেন, ওকে জবাব দাও ঃ

اَللّٰهُ مَوْلٰنَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ۔

"আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী ও সহযোগী ; কিন্তু তোমাদের কোনো সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক নেই।"

রাসূল (স)-এর এ জবাব সূরা মুহাম্মাদের ১১ আয়াত থেকে গৃহীত।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَامَوْلٰى لَهُمْ۔

"এর কারণ, আল্লাহ স্বয়ং ঈমান গ্রহণকারীদের সহযোগী ও সাহায্যকারী। কিন্তু কাফেরদের সহযোগী ও সাহায্যকারী কেউ নেই।"

সূরা আত তাহ্রীমের দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ "আল্লাহ তোমাদের মালিক মনিব।" অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই তোমার মনিব এবং তোমার যাবতীয় ব্যাপারে মুতাওয়াল্লী বা দায়িত্বশীল। কোন্ জিনিসে তোমার কল্যাণ, তা তিনিই ভালো জানেন। আর যে আইন বিধানই তিনি দিয়েছেন, তা পুরোপুরি যুক্তির ভিত্তিতে দিয়েছেন। তুমি স্বাধীন স্বেচ্ছাচালিত নও। বরং তুমি আল্লাহর বান্দাহ এবং তিনি তোমার মুনিব। এ কারণে তাঁর নির্ধারিত নিয়ম-বিধানের রদবদল করার কোনো ইখতিয়ার তোমাদের কারো নেই। তোমাদের কর্তব্য হলো, নিজেদের

যাবতীয় ব্যাপার তাঁর ওপর সোপর্দ করে দিয়ে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করতে থাকবে।[২৮০]

○

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ○ال عمران : ١٥٠

"প্রকৃত সত্য এই যে, আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী এবং তিনি সবচেয়ে ভালো সাহায্যকারী।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫০

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

"আর যদি তারা না মানে তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের পৃষ্ঠপোষক এবং তিনি সবচেয়ে ভালো সাহায্য সহায়তাদানকারী।"
–সূরা আল আনফাল ঃ ৪০

وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

"এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও। তিনি তোমাদের অভিভাবক, বড়ই ভালো অভিভাবক তিনি, বড়ই ভালো সাহায্যকারী তিনি।"
–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৮

وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○التحريم : ٢

"আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। আর তিনিই সর্বজ্ঞ ও সুষ্ঠু সুদৃঢ় কর্ম সম্পাদনকারী।"–সূরা আত তাহরীম ঃ ২

মযবুতভাবে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরো। পথনির্দেশনা ও জীবনযাপনের বিধান তাঁর কাছ থেকেই নাও। তাঁরই আনুগত্য করো। তাঁকেই ভয় করো। আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁরই সাথে বিজড়িত করো। সাহায্যের জন্য তাঁরই কাছে হাত পাতো। তাঁরই সত্তার ওপর নির্ভর করে তাওয়াক্কুল ও আস্থার বুনিয়াদ গড়ে তোলো।[২৮১]

○

একমাত্র আল্লাহই যে, সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন, সকল শক্তির অধিকারী, সমস্ত ইখতিয়ার ও কর্মক্ষমতা যে তাঁরই হাতে সীমাবদ্ধ, তোমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ করার যাবতীয় ক্ষমতা যে তাঁরই আয়ত্তাধীন এবং তাঁরই হাতে যে রয়েছে তোমাদের ভাগ্যের চাবিকাঠি।[২৮২]

○

আল হামীদু ঃ اَلْحَمِيْدُ

অর্থ ঃ স্বতঃ প্রশংসিত, প্রশংসনীয় গুণাবলী সম্পন্ন।

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

"তাহলে তোমরা কখনো তা নিতে রাযী হও না, যদি না তা নেবার ব্যাপারে তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকো। তোমাদের জেনে রাখা উচিত আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭

رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ط اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌO هود : ٧٣

"(হে ইবরাহীমের গৃহবাসীরা!) তোমাদের প্রতি তো রয়েছে আল্লাহর রহমত ও বরকত, আর আবশ্যি আল্লাহ্ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং বড়ই শানশওকতের অধিকারী।"–সূরা হূদ ঃ ৭৩

وَقَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا لا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌO

"আর মূসা বললো, যদি তোমরা কুফরী করো এবং পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীও কাফের হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর কিছু যায় আসে না এবং তিনি আপন সত্তায় আপনি প্রশংসিত।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৮

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُO

"যা কিছু আকাশে ও পৃথিবীতে আছে সব তাঁরই, নিসন্দেহে তিনিই অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসার্হ।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৬৪

وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌO

"যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তার কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজেরই জন্য লাভজনক। আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে, সে ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী এবং নিজে নিজেই প্রশংসিত।"
–সূরা লুকমান ঃ ১২

يَآيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ج وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ۝

"হে লোকেরা, তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ তো অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ।"–ফাতের ঃ ১৫

لاَ يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ط تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ۝

"বাতিল না পারে সামনে থেকে এর ওপর চড়াও হতে, না পারে পেছন থেকে। এটা মহাজ্ঞানী ও পরম প্রশংসিত সত্তার নাযিলকৃত জিনিস।"–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৪২

وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ط وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ۝ الشورى : ٢٨

"তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি মানুষদের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং রহমত বিস্তার করে দেন। তিনি প্রশংসার যোগ্য অভিভাবক।"–সূরা আশ শূরা ঃ ২৮

وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ۝ الحديد : ٢٤

"এরপরও যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ অভাবশূন্য ও অতি প্রশংসিত।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ২৪

فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ۝ التغابن : ٦

"এভাবে তারা মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন আল্লাহও তাদের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে গেলেন। আর আল্লাহ অভাব শূন্য, সর্বগুণে গুণান্বিত।"–সূরা আত তাগাবুন ঃ ৬

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ۝ البروج : ٨

"ওই ঈমানদারদের সাথে তাদের শত্রুতার এছাড়া আর কোনো কারণ ছিল না যে, তারা সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। যিনি মহাপরাক্রমশালী এবং নিজের সত্তায় নিজেই প্রশংসিত।"

–সূরা আল বুরূজ ঃ ৮

فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا۝

"কিন্তু আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি অভাবমুক্ত ও সমস্ত প্রশংসার অধিকারী।"-সূরা আন নিসা ঃ ১৩১

"হামীদ" মানে হচ্ছে, তিনি নিজে নিজেই প্রশংসিত, কেউ তাঁর প্রশংসা (শোকর ও প্রশংসা) করুক বা না করুক প্রশংসা লাভ করার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। এ দুটি গুণকে একসাথে বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, নিছক 'গনী' তো এমন ব্যক্তিও হতে পারে যে নিজের ধনাঢ্যতা দ্বারা কারো সাহায্য বা উপকার করে না। এ অবস্থায় সে গনী অবশ্যই হবে কিন্তু হামীদ বা প্রশংসিত হবে না। 'হামীদ' সে হতে পারে এমন অবস্থায় যখন সে কারো সাহায্যে নিজে লাভবান হবে না কিন্তু নিজের ধন-সম্পদ থেকে অন্যদেরকে সব ধরনের সহায়তা দান করবে। আল্লাহ যেহেতু এ দুটি গুণের পূর্ণ আধার তাই বলা হয়েছে, তিনি নিছক 'গনী' নন বরং এমন 'গনী' যিনি সব রকমের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী। কারণ তিনি তোমাদের এবং বিশ্বজাহানের যাবতীয় জড় ও জীবের প্রয়োজন পূর্ণ করেন।[২৮৩]

○

বিশ্বজাহানের প্রতিটি অণু-কণিকা তাঁর পূর্ণতা ও সৌন্দর্য এবং তাঁর স্রষ্টা ও অন্নদাতা হবার সাক্ষ দিচ্ছে এবং প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তু নিজের সমগ্র সত্তা দিয়ে তাঁর প্রশংসা গেয়ে চলছে।[২৮৪]

○

আল মুহসী : اَلْمُحْصِىْ

অর্থ : প্রতিটি জিনিসকে যিনি গুণে গুণে রাখেন।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি তৎপরতা নিবন্ধিত হয়ে গেছে। কোন্ ব্যক্তি কখন, কোথায়, কি কাজ করেছে তা করার পর তার নিজের প্রতিক্রিয়া কি ছিল, আর অন্যত্র কোথায় কোথায় তার কি কি ফলাফল কি কি আকারে দেখা দিয়েছে, এ সবই সবিস্তারে তার রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[২৮৫]

○

সূরা জিনে বলা হয়েছে :

وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا ○ - الجن : ٨

"তিনি তাদের গোটা পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। আর তিনি প্রতিটি জিনিস গুণে গুণে হিসেব করে রেখেছেন।"–সূরা জিন : ২৮

যে বাণীসমূহ আল্লাহ পাঠান তার প্রতিটি বর্ণ গোণা ও হিসেব করা, তার একটি বর্ণের হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষমতাও রসূল বা ফেরেশতা কারো নেই।[২৮৬]

○

সূরা মারইয়ামে ইরশাদ হয়েছে :

اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلاَّ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝ لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ○ - مريم : ٩٣-٩٤

"পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যা কিছু আছে সবই তাঁর সামনে বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে। সবাইকে তিনি ঘিরে রেখেছেন এবং তিনি সবাইকে গণনা করে রেখেছেন।"–সূরা মারইয়াম : ৯৩-৯৪

সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَكُلَّ شَىْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِىْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ○ - يس : ١٢

"প্রত্যেকটি জিনিস আমি একটি খোলা কিতাবে লিখে রাখছি।"

মানুষের আমলনামা তিন ধরনের বিষয় সম্বলিত হবে। এক. প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু ভালো-মন্দ কাজ করে তা আল্লাহর দফতরে লিখে নেয়া হয়। দুই. নিজের চারপাশের বস্তুসমূহের এবং নিজের শরীরের অংগ-প্রত্যংগের ওপর মানুষ যে প্রভাব (Impressions) রাখে তা সবই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং এ সমস্ত চিহ্ন এক সময় এমনভাবে সামনে ভেসে উঠবে যে, তার নিজের আওয়াজ শোনা যাবে, তার নিজের চিন্তা, নিয়ত ও ইচ্ছা-সংকল্পসমূহের সমস্ত কথা তার মানসপটে লিখিত আকারে দৃষ্টিগোচর হবে এবং এক একটি ভাল ও মন্দ কাজ এবং তার সমস্ত নড়াচড়া ও আচরণের ছবি সামনে এসে উঠবে। তিন. মৃত্যুর পর নিজের ভবিষ্যত প্রজন্মের ওপর এবং নিজের সমাজ ও সমগ্র মানব জাতির ওপর নিজের ভালো ও মন্দ যেসব প্রভাব সে রেখে গেছে তা যতক্ষণ পর্যন্ত এবং যেখানে যেখানে সক্রিয় থাকবে তা সবই তার হিসেবে লেখা হতে থাকবে। নিজের সন্তানদেরকে সে ভালো মন্দ যা কিছু শিক্ষা দিয়েছে, নিজের সমাজ ক্ষেত্রে যা কিছু সুকৃতি বা দুষ্কৃতি ছড়িয়েছে এবং মানবতার পক্ষে যে ফুল বা কাঁটা গাছ বপন করে গেছে এসবের পূর্ণ রেকর্ড ততক্ষণ পর্যন্ত তৈরি করা হতে থাকবে যতক্ষণ তার বপন করা এসব চারা দুনিয়ায় ভালো-মন্দ ফল উৎপাদন করে যেতে থাকবে।[২৮৭]

○

সূরা আন নাবায় বলা হয়েছে ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ۝ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝ النبا : ٢٧-٢٩

"তারা কোনো হিসাব নিকাশের আশা করতো না। আমার আয়াত-গুলোকে তারা একেবারেই মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অথচ প্রত্যেকটি জিনিস আমি গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম।"

–সূরা আন নাবা ঃ ২৭-২৯

তাদের সমস্ত কথা ও কাজ, তাদের সব রকমের ওঠাবসা-চলাফেরা এমনকি তাদের চিন্তা, মনোভাব, সংকল্প ও উদ্দেশ্যাবলীর পূর্ণাংগ রেকর্ড আমি তৈরী করে রাখছিলাম। সেই রেকর্ড থেকে কোনো কিছুই বাদ যেতে পারেনি। অথচ সেই নির্বোধদের এ সবের কোনো খবর ছিল না। তারা নিজেদের জায়গায় বসে বসে মনে করছিল, তারা কোনো মগের মুল্লুকে বাস করছে, নিজেদের ইচ্ছে মতো তারা এখানে যাচ্ছেতাই করে যাবে এবং তাদের এসব স্বেচ্ছাচারের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।[২৮৮]

৭০

আল মুবদিয়ু : اَلْمُبْدِئُ

অর্থ : প্রাথমিক অস্তিত্ব দানকারী।

ব্যাখ্যা : সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে :

اِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ○- يونس : ٤

"নিসন্দেহে সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেন তারপর তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন।"–সূরা ইউনুস : ৪

সূরা আল বুরুজে বলা হয়েছে :

اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ○ - البروج : ١٣

"তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন আবার তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন।"–সূরা আল বুরুজ : ১৩

মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহই সর্বপ্রথম মানব জাতিকে সৃষ্টি করেন। মুশরিকরাও একথা অস্বীকার করে না। তারপর পরবর্তী কালের প্রত্যেকটি মানুষকেও তিনি অস্তিত্ব দান করেন। আর একথাটিও মুশরিকরা জানে। নারী গর্ভে শুক্রকে সংরক্ষণ, তারপর এ সামান্য হালকা গর্ভটি লালন করে তাকে একটি জীবন্ত মানব শিশুতে পরিণত করা, এরপর সেই শিশুটির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শক্তি ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে তাকে একটি সুস্থ ও পরিপূর্ণ অবয়বের অধিকারী মানুষ হিসেবে দুনিয়ার বুকে ভূমিষ্ঠ করা—এসব কিছু আল্লাহর ইচ্ছাধীন।[২৮৯]

○

যখন তোমাদের জীবনের সূচনার প্রান্তভাগ আল্লাহর হাতে এবং শেষের প্রান্তভাগও তাঁরই হাতে। তখন নিজেদের কল্যাণকামী হয়ে একবার ভেবে দেখো, তোমাদের কিভাবে একথা বুঝানো হচ্ছে যে, এ দুই প্রান্তের মাঝখানে আল্লাহ ছাড়া অন্যজন তোমাদের বন্দেগী ও নযরানা লাভের অধিকার লাভ করেছে ?[২৯০]

○

সূরা আন্‌ নামলে বলা হয়েছে ঃ

اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ـ النمل : ٦٤

"আর তিনি কে যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তারপর আবার এর পুনরাবৃত্তি করেন ?"–সূরা আন নামল ঃ ৬৪

একটি সহজ সরল কথা। একটি বাক্যে কথাটি বলে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে এতবেশী খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে যে, মানুষ এর যত গভীরে নেমে যেতে থাকে ততই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও আল্লাহ্‌র একত্বের প্রমাণ সে লাভ করে যেতে থাকে। প্রথমে সৃষ্টি কর্মটিই দেখা যাক। জীবনের উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কেমন করে হয়, মানুষের জ্ঞান আজো এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। নির্জীব বস্তুর নিছক রাসায়নিক মিশ্রণের ফলে প্রাণের স্বতস্ফূর্ত উন্মেষ ঘটতে পারে না, এ পর্যন্ত এটিই সর্বস্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রাণ সৃষ্টির জন্য যতগুলো উপাদানের প্রয়োজন সে সবগুলো যথাযথ আনুপাতিক হারে একেবারে আকস্মিকভাবে একত্র হয়ে গিয়ে আপনা আপনি জীবনের উন্মেষ ঘটে যাওয়া অবশ্যই নাস্তিক্যবাদীদের একটি অবৈজ্ঞানিক কল্পনা। কিন্তু যদি অংকশাস্ত্রের আকস্মিক ঘটনার নিয়ম (Law of chance) এর ওপর প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায় নেমে যায়। এ পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতিতে বিজ্ঞান গবেষণাগারসমূহে (Laboratories) নিষ্প্রাণ বস্তু থেকে প্রাণবান বস্তু সৃষ্টি করার যতগুলো প্রচেষ্টাই চলেছে, সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের পরও তা সবই চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে। বড় জোর যা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে তা হচ্ছে কেবলমাত্র এমন বস্তু যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় D. N. A. বলা হয়। এটি এমন বস্তু যা জীবিত কোষসমূহে পাওয়া যায়। এটি অবশ্যই জীবনের উপাদান কিন্তু নিজে জীবন্ত নয়। জীবন আজো একটি অলৌকিক ব্যাপার। এটি একজন স্রষ্টার হুকুম, ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ফল, এছাড়া এর আর কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না।

এরপর সামনের দিকে দেখা যাক। জীবন নিছক একটি একক অমিশ্রিত অবস্থায় নেই বরং অসংখ্য বিচিত্র আকৃতিতে তাকে পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাণীর মধ্যে প্রায় দশ লাখ এবং উদ্ভিদের মধ্যে প্রায় দু'লাখ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ লাখো লাখো প্রজাতি নিজেদের আকার-আকৃতি ও শ্রেণী বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পরস্পর থেকে এত সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত পার্থক্যের অধিকারী এবং জানা ইতিহাসের প্রাচীনতম যুগ থেকে

তারা নিজেদের পৃথক শ্রেণী আকৃতিকে অনবরত এমনভাবে অক্ষুণ্ণ রেখে আসছে যার ফলে এক আল্লাহর সৃষ্টি পরিকল্পনা (Design) ছাড়া জীবনের এ মহা বৈচিত্রের অন্য কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা করা কোনো ডারউইনের পক্ষেই সম্ভব নয়। আজ পর্যন্ত কোথাও দুটি প্রজাতির মাঝখানে এমন এক শ্রেণীর জীবন পাওয়া যায়নি যারা এক প্রজাতির কাঠামো, আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ভেদ করে বের হয়ে এসেছে এবং এখনো অন্য প্রজাতির কাঠামো, আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত পৌছুবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কংকালের (Fossils) সমগ্র বিবরণীতে এ পর্যন্ত এর কোনো নজির পাওয়া যায়নি এবং বর্তমান প্রাণী জগতে কোথাও এ ধরনের 'হিজড়া' শ্রেণী পাওয়া কঠিন। আজ পর্যন্ত সর্বত্রই সকল প্রজাতির সদস্যকেই তার পূর্ণ শ্রেণী সম্পর্কে যেসব কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়, কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়ে তার অসারতা ফাঁস করে দেয়। বর্তমানে এটি একটি অকাট্য সত্য যে, একজন সুবিজ্ঞ কারিগর, একজন সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা ও চিত্রকরই জীবনকে এত সব বৈচিত্রময় রূপদান করেছেন।[২৯১]

○

৭১

আল মু'য়ীদু : اَلْمُعِيْدُ

অর্থ : পুনরুজ্জীবনকারী, পুন সৃজনকারী।

ব্যাখ্যা : সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে :

اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ - يونس : ٤

"নিসন্দেহে সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেন, তারপর তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন।"–সূরা ইউনুস : ৪

আল্লাহ্ মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। সৃষ্টির এ পুনরাবর্তন বুদ্ধি ও ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে অপরিহার্য। আর এ অপরিহার্য প্রয়োজন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোনো পথেই পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহকে নিজের একমাত্র রব হিসেবে মেনে নিয়ে যারা সঠিক বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করবে তারা নিজেদের এ যথার্থ কার্যধারার পূর্ণ প্রতিদান লাভ করার অধিকার রাখে। অন্যদিকে যারা সত্য অস্বীকার করে তার বিরোধী অবস্থানে জীবন যাপন করবে তারাও নিজেদের এ ভ্রান্ত কার্যধারার কুফল প্রত্যক্ষ করবে। এ প্রয়োজন যদি বর্তমান পার্থিব জীবনে পূর্ণ না হয় (এবং যারা হঠকারী নন তারা প্রত্যেকেই জানেন, এ প্রয়োজন পূর্ণ হচ্ছে না) তাহলে অবশ্যি এটা পূর্ণ করার জন্য পুনরুজ্জীবন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[২৯২]

○

এ বিশ্বজাহানের চারদিকে মহান আল্লাহর যেসব কীর্তি দেখা যাচ্ছে, যার বড় বড় নিদর্শন সূর্য, চন্দ্র, দিন ও রাত্রির আবর্তনের আকারে মানুষের সামনে রয়েছে, এগুলো থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোনো একটা ছোট্ট শিশু এ সৃষ্টি জগতের বিশাল কারখানার স্রষ্টা নয়। সে কোনো শিশুর মত নিছক খেলা করার জন্য এসব কিছু তৈরী করেনি আবার খেলা করে মন ভরে যাওয়ার পর এসব কিছু ভেঙেচুরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তাঁর সব কাজে রয়েছে শৃংখলা, বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য ও কলাকৌশল। প্রতিটি অণুপরমাণু সৃষ্টির পেছনে পাওয়া যায় একটি লক্ষ্যাভিসারী উদ্যোগ। কাজেই তিনি যখন মহাজ্ঞানী এবং তাঁর জ্ঞানের লক্ষণ ও আলামতগুলো তোমাদের সামনে প্রকাশ্যে মওজুদ

রয়েছে, তখন তোমরা তাঁর থেকে কেমন করে আশা করতে পারো যে, তিনি মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক অনুভূতি এবং স্বাধীন দায়িত্ব ও এসব কিছু ব্যবহারের ক্ষমতা দান করার পর তার জীবনের কার্যক্রমের হিসেব কখনো নেবেন না এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক দায়িত্বের কারণে পুরস্কার ও শাস্তি লাভের যে যোগ্যতা অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয়ে যায় তাকে অনর্থক এমনিই ছেড়ে দেবেন ?

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, দ্বিতীয় জীবন অর্থাৎ পরকালীন জীবন সম্ভব। কারণ, প্রথম অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের সম্ভাবনা জাজ্বল্যমান ঘটনার আকারে বিরাজমান।

এছাড়া পরকালীন জীবনের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, বর্তমান জীবনে মানুষ নিজের নৈতিক দায়িত্ব সঠিক বা বেঠিক যেভাবে পালন করে এবং তা থেকে পুরস্কার ও শাস্তিলাভের যে অবশ্যম্ভাবী যোগ্যতা সৃষ্টি হয় তার ভিত্তিতে বুদ্ধি ও ইনসাফ আর একটি জীবনের দাবী করে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নৈতিক কার্যক্রমের উপযুক্ত ফল প্রত্যক্ষ করবে।

বুদ্ধি ও ইনসাফের দৃষ্টিতে যখন পরকালীন জীবনের প্রয়োজন তখন এ প্রয়োজন অবশ্যি পূর্ণ করা হবে। কারণ, মানুষ ও বিশ্বজাহানের স্রষ্টা হচ্ছেন মহাজ্ঞানী। আর মহাজ্ঞানীর কাছে আশা করা যেতে পারে না যে, জ্ঞান ও ইনসাফ যা দাবী করে তিনি তা কার্যকর করবেন না।[২৯৩]

○

সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে মুশরিকরাও স্বীকার করতো যে, এটা একমাত্র আল্লাহরই কাজ। তাঁর সাথে যাদেরকে তারা শরীক করে তাদের কারো এ কাজে কোনো অংশ নেই। আর সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ প্রথমে যিনি সৃষ্টি করেন তাঁর পক্ষেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু যে প্রথমবারই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি সে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারে কেমন করে ? এটি যদিও একটি অকাট্য যুক্তিসংগত কথা এবং মুশরিকদের মনও ভেতর থেকে এর সত্যতার সাক্ষ্য দিতো তবুও তারা শুধুমাত্র এ কারণে একথা স্বীকার করতে ইতস্তত করতো যে, এটা মেনে নিলে পরকাল অস্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণেই পূর্ববর্তী প্রশ্নের জবাবে তো আল্লাহ্ বললেন যে, তারা নিজেরাই বলবে যে, এটা আল্লাহর কাজ। কিন্তু এখানে এর পরিবর্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হচ্ছে, তুমি জোরালো কণ্ঠে বলে দাও—প্রথমবারের সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি সবই একমাত্র আল্লাহর কাজ।[২৯৪]

○

এবার সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির কথাটা একবার চিন্তা করা যাক। সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠনাকৃতি ও গঠন প্রণালীর মধ্যে এমন বিস্ময়কর কর্মপদ্ধতি (Mechanism) রেখে দিয়েছেন যা তার অসংখ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে ঠিক একই শ্রেণীর আকৃতি, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হাজারো প্রজন্মের জন্ম দিয়ে যেতে থাকে। কখনো মিছামিছিও এ কোটি কোটি ছোট ছোট কারখানায় এ ধরনের ভুলচুক হয় না, যার ফলে একটি প্রজাতির কোনো বংশবৃদ্ধি কারখানায় অন্য প্রজাতির কোনো নমুনা উৎপাদন করতে থাকে। আধুনিক বংশ তত্ত্ব (Genetics) পর্যবেক্ষণ এ ব্যাপারে বিস্ময়কর সত্য উদ্‌ঘাটন করে। প্রত্যেকটি চারাগাছের মধ্যে এমন যোগ্যতা রাখা হয়েছে যার ফলে সে তার নিজের প্রজন্মকে পরবর্তী বংশধরদের পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এমন পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করে যাতে পরবর্তী বংশধররা তার যাবতীয় প্রজাতির বৈশিষ্ট্য, আচরণ ও গুণের অধিকারী হয় এবং তার প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তাই অন্যান্য সকল প্রজাতির ব্যক্তিবর্গ থেকে শ্রেণীগত বিশিষ্টতা অর্জন করে। এ প্রজাতি ও প্রজন্ম রক্ষার সরঞ্জাম প্রত্যেকটি চারার প্রতিটি কোষের (Cell) একটি অংশে সংরক্ষিত থাকে। অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একে দেখা যেতে পারে। এ ক্ষুদ্র প্রকৌশলীটি পূর্ণ সুস্থতা সহকারে চারার সার্বিক বিকাশকে চূড়ান্তভাবে তার শ্রেণীগত আকৃতির স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করে। এরি বদৌলতে একটি গম বীজ থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে যেখানেই যত গমের চারা উৎপন্ন হয়েছে তা সব গমই উৎপাদন করেছে। কোনো আবহাওয়ায় এবং কোনো পরিবেশে কখনো ঘটনাক্রমে একটি গম বীজের বংশ থেকে একটি যব উৎপন্ন হয়নি। মানুষ ও পশুর ব্যাপারেও এ একই কথা। অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে কারো সৃষ্টিই একবার হয়েই থেমে যায়নি। বরং কল্পনাতীত ব্যাপকতা নিয়ে সর্বত্র সৃষ্টির পুনরাবর্তনের একটি বিশাল কারখানা সক্রিয় রয়েছে। এ কারখানা অনরবত প্রতিটি শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে একই শ্রেণীর অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ উৎপাদন করে চলছে। যদি কোনো ব্যক্তি সন্তান উৎপাদন ও বংশ বিস্তারের এ অণুবীক্ষণীয় বীজটি দেখে, যা সকল প্রকার শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুণাবলীকে নিজের ক্ষুদ্রতম অস্তিত্বেরও নিছক একটি অংশে ধারণ করে থাকে এবং তারপর দেখে অংগ প্রত্যংগের এমন একটি চরম নাজুক ও জটিল ব্যবস্থা এবং চরম সূক্ষ্ম ও জটিল কর্মধারা (Progresses), যার সাহায্যে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তির বংশধারার বীজ একই শ্রেণীর নবতর ব্যক্তিকে উৎপন্ন করে,

তাহলে একথা সে এক মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করতে পারে না যে, এমন নাজুক ও জটিল কর্মব্যবস্থা কখনো আপনা আপনি গড়ে উঠতে পারে, এবং তারপর বিভিন্ন শ্রেণীর শত শত কোটি ব্যক্তির মধ্যে তা আপনা আপনি যথাযথভাবে চালুও থাকতে পারে। এ জিনিসটি কেবল নিজের সূচনার জন্যই একজন বিজ্ঞ স্রষ্টা চায় না বরং প্রতি মুহূর্তে নিজের সঠিক ও নির্ভুল পথে চলতে থাকার জন্যও একজন পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সত্তার প্রত্যাশী হয়, যিনি এক মুহূর্তের জন্যও এ কারখানাগুলোর দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিক পথে পরিচালনা থেকে গাফিল থাকবেন না।

এ সত্যগুলো যেমন একজন নাস্তিকের আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রবণতার মূলোচ্ছেদ করে তেমনি একজন মুশরিকের শিরককেও সমূলে উৎপাটিত করে দেয়। এমন কোনো নির্বোধ আছে কি যে একথা ধারণা করতে পারে যে, আল্লাহর বিশ্ব পরিচালনার এ কাজে কোনো ফেরেশতা, জিন, নবী বা অলী সামান্যতমও অংশীদার হতে পারে ? আর কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিদ্বেষ ও স্বার্থশূন্য মনে একথা বলতে পারে যে, এ সমগ্র সৃষ্টি কারখানা ও সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি এ ধরনের বিজ্ঞতা ও নিয়ম-শৃংখলা সহকারে ঘটনাক্রমেই শুরু হয় এবং আপনা আপনিই চলছে ?[২৯৫]

○

সূরা আল আম্বিয়ার ১০৪ আয়াতেও এর সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে ঃ

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط كَمَا بَدَانَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ ط

وَعْدًا عَلَيْنَا ط اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○ الانبياء : ١٠٤

"সেদিন যখন আমি আকাশকে এমনভাবে গুটিয়ে ফেলবো যেমন বাণ্ডিলের মধ্যে গুটিয়ে রাখা হয় লিখিত কাগজ, যেভাবে আমি প্রথমে সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে আবার তার পুনরাবৃত্তি করবো, এ একটি প্রতিশ্রুতি, যা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং একাজ আমাকে অবশ্যই করতে হবে।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৪

সূরা আল আনকাবূতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ

الْاٰخِرَةَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ - العنكبوت : ٢٠

"এদেরকে বলো, পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করো এবং দেখো তিনি কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর আল্লাহ্ দ্বিতীয়বারও জীবন দান করবেন। অবশ্যই আল্লাহ্ সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।"

–সূরা আল আনকাবুত ঃ ২০

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ۔

"এরা কি কখনো লক্ষ্য করেনি আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন তারপর তার পুনরাবৃত্তি করেন ? নিশ্চয়ই এ (পুনরাবৃত্তি) আল্লাহ্র জন্য সহজতর।"–সূরা আল আনকাবুত ঃ ১৯

একদিকে অসংখ্য বস্তু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করে এবং অন্যদিকে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের বিলুপ্তির সাথে সাথে আবার নতুন ব্যক্তিবর্গ অস্তিত্ব লাভ করতে থাকে। মুশরিকরা এসব কিছুকে আল্লাহ্র সৃষ্টি ও উদ্ভাবন গুণের ফল বলে মানতো। আজকের যুগের মুশরিকরা যেমন আল্লাহ্র স্রষ্টা হবার কথা অস্বীকার করে না তেমনি তারাও একথা অস্বীকার করতো না। তাই তাদের স্বীকৃত কথার ওপর এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, তোমাদের দৃষ্টিতে যে আল্লাহ্ বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেন এবং তারপর মাত্র একবার সৃষ্টি করে শেষ করেন না এবং তোমাদের চোখের সামনে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জিনিসগুলোর জায়গায় আবার একই জিনিস অনবরত সৃষ্টি করে চলেন, তাঁর সম্পর্কে তোমরা কেমন করে একথা ভাবতে পারলে যে, তোমাদের মরে যাবার পর তিনি আর পুনর্বার তোমাদের জীবিত করে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন না ? –আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আন্ নাম্ল, ৮০ টীকা।

যখন আল্লাহ্র শিল্প নৈপুণ্যের বদৌলতে প্রথমবারের সৃষ্টি তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছো তখন তোমাদের বুঝা উচিত, একই আল্লাহ্র শিল্পকারিতার মাধ্যমে দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি হবে। এ ধরনের কাজ করা তাঁর ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত নয় এবং আওতা বহির্ভূত হতেও পারে না।[২৯৬]

○

সুস্পষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি একথার সাক্ষ্য দিয়ে থাকে যে, সৃষ্টির সূচনা করা যার পক্ষে সম্ভবপর তার পক্ষে একই সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করা আরো ভালোভাবেই সম্ভবপর। সৃষ্টির সূচনা তো একটি বাস্তব সত্য, বিষয়টি সবার সামনেই রয়েছে। কাফের ও মুশরিকরাও এটাকে আল্লাহ্র কাজ বলে স্বীকার করে। এরপর যে আল্লাহ্ এ সৃষ্টির সূচনা করেন তিনি এর পুনরাবৃত্তি করতে পারেন না, তাদের এ চিন্তা একেবারেই অর্থহীন ও অযৌক্তিক।[২৯৭]

প্রথমবার সৃষ্টি করাটা যদি তাঁর জন্য কঠিন না হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা কেমন করে ধারণা করতে পারলে যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য কঠিন হবে ? প্রথমবারের সৃষ্টির মধ্যে তো তোমরা সশরীরেই উপস্থিত আছো। তাই এটা যে কঠিন নয় তা তো সুস্পষ্ট। এখন এটি একটি সহজ বুদ্ধির ব্যাপার যে, একবার যিনি কোনো একটি জিনিস তৈরি করেন সে জিনিসটি পুনর্বার তৈরি করা তার জন্য তুলনামূলকভাবে আরো অনেক বেশী সহজ হওয়ার কথা।[২৯৮]

○

সূরা আর রূমের ২৭ আয়াতেও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ط - الروم : ٢٧

"তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই আবার তার পুনরাবর্তন করবেন এবং এটি তাঁর জন্য সহজতর।"-সূরা আর রূম ঃ ২৭

৭২
আল মুহয়ী : اَلْمُحْيِ

অর্থ : জীবনদাতা।

ব্যাখ্যা : সূরা আর রূমে বলা হয়েছে :

اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ الروم : ٥٠

"অবশ্যই তিনি মৃতদেরকে জীবন দান করেন এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর শক্তিশালী।"–সূরা আর রূম : ৫০

সূরা আল হাজ্জে বলা হয়েছে :

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى ...... - الحج : ٦

"এসব কিছু এজন্য যে, আল্লাহ সত্য, তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন...............।"–সূরা আল হাজ্জ : ৬

"আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করেন", "আল্লাহ কখনো মৃতদেরকে জীবিত করবেন", একথা শুনে লোকেরা অবাক হয়ে যায়। কিন্তু তারা চোখ মেলে তাকালে দেখতে পাবে তিনি তো প্রতি মুহূর্তে মৃতকে জীবিত করছেন। যেসব উপাদান থেকে মানুষের শরীর গঠিত হয়েছে এবং যেসব খাদ্যে সে প্রতিপালিত হচ্ছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে রয়েছে কয়লা, লোহা, চুন, কিছু লবণজাত উপাদান ও কিছু বায়ু এবং এ ধরনের আরো কিছু জিনিস। এর মধ্যে কোনো জিনিসেই জীবন ও মানবাত্মার বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এসব মৃত, নির্জীব উপাদানগুলোই একত্র করে তাকে একটি জীবিত ও প্রাণময় আস্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। তারপর এসব উপাদান সম্বলিত খাদ্য মানুষের দেহে পরিবেশিত হয় এবং সেখানে এর সাহায্যে পুরুষের মধ্যে এমন শুক্রকীট এবং নারীর মধ্যে এমন ডিম্বকোষের সৃষ্টি হয়, যাদের মিলনের ফলে প্রতিদিন জীবন্ত ও প্রাণময় মানুষ তৈরি হয়ে বের হয়ে আসছে। এরপর নিজের আশপাশের মাটির ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নিন। পাখি ও বায়ু অসংখ্য জিনিসের বীজ চারদিকে ছড়িয়ে রেখেছিল এবং অসংখ্য জিনিসের মূল এখানে সেখানে মাটির সাথে মিশে পড়েছিল। তাদের কারো মধ্যেও উদ্ভিদ জীবনের সামান্যতম লক্ষণও ছিল না। মানুষের চারপাশের বিশুষ্ক জমি ও লাখো লাখো মৃতের কবরে পরিণত

হয়েছিল। কিন্তু যখনই এদের ওপর পড়লো পানির একটি ফোঁটা, অমনি চারদিকে জেগে উঠলো জীবনের বিপুল সমারোহ। প্রত্যেকটি মৃত বৃক্ষমূল তার কবর থেকে মাথা উচুঁ করলো এবং প্রত্যেকটি নিস্প্রাণ বীজ একটি জীবন্ত চারাগাছের রূপ ধারণ করলো। এ মৃতকে জীবিত করার মহড়া প্রত্যেক বর্ষা ঋতুতে মানুষের চোখের সামনে প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।[২৯৯]

○

প্রতি বছর তোমাদের চোখের সামনে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে, পৃথিবী একটি নিরস বিশুষ্ক প্রান্তরের মত পড়ে আছে। এখানে জীবনের স্পন্দন নেই। ঘাস-লতা-গুল্ম-ফুল-পাতা-সবুজের চিহ্নই নেই। নেই কোনো ধরনের পোকা মাকড়ের অস্তিত্ব। এ সময় এসে গেলো বর্ষার মওসুম। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি আকাশ থেকে নেমে আসতেই এ মরা যমীনের বুক চিরে জীবনের তরংগ জেগে উঠতে থাকে। যমীনের বিভিন্ন স্তরে জমে থাকা অসংখ্য বীজ সহসাই জেগে ওঠে। তাদের প্রত্যেকের মধ্য থেকে গত বর্ষায় জন্মলাভ করার পর মরে যাওয়া উদ্ভিদগুলো আবার মাথাচাড়া দেয়। গরমের মওসুমে নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গিয়েছিল এমন সব অগণিত মৃত্তিকার কীট অকস্মাত আবার দেখা যায়, যেমন বিগত বর্ষায় দেখা গিয়েছিল। নিজেদের জীবনে তোমরা এসব বারবার দেখতে থাকো। এরপরও নবীর মুখ থেকে একথা শুনে অবাক হয়ে যাও যে, আল্লাহ মৃত্যুর পর সমস্ত মানুষকে পুনরবার জীবিত করবেন। এ অবাক হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, তোমাদের পর্যবেক্ষণ বুদ্ধি-জ্ঞানহীন পশুদের পর্যবেক্ষণের মতই।[৩০০]

○

এ মূর্খের দল আখেরাতকে অসম্ভব মনে করছে। তাই তারা নিজ স্বভাবে এ চিন্তায় নিমগ্ন হয়েছে যে, দুনিয়ায় তারা যাই কিছু করতে থাকুক না কেন, তাদের জবাবদিহি করার জন্য আল্লাহর সামনে হাজির হবার সময়টি কখনো আসবে না। কিন্তু তারা যার মধ্যে নিমগ্ন আছে সেটি নিছক একটি খামখেয়ালি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিয়ামতের দিন সামনের পেছনের সমস্ত মরা মানুষ মহান আল্লাহর একটিমাত্র ইশারায় সহসা ঠিক তেমনিভাবে জীবিত হয়ে উঠবে যেমন একবার বৃষ্টি হবার পর শুকনো জমি অকস্মাত সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে এবং দীর্ঘকালের মৃত শিকড়গুলো সবুজ চারাগাছে রূপান্তরিত হয়ে মাটির বুক থেকে মাথা উঁচু করতে থাকে।[৩০১]

○

যে আল্লাহ প্রতি মুহূর্তে তোমাদের সামনে এ কাজ করছেন তিনি মানুষের মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে অক্ষম হতে পারেন কেমন করে ? তিনি সবসময় জীবিত মানুষ ও জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে থেকে বর্জ্য পদার্থ (Waste Matter) বের করছেন যেগুলোর মধ্যে জীবনের সামান্যতম গন্ধও নেই। তিনি প্রতি মুহূর্তে নিষ্প্রাণ বস্তুর (Dead Matter) মধ্যে জীবন সঞ্চার করে অসংখ্য পশু উদ্ভিদ ও মানুষ সৃষ্টি করে চলছেন। অথচ যেসব উপাদান থেকে এ জীবন্ত সত্তাগুলোর শরীর গঠিত হচ্ছে তাদের মধ্যে সামান্যতমও জীবনের চিহ্ন নেই। তিনি প্রতি মুহূর্তে তোমাদের এ দৃশ্য দেখিয়ে চলছেন যে, অনুর্বর, অনুন্নত, অনাবাদি পতিত জমিতে বৃষ্টির পানি পড়ার সাথে সাথেই সহসা সেখানে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের বিপুল সমারোহ দেখা যায়। এসব কিছু দেখার পরও যদি কোনো ব্যক্তি মনে করে সৃষ্টির এ কারখানা পরিচালনাকারী আল্লাহ মানুষের মৃত্যুর পর তাকে পুনরায় জীবিত করতে অক্ষম, তাহলে আসলে তার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তার বাইরের চোখ দুটি যে বাহ্যিক দৃশ্যাবলী দেখে থাকে, তার বুদ্ধির চোখ তার মধ্যে দৃশ্যমান উজ্জ্বল সত্য দেখতে পায় না।[৩০২]

৭৩

আল মুমীতু : اَلْمُمِيْتُ

অর্থ : প্রাণ সংহারক, মৃত্যুদাতা।

ব্যাখ্যা : আল কুরআনে বলা হয়েছে :

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ج ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ البقرة : ٢٨

"তোমরা আল্লাহর সাথে কেমন করে কুফরী আচরণ করতে পারো। অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন, তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"

–সূরা আল বাকারা : ২৮

وَهُوَ الَّذِىْ يُحْيِ وَيُمِيْتُ ـ المؤمنون : ٨٠

"তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন।"

–সূরা মু'মিনূন : ৮০

وَهُوَ الَّذِىْ اَحْيَاكُمْ ز ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ○

"তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু দান করেন এবং তিনিই আবার তোমাদের জীবিত করবেন, সত্য বলতে কি, মানুষ বড়ই সত্য অস্বীকারকারী।"–সূরা আল হাজ্জ : ৬৬

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ـ الروم : ٤٠

"আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিযিক দিয়েছেন। তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন, এরপর তিনি তোমাদের জীবিত করবেন।"–সূরা আর রূম : ৪০

রিযিক, জীবন ও মৃত্যু তাঁর ক্ষমতার আওতাভুক্ত। মরার পর পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা তিনিই রাখেন।[৩০৩]

○

মৃত্যুর ভয়ে তোমাদের পালিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ নেই। মৃত্যুর জন্য আল্লাহ যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার আগে কেউ মরতে পারে না এবং তার পরেও কেউ জীবিত থাকতে পারে না।[৩০৪]

মানুষ কেবল তার সৃষ্টি ও তকদীরের ব্যাপারেই নয়, মৃত্যুর ব্যাপারেও তার স্রষ্টার কাছে একেবারেই অসহায়। নিজের ইচ্ছায় সে সৃষ্টি হতে পারে না। নিজের ইচ্ছায় মরতেও পারে না। নিজের মৃত্যুকে এক মুহূর্তকালের জন্য পিছিয়ে দেবার ক্ষমতাও তার নেই। যে সময় যেখানে যে অবস্থায়ই তার মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করে দেয়া হয়েছে ঠিক সেই সময় সেই জায়গায় সেই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। আর মৃত্যুর পর তার জন্য যে ধরনের কবর নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে ঠিক সেই ধরনের কবরেই সে স্থান লাভ করে। তার এ কবর মৃত্তিকা গর্ভে, সীমাহীন সাগরের গভীরতায়, অগ্নিকুণ্ডের বুকে বা কোনো হিংস্র পশুর পাকস্থলীতে যে কোনো জায়গায় হতে পারে। মানুষের তো কোনো কথাই নেই, সারা দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টি মিলে চেষ্টা করলেও কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে স্রষ্টার এ সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে না।[৩০৫]

○

সূরা আল জাসিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ ـ

"(হে নবী) এদের বলো, আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেন এবং তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান। তিনিই আবার সেই কিয়ামতের দিন তোমাদের একত্রিত করবেন যার আগমনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।"–সূরা আল জাসিয়া ঃ ২৬

وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ـ الجاثية : ٢٤

"এরা বলে, জীবন বলতে তো শুধু আমাদের দুনিয়ার এ জীবনই। আমাদের জীবন ও মৃত্যু এখানেই এবং কালের বিবর্তন ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে এদের কোনো জ্ঞান নেই।"–সূরা আল জাসিয়া ঃ ২৪

অর্থাৎ জ্ঞানের এমন কোনো মাধ্যমই নেই যার সাহায্যে তারা জেনে নিতে পারে, এ জীবনের পরে মানুষের আর কোনো জীবন নেই। তাছাড়া একথা জানারও কোনো মাধ্যম নেই যে, কোনো খোদার নির্দেশে মানুষের রূহ কবয করা হয় না, বরং শুধু কালের প্রবাহ ও বিবর্তনে মানুষ মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আখেরাত অবিশ্বাসীরা জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়, শুধু

ধারণার ভিত্তিতে এসব কথা বলে থাকে। যদি তারা জ্ঞানের ভিত্তিতে কথা বলে তাহলে বড় জোর বলতে পারে যে, "মৃত্যুর পরে কোনো জীবন আছে কিনা তা আমরা জানি না।" কিন্তু একথা কখনো বলতে পারে না যে, "আমরা জানি, এ জীবনের পরে আর কোনো জীবন নেই।" অনুরূপ জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে তারা একথা জানার দাবি করতে পারে না যে, মানুষের রূহ আল্লাহর হুকুমে বের করে নেয়া হয় না বরং একটি ঘড়ি যেমন চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যায় তেমনি তা মরে নিঃশেষ হয়ে যায়। তারা বড় জোর যা কিছু বলতে পারে তা শুধু এই যে, এ দুটির মধ্যে কোনোটি সম্পর্কেই আমরা জানি না, প্রকৃতই কি ঘটে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের জ্ঞানের সীমা পর্যন্ত মৃত্যুর পরের জীবন হওয়া না হওয়া এবং রূহ কবয হওয়া অথবা কালের প্রবাহে আপনা থেকেই মরে যাওয়ার সমান সম্ভাবনা যখন বিদ্যমান তখন এসব লোক আখেরাতের সম্ভাবনার দিকটি বাদ দিয়ে আখেরাত অস্বীকৃতির পক্ষে যে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করছে তার কারণ তাহলে কি ? প্রকৃতপক্ষে তারা এ বিষয়টির চূড়ান্ত সমাধান যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে করে না বরং নিজেদের কামনা-বাসনার নিরিখে করে থাকে। এ ছাড়া কি এর আর কোনো কারণ থাকতে পারে ? যেহেতু তারা মৃত্যুর পরে আর কোনো জীবন চায় না এবং মৃত্যু সত্যিকার অর্থে অস্তিত্বহীনতা বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া না হয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ কবয করা হোক এটাও তারা চায় না, তাই নিজেদের মনের চাহিদা অনুসারে তারা আকীদা-বিশ্বাস গড়ে নেয় এবং এর বিপরীত জিনিসটি অস্বীকার করে বসে। যদিও তারা আকস্মিকভাবে জীবন লাভও করে না, আপনা থেকেই তাদের মৃত্যুও সংঘটিত হয় না। একজন আল্লাহ আছেন, যিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই তা কেড়ে নেন।[৩০৬]

○

মৃত্যু এমনভাবে আসে না যেমন নাকি একটি ঘড়ি চলতে চলতে হঠাৎ দম শেষ হয়ে যাবার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বরং এ কাজের জন্য আসলে আল্লাহ্ একজন বিশিষ্ট ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। তিনি এসে যথারীতি রূহকে ঠিক তেমনিভাবে গ্রহণ করেন যেমন একজন সরকারী আমীন (Official Receiver) কোনো জিনিস নিজের কব্জায় নিয়ে নেয়। কুরআনের অন্যান্য স্থানে এর আরো যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায়, মৃত্যু বিভাগীয় এ অফিসারের অধীনে পুরোপুরি একটি আমলা বাহিনী রয়েছে। তারা মৃতু দান করা, রূহকে দেহ থেকে বের করে আনা এবং তাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেবার বহুতর

দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া এ আমলারা অপরাধী রূহ ও সৎ মু'মিন রূহদের সাথে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করেন।

এ থেকে একথাও জানা যায় যে, মৃত্যুর ফলে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় না। বরং তার রূহ দেহ থেকে বের হয়ে সঞ্জীবিত থাকে। কুরআনের "মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদেরকে পুরোপুরি তার কব্জায় নিয়ে নেবে" শব্দগুলো এ সত্যটি প্রকাশ করে। কারণ কোনো বিলুপ্ত জিনিসকে কব্জায় নেয়া বা নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয় না। কব্জায় বা অধিকারে নিয়ে নেবার অর্থই হচ্ছে অধিকৃত জিনিস অধিকারকারীর কাছে রয়েছে।

এ থেকে এও জানা যায় যে, মৃত্যুকালে যে জিনিসটি অধিকারে নিয়ে নেয়া হয় তা মানুষের জৈবিক জীবন (Biological life) নয় বরং তার সেই অহম (Ego) যাকে 'আমরা' ও 'তুমি' 'তোমরা' শব্দাবলীর সাহায্যে চিত্রিত করা হয়। এ অহম দুনিয়ার কাজ করে যে ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয় তার সবটুকুই পুরোপুরি (Intact) বের করে নেয়া হয়। এমনভাবে বের করে নেয়া হয় যার ফলে তার গুণাবলীতে কোনো প্রকার কমবেশী দেখা যায় না। মৃত্যুর পরে এ জিনিসই তার রবের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। একেই পরকালে নবজন্ম ও নতুন দেহ দান করা হবে। এরি বিরুদ্ধে 'মোকদ্দমা' চালানো হবে। এর কাছ থেকেই হিসেব নেয়া হবে এবং একেই পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে।[৩০৭]

○

(৭৪)

আল হাইয়্যু : اَلْحَىُّ

অর্থ : চিরঞ্জীব, স্বয়ম্ভু।

ব্যাখ্যা : আল কুরআনে বলা হয়েছে :

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ج لاَتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ ط ـ

"আল্লাহ এমন এক চিরঞ্জীব ও চিরন্তন সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্বজাহানের দায়িত্বভার বহন করছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না।"–সূরা বাকারা : ২৫৫

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ○ ال عمران : ٢

"আল্লাহ এক চিরঞ্জীব ও শাশ্বত সত্তা, যিনি বিশ্বজাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে ধারণ করে আছেন, আসলে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"–সূরা আলে ইমরান : ২

هُوَ الْحَىُّ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط ـ المؤمن : ٦٥

"তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তোমাদের আনুগত্য তাঁর জন্য নিবেদিত করে তাঁকেই ডাকো।"

–সূরা মু'মিন : ৬৫

তাঁর জীবনই বাস্তব ও প্রকৃত জীবন। একমাত্র তিনিই আপন ক্ষমতায় জীবিত। তাঁর জীবন ছাড়া আর কারো জীবনই অনাদি ও চিরস্থায়ী নয়। আর সবার জীবনই আল্লাহ প্রদত্ত, মরণশীল ও ধ্বংসশীল।[৩০৮]

○

মূর্খরা নিজেদের কল্পনা ও ভাববাদিতার জগতে বসে যত অসংখ্য উপাস্য, ইলাহ ও মাবুদ তৈরি করুক না কেন আসলে কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও শাসন কর্তৃত্ব নিরংকুশভাবে একমাত্র সেই অবিনশ্বর সত্তার অংশীভূত, যাঁর জীবন কারো দান নয় বরং নিজস্ব জীবনী শক্তিতে যিনি স্বয়ং জীবিত এবং যাঁর শক্তির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে এ বিশ্বজাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা।[৩০৯]

○

৭৫

আল কাইয়্যুমু ঃ اَلْقَيُّوْمُ

অর্থ ঃ আপন শক্তি বলে যিনি টিকে থাকেন, বিশ্বনিখিলের রক্ষক।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আল বাকারার ২৫৫ ও সূরা আলে ইমরানের ২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ - البقرة : ٢٥٥، ال عمران : ٢

"আল্লাহ্ এক চিরঞ্জীব ও শাশ্বত সত্তা যিনি বিশ্বজাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে ধারণ করে আছেন, আসলে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং তার শক্তির ওপর নির্ভর করেই সমগ্র বিশ্বব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫, সূরা আলে ইমরান ঃ ২

আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত রাখার কারণেই এ সীমাহীন বিশ্বজাহান প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কোনো ফেরেশতা, জিন, নবী বা অলী একে ধরে রাখছে না। বিশ্বজাহানকে ধরে রাখা তো দূরের কথা, এ অসহায় বান্দারা তো নিজেদেরকেই ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে না। প্রত্যেকেই নিজের জন্ম ও স্থায়িত্বের জন্য মহান সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাদের মধ্য থেকে কারো সম্পর্কে একথা মনে করা যে, আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তার কিছুটা অংশ আছে, নিছক বোকামী ও প্রতারণার শিকার হওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে ?[৩১০]

○

৭৬

আল ওয়াজিদু : اَلْوَاجِدُ

অর্থ : বিদ্যমান, উপস্থিত, প্রাপক।

ব্যাখ্যা : এ পবিত্র নামটি আল কুরআনে উল্লেখ হয়নি। তবে এর কতিপয় সমার্থসূচক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এতেও কর্মের সম্বন্ধ আল্লাহর পরিবর্তে বান্দার প্রতি নিবন্ধ করা হয়েছে। যেমন—সূরা আন নূরের ৩৯ আয়াত :

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰـهُ حِسَابَهٗ ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۙ

"কিন্তু যারা কুফরী করে তাদের কর্মের উপমা হলো পানিহীন মরুপ্রান্তরে মরীচিকা, তৃষ্ণাতুর পথিক তাকে পানি মনে করেছিল, কিন্তু যখন সে সেখানে পৌছলো কিছুই পেলে না বরং সেখানে সে আল্লাহকে উপস্থিত পেলো, যিনি তার পূর্ণ হিসেব মিটিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর হিসেব নিতে দেরী হয় না।"–সূরা আন নূর : ৩৯

৭৭

আল মাজিদু ঃ اَلْمَاجِدُ

অর্থ ঃ মহিমান্বিত, মহান, শ্রেষ্ঠ, সম্মানিত।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা হূদে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ○ هود : ٧٣

"আর অবশ্যি আল্লাহ অত্যন্ত প্রশংসা এবং বড়ই শানশওকতের অধিকারী।"–সূরা হূদ ঃ ৭৩

'মাজিদ' শব্দটি আরবী ভাষায় দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক. উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ সম্মানিত ও মর্যাদাবান। দুই. দয়ালু, পর্যাপ্ত দাতা ও অত্যন্ত কল্যাণকামী।

শ্রেষ্ঠ সম্মানিত বলে এ ধরনের বিপুল মর্যাদাসম্পন্ন সত্তার প্রতি অশোভন আচরণ করার হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।[৩১১]

○

৭৮

আল ওয়াহিদু ঃ اَلْـوَاحِـدُ

অর্থ ঃ একক, একাকী, এক।

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَالٰـهُكُمْ اِلٰـهٌ وَّاحِـدٌ ج لَآ اِلٰـهَ اِلاَّ هُوَ الـرَّحْـمٰنُ الـرَّحِيْمُ۝ - البقرة : ١٦٣

"তোমাদের আল্লাহ এক ও একক। সেই দয়াবান ও করুণাময় আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আল্লাহ নেই।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৩

وَلاَ تَـقُوْلُـوْا ثَـلٰـثَـةٌ ط اِنْـتَـهُوْا خَيْرًا لَّـكُمْ ط اِنَّمَا اللّٰـهُ اِلٰـهٌ وَّاحِـدٌ ط -

"এবং তিন বলো না। নিবৃত্ত হও, এটা তোমাদের জন্যই ভালো। আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭১

لَـقَدْ كَفَرَ الَّـذِيْنَ قَالُـوْآ اِنَّ اللّٰـهَ ثَالِـثُ ثَلٰـثَةٍ م وَمَا مِنْ اِلٰـهٍ اِلاَّ اِلٰـهٌ وَّاحِـدٌ ط -

"নিসন্দেহে তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে, আল্লাহ তিনজনের মধ্যে একজন। অথচ এক ইলাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"
–সূরা আল মায়েদা ঃ ৭৩

قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰـهٌ وَّاحِـدٌ وَّاِنَّـنِىْ بَـرِئٌ مِّمَّا تُـشْرِكُوْنَ۝ - الانعام : ١٩

"বলো, আল্লাহ তো একজনই এবং তোমরা যে শিরকে লিপ্ত রয়েছো আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৯

ءَ اَرْبَابٌ مُّـتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰـهُ الْـوَاحِـدُ الْـقَهَّارُ۝ - يوسف : ٣٩

"ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক রব ভালো, না এক আল্লাহ, যিনি সবার ওপর বিজয়ী!"–সূরা ইউসুফ ঃ ৩৯

قُلِ اللّٰـهُ خَالِـقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْـوَاحِـدُ الْـقَهَّارُ۝ - الـرعد : ١٦

"বলো প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনি একক ও সবার ওপর পরাক্রমশালী।"–সূরা আর রা'দ ঃ ১৬

وَبَرَزُوْا لِلّٰـهِ الْـوَاحِـدِ الْـقَهَّارِ۝ - ابرهيم : ٤٨

"এবং সবাই এক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উন্মুক্ত হয়ে হাযির হবে।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৪৮

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ـ

"এটি একটি পয়গাম সব মানুষের জন্য এবং এটি পাঠানো হয়েছে এজন্যে যাতে এর মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা যায় এবং তারা জেনে নেয় যে, আসলে আল্লাহ মাত্র একজনই।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৫২

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج ـ النحل : ٢٢

"এক ইলাহই তোমাদের আল্লাহ।"–সূরা আন নাহল ঃ ২২

وَقَالَ اللّٰهُ لَاتَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ج اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنَ ○

"আল্লাহর ফরমান হলো, দুই ইলাহ গ্রহণ করো না, ইলাহ তো মাত্র একজন, কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় করো।"-সূরা আন্ নাহল ঃ ৫১

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج ـ الكهف : ١١٠

"হে মুহাম্মাদ! বলো, আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো, আমার প্রতি অহী করা হয় এ মর্মে যে, এক আল্লাহই তোমাদের ইলাহ।"–সূরা আল কাহ্ফ ঃ ১১০

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ـ الانبياء : ١٠٨

"এদেরকে বলো, আমার কাছে যে অহী আসে তা হচ্ছে এই যে, কেবল মাত্র এক ইলাহই তোমাদের ইলাহ ....।"

–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৮

فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ط ـ الحج : ٣٤

"কাজেই তোমাদের ইলাহও সে একজনই এবং তোমরা তাঁরই ফরমানের অনুগত হয়ে যাও।"–সূরা আল হজ্জ ঃ ৩৪

وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○ ـ العنكبوت : ٤٦

"আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একজনই এবং আমরা তাঁরই আদেশ পালনকারী।"–সূরা আল আনকাবূত ঃ ৪৬

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ○ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ○

"তোমাদের প্রকৃত মা'বুদ মাত্র একজনই—যিনি পৃথিবী ও আকাশ-মণ্ডলীর এবং পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যা কিছু আছে তাদের সবার মালিক।"–সূরা আস সাফ্ফাত ঃ ৪-৫

قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ ق وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلاَّ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ - ص : ٦٥

"হে নবী ! এদেরকে বলো, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত মাবুদ নেই। তিনি একক, সবার ওপর আধিপত্যশীল।"–সূরা সাদ ঃ ৬৫

سُبْحٰنَهٗ ط هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ - الزمر : ٤

"তিনি এ থেকে পবিত্র (যে, কেউ তাঁর পুত্র হবে)। তিনি আল্লাহ! তিনি একক ও সবার ওপর বিজয়ী।"–সূরা আয্ যুমার ঃ ৪

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ - المؤمن : ١٦

"(যেদিন ঘোষণা দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে) আজ রাজত্ব কার ? (সমস্ত সৃষ্টি বলে উঠবে) একমাত্র আল্লাহর, যিনি কাহ্হার।"
–সূরা আল মু'মিন ঃ ১৬

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ - حم السجدة :٦

"(হে নবী!) এদের বলে দাও। আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয় যে, একজনই মাত্র তোমাদের ইলাহ।"–সূরা হা-মীম আস্ সাজদা ঃ ৬

তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং একক সত্তার অধিকারী, কোনো বস্তু বা দ্রব্যের কিংবা কোনো পুরুষের অংশ নন। আর এ বিষয় সুস্পষ্ট যে, সন্তান সমগোত্রীয় হয়ে থাকে। আর দাম্পত্য জীবন ছাড়া সন্তানের কল্পনা করা যায় না। আর দাম্পত্য সম্পর্কও কেবল সমগোত্রীয়ের সাথেই হতে পারে। সুতরাং একক ও অদ্বিতীয় সত্তা আল্লাহর সন্তান থাকার কথা যে ব্যক্তি বলে সে চরম মূর্খ ও নির্বোধ।[৩১২]

○

একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত উপাস্য ও মাবুদ। কারণ তিনি সবার ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী, আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং বিশ্বজাহানের সমস্ত জিনিস তাঁর মালিকানাধীন।[৩১৩]

○

সূরা আল মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ ج لَايَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○- المؤمن : ١٦

"সেটি এমন দিন যখন সব মানুষের সবকিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে। আল্লাহর কাছে তাদের কোনো কথাই গোপন থাকবে না। (সেদিন ঘোষণা দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে) আজ রাজত্ব কার ? (সমস্ত সৃষ্টি বলে উঠবে) একমাত্র আল্লাহর যিনি কাহ্হার।"-সূরা আল মু'মিন ঃ ১৬

পৃথিবীতে তো বহু অহংকারী ভ্রান্ত লোক নিজেদের বাদশাহী ও শক্তিমত্তার ডঙ্কা বাজাতো আর বহু সংখ্যক নির্বোধ তাদের বাদশাহী ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতো। এখন বলো, প্রকৃতপক্ষে বাদশাহী কার ? ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকৃত মালিক কে ? আর হুকুমই বা চলে কার ? এটা এমন একটা বিষয় যে কোনো ব্যক্তি যদি তা বুঝার চেষ্টা করে তাহলে সে যত বড় বাদশাহ কিংবা একনায়ক হয়ে থাকুক না কেন, ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তার মন-মগজ থেকে শক্তিমত্তার সমস্ত অহংকার উবে যাবে।[৩১৪]

○

অন্য কাউকে আল্লাহ হিসেবে গ্রহণ করবে না, অন্য কারো দাসত্ব ও পূজা-অর্চনা করবে না, অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকবে না। আর কারো সামনে আনুগত্যের মাথা নত করো না এবং অন্য কারো রীতি ও নিয়ম-কানুনকে অবশ্য অনুসরণীয় বিধান হিসেবে মেনে নিও না।[৩১৫]

○

আল আহাদু اَلْاَحَدُ

অর্থ ঃ একক, অদ্বিতীয়।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা ইখলাসে এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝- الاخلاص : ١

"বল, তিনি আল্লাহ্, একক।"–আয়াত ঃ ১

এখানে সর্বপ্রথম একথাটি বুঝে নিতে হবে যে, এ বাক্যটিতে মহান আল্লাহর জন্য "আহাদ" শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা আরবী ভাষায় এ শব্দটির একটি অস্বাভাবিক ব্যবহার। সাধারণত অন্য একটি শব্দের সাথে সম্বন্ধের ভিত্তিতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যেমন يَوْمُ الْاَحَدِ "সপ্তাহের প্রথম দিন"। অনুরূপভাবে فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ "তোমাদের কোনো এক জনকে পাঠাও"। অথবা সাধারণ নেতিবাচক অর্থে এর ব্যবহার হয়। যেমন ঃ مَا جَاءَنِىْ اَحَدٌ "আমার কাছে কেউ আসেনি।" কিংবা ব্যাপকতার ধারণাসহ প্রশ্ন সূচক বাক্যে বলা হয়। যেমন– هَلْ عِنْدَكَ اَحَدَ "তোমার কাছে কি কেউ আছে ?" অথবা এ ব্যাপকতার ধারণাসহ শর্ত প্রকাশক বাক্যে এর ব্যবহার হয়। যেমন اِنْ جَاءَكَ اَحَدٌ "যদি তোমার কাছে কেউ এসে থাকে।" অথবা গণনায় বলা হয়। যেমন ঃ اَحَدَ اثْنَانِ اَحَدَ عَشَرَ "এক, দুই, এগার।" এ সীমিত ব্যবহারগুলো ছাড়া কুরআন নাযিলের পূর্বে আরবী ভাষায় اَحَدٌ (আহাদ) গুণবাচক অর্থে ব্যবহার অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা জিনিসের গুণ প্রকাশ অর্থে "আহাদ" শব্দের ব্যবহারের কোনো নযির নেই। আর কুরআন নাযিলের পর এ শব্দটি শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ অস্বাভাবিক বর্ণনা পদ্ধতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথা প্রকাশ করে যে, একক ও অদ্বিতীয় হওয়া আল্লাহর বিশেষ গুণ। বিশ্বজাহানের কোনো কিছুই এ গুণে গুণান্বিত নয়; তিনি এক ও একক, তাঁর কোনো দ্বিতীয় নেই।

তারপর মুশরিক ও কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর রব সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করেছিল সেগুলো সামনে রেখে দেখুন هُوَ اللّٰهُ বলার পর اَحَدٌ বলে কিভাবে তার জবাব দেয়া হয়েছে ঃ

প্রথমত, এর মানে হচ্ছে তিনি একাই রব। তাঁর 'রবুবিয়াতে' কারো কোনো অংশ নেই। আর যেহেতু ইলাহ (মাবূদ) একমাত্র তিনিই হতে

পারেন যিনি রব (মালিক ও প্রতিপালক) হন, তাই 'উলুহিয়াতে'ও (মা'বুদ হবার গুণাবলী) কেউ তাঁর সাথে শরীক নেই।

দ্বিতীয়ত, এর মানে এও হয় যে, তিনি একাই এ বিশ্বজাহানের স্রষ্টা। এ সৃষ্টিকর্মে কেউ তাঁর সাথে শরীক নয়। তিনি একাই সমগ্র বিশ্বরাজ্যের মালিক ও একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি একাই বিশ্বব্যবস্থার পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। নিজের সমগ্র সৃষ্টিজগতের রিযিক তিনি একাই দান করেন। সংকটকালে তিনি একাই তাদের সাহায্য করেন ও ফরিয়াদ শোনেন। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের এসব কাজকে তোমরা নিজেরাও আল্লাহর কাজ বলে মনে করো, এসব কাজে আর কারো সামান্যতম কোনো অংশও নেই।

তৃতীয়ত, তারা একথাও জিজ্ঞেস করেছিল, তিনি কিসের তৈরী ? তাঁর বংশধারা কি ? তিনি কোন্ প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ? দুনিয়ার উত্তরাধিকার তিনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন ? এবং তাঁরপর কে এর উত্তরাধিকারী হবে? আল্লাহ তাদের এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব একটিমাত্র "আহাদ" শব্দের মাধ্যমে দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে ঃ (১) তিনি এক আল্লাহ, চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তাঁর আগে কেউ আল্লাহ ছিল না এবং তাঁর পরেও কেউ আল্লাহ হবে না। (২) আল্লাহর এমন কোনো প্রজাতি নেই, যার সদস্য তিনি হতে পারেন। বরং তিনি একাই আল্লাহ এবং তাঁর সমগোত্রীয় ও সমজাতীয় কেউ নেই। (৩) তাঁর সত্তা নিছক وَاحِدٌ এক নয় বরং أَحَدٌ একক, যেখানে কোনো দিক দিয়ে একাধিক্যের সামান্যতম স্পর্শও নেই। তিনি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত কোনো সত্তা নন। তাঁর সত্তাকে খণ্ডিত করা যেতে পারে না। তার কোনো আকার ও রূপ নেই। তা কোনো স্থানের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয় এবং তার মধ্যে কোনো জিনিস আবদ্ধ হতে পারে না। তার কোনো বর্ণ নেই। কোনো অংগ প্রত্যংগ নেই, কোনো দিক নেই। তার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন-বিবর্তন ঘটে না। সকল প্রকার ধরন ও প্রকরণমুক্ত ও বিবর্জিত তিনি একমাত্র সত্তা, যা সব দিক দিয়েই আহাদ বা একক। (এ পর্যায়ে একথাটি ভালোভাবে জেনে নিতে হবে যে, আরবী ভাষায় "ওয়াহেদ" শব্দটিকে ঠিক তেমনিভাবে ব্যবহার করা হয় যেমনিভাবে আমাদের ভাষায় আমরা "এক" শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকি। বিপুল সংখ্যা সম্বলিত কোনো সমষ্টিকেও তার সামগ্রিক সত্তাকে সামনে রেখে "ওয়াহেদ" বা "এক" বলা হয়। যেমন এক ব্যক্তি, জাতি, এক দেশ, এক পৃথিবী, এমন কি এক বিশ্বজাহানও। আবার কোনো সমষ্টির প্রত্যেক অংশকেও আলাদা আলাদাভাবেও "এক"-ই বলা

হয়। কিন্তু 'আহাদ' বা 'একক' শব্দটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য ব্যবহার করা হয় না। এজন্য কুরআন মজীদে যেখানেই আল্লাহর জন্য ওয়াহেদ। (এক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই বলা হয়েছে, "ইলাহুন ওয়াহেদ"এক মাবূদ বা "আল্লাহুল ওয়াহেদুল কাহ্‌হার"—এক আল্লাহ্‌ই সবাইকে বিজিত ও পদানত করে রাখেন। কোথাও নিছক "ওয়াহেদ" বলা হয়নি। কারণ যেসব জিনিসের মধ্যে বিপুল ও বিশাল সমষ্টি রয়েছে তাদের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বিপরীত পক্ষে আহাদ শব্দটি একমাত্র আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ আল্লাহই একমাত্র সত্তা ও অস্তিত্ব যার মধ্যে কোনো প্রকার একাধিক্য নেই। তাঁর একক সত্তা সব দিক দিয়েই পূর্ণাংগ।[৩১৬]

○

(৮০)

আস্ সামাদু ঃ اَلصَّمَدُ

অর্থ ঃ অভাবহীন, মুখাপেক্ষিতাহীন, স্বয়ম্ভর।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা ইখলাসের দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে اَللّٰهُ الصَّمَدُ।

সামাদ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, ص م د ধাতু থেকে। আরবী ভাষায় এ ধাতুটি থেকে যতগুলো শব্দের উৎপত্তি হয়েছে সেগুলোর ওপর নজর বুলালে এ শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা জানা যায়। যেমন ঃ اَلصَّمْدُ। মনস্থ করা, ইচ্ছা করা। বিপুলায়তন বিশিষ্ট উন্নত স্থান এবং বিপুল ঘনত্ব বিশিষ্ট উন্নত মর্যাদা, উচ্চ সমতল ছাদ, যুদ্ধে যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয় না, প্রয়োজনের সময় যে সরদারের শরণাপন্ন হতে হয়।

اَلصَّمَدُ ঃ প্রত্যেক জিনিসের উঁচু অংশ, যে ব্যক্তির ওপরে আর কেউ নেই, যে নেতার আনুগত্য করা হয় এবং তার সাহায্য ছাড়া কোনো বিষয়ের ফায়সালা করা হয় না, অভাবীরা যে নেতার শরণাপন্ন হয়। চিরন্তন, উন্নত মর্যাদা। এমন নিবিড় ও নিশ্ছিদ্র যার মধ্যে কোনো ছিদ্র, শূন্যতা ও ফাঁকা অংশ নেই, যেখান থেকে কোনো জিনিস বের হতে পারে না এবং কোনো জিনিস যার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। যুদ্ধে যে ব্যক্তি ক্ষুধা-তৃষ্ণার শিকার হয় না।

اَلْمُصْمَدُ ঃ জমাট জিনিস, যার পেট নেই।

اَلْمُصَمَّدُ ঃ যে লক্ষ্যের দিকে যেতে মনস্থ করা হয় ; যে কঠিন জিনিসের মধ্যে কোনো দুর্বলতা নেই।

بَيْتٌ مُصْمَدٌ ঃ এমন গৃহ, প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য যার আশ্রয় নিতে হয়।

بِنَاءٌ مُصْمَدٌ ঃ উঁচু ইমারত।

صَمَدَهُ وَصَمَدَ اِلَيْهِ صَمْدًا ঃ ঐ লোকটির দিকে যাওয়ার সংকল্প করলো।

اَصْمَدَ اِلَيْهِ الْاَمْرَ ঃ ব্যাপারটি তার হাতে সোপর্দ করলো ; তার সামনে ব্যাপারটি পেশ করলো ; বিষয়টি সম্পর্কে তার ওপর আস্থা স্থাপন করলো। (সিহাহ, কামূস ও লিসানুল আরব)

এসব শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে "আল্লাহুস্ সামাদ" আয়াতটিতে উল্লেখিত "সামাদ" শব্দের যে ব্যাখ্যা সাহাবী, তাবেঈ ও পরবর্তীকালের আলিমগণ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে নিচে আমরা তা উল্লেখ করছি ঃ

হযরত আলী (রা), ইকরামা ও কা'ব আহবার বলেছেন ঃ সামাদ হচ্ছেন এমন এক সত্তা যাঁর ওপরে আর কেউ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালামাহ বলেছেন ঃ তিনি এমন সরদার, নেতা ও সমাজপতি, যাঁর নেতৃত্ব পূর্ণতা লাভ করেছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

এ প্রসংগে ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে ঃ লোকেরা কোনো বিপদে-আপদে যাঁর দিকে সাহায্য লাভের জন্য এগিয়ে যায়, তিনি সামাদ। তাঁর আর একটি উক্তি হচ্ছে ঃ যে সরদার তাঁর নেতৃত্ব, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, ধৈর্য, সংযম, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় পূর্ণতার অধিকারী তিনি সামাদ।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন ঃ যিনি কারো ওপর নির্ভরশীল নন, সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল, তিনিই সামাদ।

ইকরামার আর একটি বক্তব্য হচ্ছে ঃ যাঁর মধ্য থেকে কোনো জিনিস কোনোদিন বের হয়নি এবং বের হয়ও না আর যে পানাহার করে না, সেই সামাদ। এরই সমার্থবোধক উক্তি শা'বী ও মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কারাযী থেকেও উদ্ধৃত হয়েছে।

সুদ্দী বলেছেন ঃ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করার জন্য লোকেরা যার কাছে যায় এবং বিপদে সাহায্য লাভের আশায় যার দিকে হাত বাড়ায় তাঁকেই সামাদ বলে।

সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন ঃ যে নিজের সকল গুণ ও কাজে পূর্ণতার অধিকারী হয়। রাবী' ইবনে আনাস বলেছেন ঃ যাঁর ওপর কখনো বিপদ-আপদ আসে না।

মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেছেন ঃ যিনি সকল প্রকার দোষত্রুটি মুক্ত।

ইবনে কাইসান বলেছেন ঃ অন্য কেউ যার গুণাবলীর ধারক হয় না।

হাসান বসরী ও কাতাদা বলেছেন ঃ যে বিদ্যমান থাকে এবং যার বিনাশ নেই। প্রায় এ একই ধরনের উক্তি করেছেন মুজাহিদ, মা'মার ও মুর্‌রাতুল হামদানী।

মুর্‌রাতুল হামদানীর আর একটি উক্তি হচ্ছে ঃ যে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং যা ইচ্ছা তাই করে ; যাঁর হুকুম ও ফায়সালা পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা কারো থাকে না।

ইবরাহীম নাখ্‌য়ী বলেছেন ঃ যাঁর দিকে লোকেরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য এগিয়ে যায়।

আবু বকর আমবায়ী বলেছেন ঃ সামাদ এমন এক সরদারকে বলা হয়, যাঁর উপরে আর কোনো সরদার নেই এবং লোকেরা নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ে ও নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যাঁর শরণাপন্ন হয়। অভিধানবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। আয্‌ যুজাজের বক্তব্য প্রায় এর কাছাকাছি। তিনি বলেছেন ঃ যাঁর ওপর এসে নেতৃত্ব খতম হয়ে গেছে এবং নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকে যাঁর শরণাপন্ন হয়, তাঁকেই বলা হয় সামাদ।

"আহাদ" শব্দটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট—আর কারো জন্য এ শব্দটি আদৌ ব্যবহৃত হয় না। তাই এখানে "আহাদুন" শব্দটি অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে "সামাদ" শব্দটি অন্যান্য সৃষ্টির জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই "আল্লাহু সামাদুন" না বলে "আল্লাহুস্ সামাদ" বলা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, আসল ও প্রকৃত সামাদ হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। সৃষ্টি যদি কোনো দিক দিয়ে সামাদ হয়ে থাকে তাহলে অন্য দিক দিয়ে তা সামাদ নয়। কারণ তা অবিনশ্বর নয়—একদিন তার বিনাশ হবে, তাকে বিশ্লেষণ ও বিভক্ত করা যায়, তা বিভিন্ন উপাদান সহযোগে গঠিত, যে কোনো সময় তার উপাদানগুলো আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোনো কোনো সৃষ্টি তার মুখাপেক্ষী হলেও সে নিজেও আবার কারো মুখাপেক্ষী, তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আপেক্ষিক, নিরংকুশ নয়। কারো তুলনায় সে শ্রেষ্ঠতম হলেও তার তুলনায় আবার অন্য কেউ আছে শ্রেষ্ঠতম। কিছু সৃষ্টির কিছু প্রয়োজন সে পূর্ণ করতে পারে, কিন্তু সবার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষমতা কোনো সৃষ্টির নেই। বিপরীত পক্ষে আল্লাহর সামাদ হবার গুণ অর্থাৎ তাঁর মুখাপেক্ষীহীনতার গুণ সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণ। সারা দুনিয়া তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিস নিজের

অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব এবং প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য সচেতন ও অবচেতনভাবে তাঁরই শরণাপন্ন হয়। তিনিই তাদের সবার প্রয়োজন পূর্ণ করেন ; তিনি অমর, অজয়, অক্ষয়। তিনি রিযিক দেন—নেন না। তিনি একক—যৌগিক ও মিশ্র নন। কাজেই বিভক্তি ও বিশ্লেষণযোগ্য নন। সমগ্র বিশ্বজাহানের ওপর তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তিনি নিছক "সামাদ" নন, বরং "আস্ সামাদ।" অর্থাৎ তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি মূলত সামাদ তথা অমুখাপেক্ষিতার গুণাবলীর সাথে পুরোপুরি সংযুক্ত।

আবার যেহেতু তিনি "আস্ সামাদ", তাই তাঁর একাকী ও স্বজনহীন হওয়া অপরিহার্য। কারণ এ ধরনের সত্তা একজনই হতে পারেন, যিনি কারো কাছে নিজের অভাব পূরণের জন্য হাত পাতেন না, বরং সবাই নিজেদের অভাব পূরণের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী হয়। দুই বা তার চেয়ে বেশী সত্তা সবার প্রতি অমুখাপেক্ষী ও অনির্ভরশীল এবং সবার প্রয়োজন পূরণকারী হতে পারে না। তাছাড়া তাঁর "আস্ সামাদ" হবার কারণে তাঁর একক মাবুদ হবার ব্যাপারটিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ মানুষ যাঁর মুখাপেক্ষী হয় তাঁরই ইবাদাত করে। আবার তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, "আস্ সামাদ" হবার কারণে এটাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, যে প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা ও সামর্থই রাখে না, কোনো সচেতন ব্যক্তি তার ইবাদাত করতে পারে না।[৩১৭]

○

আল কাদিরু : اَلْقَادِرُ

অর্থ : পূর্ণাংগ শক্তি ও ক্ষমতার মালিক।

ব্যাখ্যা : সূরা আলআনআমে বলা হয়েছে :

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً الخ

"বলো, আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক অজ্ঞতায় ডুবে আছে।"-সূরা আনআম : ৩৭

আল্লাহর এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, মু'জিযা না দেখাবার কারণ এ নয় যে, আমি তা দেখাতে অক্ষম ; বরং এর কারণ অন্য কিছু। নিছক নিজেদের অজ্ঞতার কারণে তারা এটা বুঝতে পারছে না।[৩১৮]

○

সূরা আল আনআমের অন্য আরেক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে :

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ط - الانعام : ٦٥

"বলো, তিনি ওপর থেকে বা তোমাদের পদতল থেকে তোমাদের ওপর কোনো আযাব নাযিল করতে অথবা তোমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে এক দলকে আরেক দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করিয়ে দিতে সক্ষম।"–সূরা আল আনআম : ৬৫

আল্লাহর আযাবকে নিজেদের থেকে দূরে অবস্থান করতে দেখার কারণে তারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে চলছিল। তাই তাদের উদ্দেশ্যে এখানে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হচ্ছে, আল্লাহর আযাব আসতে একটুও দেরী হয় না। একটি ঘূর্ণিঝড় অকস্মাত তোমাদের সবকিছু বরবাদ করে দিতে পারে। ভূমিকম্পের একটি মাত্র ঝট্কা তোমাদের সমগ্র জনপদকে ধূলিসাৎ করে দেবার জন্য যথেষ্ট। গোত্রীয় ও জাতীয় বিবাদ বিসম্বাদ এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরাজমান শত্রুতার বারুদে শুধু ছোট্ট একটুখানি আগুনের স্ফুলিংগ রেখে দিলেই তা এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে, যার ফলে বছরের

পর বছর ধরে রক্তপাত, বিশৃংখলা ও অশান্তি থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হবে না। কাজেই আযাব আসছে না বলে তোমরা গাফলতির জোয়ারে বেহুঁশের মতো গা ভাসিয়ে দিয়ো না। তোমরা যেন একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুল-নির্ভুল, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যার মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য করা ছাড়াই অন্ধের মতো জীবন পথে এগিয়ে চলো না। আল্লাহ তোমাদের অবকাশ দিয়েছেন এবং তোমাদের সামনে এমন সব নিশানী পেশ করছেন যার সাহায্যে তোমরা সত্যকে চিনে নিয়ে সঠিক ও নির্ভুল পথ অবলম্বন করতে পারবে, এটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করো।[৩১৯]

○

সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ .

"তারা কি খেয়াল করেনি, যে আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ রাজ্য সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার অবশ্যই ক্ষমতা রাখেন।"
–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৯

সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে ঃ

اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط

"যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না ? কেন নয়, যখন তিনি পারদর্শী স্রষ্টা।"
–সূরা ইয়াসীন ঃ ৮১

সূরা আল আহ্কাফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ

عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى ط ـ الاحقاف : ٣٣

"যে আল্লাহ এ পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো সৃষ্টি করতে যিনি পরিশ্রান্ত হননি তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবিত করে তুলতে সক্ষম।"–সূরা আল আহ্কাফ ঃ ৩৩

সূরা আল কিয়ামায় বলা হয়েছে ঃ

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِ ىَ الْمَوْتٰى ○ ـ القيمة : ٤٠

"সেই স্রষ্টা কি মৃতদের পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন ?"
–সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৪০

যারা একথা বিশ্বাস করে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে বীর্য দ্বারা সৃষ্টির সূচনা করে পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি করা পর্যন্ত গোটা কাজটাই মহান আল্লাহর শক্তি ও কৌশলের একটা বিস্ময়কর নমুনা, তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে এ প্রমাণের কোনো জবাব নেই। কেননা, তারা যতই ঔদ্ধত্য দেখাক না কেন তাদের বিবেক-বুদ্ধি একথা না মেনে পারে না যে, যে আল্লাহ এভাবে দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টি করেন তিনি পুনরায় এ মানুষকে অস্তিত্ব দান করতেও সক্ষম। তবে যারা এ স্পষ্ট জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিসংগত কাজকে কেবল আকস্মিকতার ফল বলে মনে করে তারা যদি হঠকারী আচরণ করতে বদ্ধপরিকর না হয়ে থাকে তাহলে একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা তাদের দিতে হবে। বিষয়টি হলো, একই ধরনের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর প্রতিটি অংশে প্রত্যেক জাতির মধ্যে নারী ও পুরুষের জন্মের যে অনুপাত চলে আসছে তাতে কোথাও কোনো যুগে এমন অবস্থা কখনো দেখা দেয়নি যে, কোনো জনপদে ক্রমাগত শুধু পুরুষ অথবা শুধু নারীই জন্ম লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে তাদের বংশধারা টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনাই থাকেনি। তাদের কাছে এরূপ না হওয়ার কি যুক্তি ও ব্যাখ্যা আছে ? এ কাজটিও কি আকস্মিকভাবেই হয়ে চলেছে ? এত বড় দাবী করার জন্য কোনো মানুষকে অন্তত এতটা নির্লজ্জ ও বেশরম হওয়া চাই যাতে সে একদিন এ দাবীও করে বসতে পারে যে, লন্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো এবং পিকিং-এর মত শহর আকস্মিকভাবে অপনা আপনি অস্তিত্ব লাভ করেছে।[৩২০]

○

সূরা আত তারিকে এরশাদ হয়েছে ঃ

انَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝ - الطارق : ٨

"নিশ্চিতভাবেই তিনি (স্রষ্টা) তাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন।"–সূরা আত তারিক ঃ ৮

যেভাবে তিনি মানুষকে অস্তিত্ব দান করেন এবং গর্ভ সঞ্চারের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তার দেখাশুনা করেন তা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করে যে, তিনি মৃত্যুর পর আবার তাকে অস্তিত্বশীল করতে পারেন। যদি তিনি প্রথমটির ক্ষমতা রেখে থাকেন এবং তারি বদৌলতে মানুষ দুনিয়ায় জীবন ধারণ করছে, তাহলে তিনি দ্বিতীয়টির ক্ষমতা রাখেন না,

এ ধারণা পোষণ করার পেছনে এমন কি শক্তিশালী যুক্তি পেশ করা যেতে পারে ? আল্লাহ্‌র এ শক্তিকে অস্বীকার করতে হলে আল্লাহ্ যে তাকে অস্তিত্বদান করেছেন সরাসরি একথাটিই অস্বীকার করতে হবে। আর যে ব্যক্তি একথা অস্বীকার করবে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি একদিন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় যার ফলে সে দাবী করে বসবে, এ দুনিয়ায় সমস্ত বইপত্র একদিন ঘটনাক্রমে ছাপা হয়ে গেছে, দুনিয়ার সমস্ত শহর একদিন হঠাৎ ঘটনাক্রমে তৈরি হয়ে গেছে এবং এ দুনিয়ায় হঠাৎ একদিন এমন এক ঘটনা ঘটে গেছে যার ফলে সমস্ত কল-কারখানা আপনা অপনি নির্মিত হয়ে তাতে উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে। আসলে মানুষ দুনিয়ায় যেসব কাজ করেছে ও করছে তার তুলনায় তার সৃষ্টি ও তার শারীরিক গঠনাকৃতি এবং তার মধ্যে কর্মরত শক্তি যোগ্যতাসমূহের সৃষ্টি এবং একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে তার টিকে থাকা অনেক বেশী জটিল কাজ। এত বড় জটিল কাজ যদি এ ধরনের জ্ঞানবত্তা, উন্নত কলাকৌশল, আনুপাতিক ও পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম এবং সাংগঠনিক শৃংখলা সহকারে হঠাৎ ঘটনাক্রমে ঘটে যেতে পারে, তাহলে দুনিয়ার আর কোন্ কাজটি আছে যাকে মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি হঠাৎ ঘটে যাওয়া কাজ বলবে না ?[৩২১]

○

আল কাদীরু : اَلْقَدِيْرُ

অর্থ : সকল জিনিসের ওপর শক্তিশালী, সর্বশক্তিমান।

ব্যাখ্যা : সূরা আল বাকারার ২০ আয়াতে বলা হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - البقرة : ٢٠

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান।"–সূরা আল বাকারা : ২০

এছাড়া কুরআনের অন্যান্য যেসব সূরায় এ আয়াত এসেছে তাহলো :

সূরা আল বাকারা : ১০৬, ১০৯, ১৪৮, ২৫৯, ২৮৪ ; আলে ইমরান : ২৬, ২৯, ১৬৫, ১৮৯ ; মায়েদা : ১৭, ১৯, ৪০, ১২০ ; আনআম : ১৭ ; আনফাল : ৪১ ; তাওবা : ৩৯; হূদ : ৪; নাহল : ৭০, ৭৭ ; হাজ্জ : ৬, ৩৯ ; নূর : ৪৫; আনকাবুত : ২০; রূম : ৫০, ৫৪; ফাতির : ১; হা-মীম আস সাজদা : ৩৯ ; শূরা : ৯, ২৯, ৫০ ; আহ্‌কাফ : ৩৩ ; হাদীদ : ২ ; হাশর : ৬ ; মুমতাহিনা : ৭ ; তাগাবুন : ১ ; তালাক : ১২ ; তাহ্‌রীম : ৮ ; মুল্‌ক : ১।

তিনিই সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার শাসনকর্তা এবং দিন রাতের আবর্তন তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। এ বাহ্যিক অর্থের সাথে সাথে এ বাক্যের মধ্যে এদিকেও একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে যে, রাতের অন্ধকার থেকে যে আল্লাহ দিনের আলো বের করে আনেন এবং উজ্জ্বল দিনের ওপর যিনি রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে দেন তাঁরই এমন ক্ষমতা আছে যার ফলে আজ যাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সূর্য মধ্যগগণে কিরণ দিচ্ছে তাদের পতন ও সূর্যাস্তের দৃশ্যও দ্রুত দুনিয়াবাসী দেখতে পাবে এবং কুফর ও জাহেলিয়াতের যে অন্ধকার আজ সত্য ও ন্যায়ের প্রভাতের উদয়ের পথ রোধ করে আছে তা ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁর হুকুমে সরে যাবে এবং এ সংগে সেদিনের উদয় হবে যেদিন সত্য, সততা ও জ্ঞানের আলোকে সারা দুনিয়া আলোকিত হয়ে উঠবে।[৩২২]

○

শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য এসব অবস্থা তাঁরই সৃষ্ট। তিনি যাকে চান দুর্বল করে সৃষ্টি করেন, যাকে চান তাকে শক্তিশালী করেন, যাকে চান তাকে শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ করতে দেন না, যাকে চান তাকে

যৌবনে মৃত্যু দান করেন, যাকে চান তাকে দীর্ঘ বয়স দান করার পরও সুস্থ সবল রাখেন, যাকে চান তাকে গৌরবান্বিত যৌবনকালের পরে বার্ধক্যে এমন কষ্টকর পরিণতি দান করেন যার ফলে দুনিয়াবাসী শিক্ষালাভ করে, এসবই তাঁর ইচ্ছা। মানুষ নিজের জায়গায় বসে যতই অহংকারে মত্ত হয়ে উঠুক না কেন আল্লাহর শক্তির শৃংখলে সে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যে, আল্লাহ তাকে যে অবস্থায়ই রাখুন না কেন তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনা তার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়।[৩২৩]

○

অহংকারী বান্দারা এ ভুল ধারণা করে যে, পৃথিবীতে বসবাসকারীদের ভাগ্যের ফায়সালা তারা নিজেরাই করে। কিন্তু যে শক্তি একটি ছোট্ট বীজকে বিশাল বৃক্ষে এবং একটি বিশাল বৃক্ষকে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত করে। তার মধ্যেই এমন ক্ষমতা রয়েছে যে, যাদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি দেখে লোকেরা মনে করে এদেরকে নড়াবার সাধ্য কারো নেই, তাদেরকে তিনি এমনিভাবে ভূপাতিত করেন যে, সারা দুনিয়াবাসীর জন্য শিক্ষণীয় হয় এবং যাদেরকে দেখে কেউ কোনোদিন ধারণাই করতে পারে না যে, এরাও কোনোদিন উঠে দাঁড়াবে—তাদের মাথা তিনি এমনভাবে উঁচু করে দেন যে, দুনিয়ায় তাদের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ডংকা বাজতে থাকে।[৩২৪]

○

কোনো মানুষ, সে পার্থিব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় অধিকর্তাই সাজুক না কেন, কিংবা তাকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় মালিকই মনে করা হোক না কেন, অন্যদের সন্তান দেওয়ানো তো দূরের কথা নিজের জন্য নিজের ইচ্ছানুসারে সন্তান জন্ম দানেও সে কখনো সক্ষম হয়নি। আল্লাহ্ যাকে বন্ধ্যা করে দিয়েছেন সে কোনো ওষুধ, কোনো চিকিৎসা এবং কোনো তাবীজ কবজ দ্বারা সন্তান ওয়ালা হতে পারেনি। আল্লাহ্ যাকে শুধু কন্যা সন্তান দান করেছেন সে কোনোভাবেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করতে পারেনি এবং আল্লাহ্ যাকে শুধু পুত্র সন্তানই দিয়েছেন সে কোনোভাবেই একটি কন্যা সন্তান লাভ করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে সবাই নিদারুণ অসহায়, এমনকি সন্তান জন্মের পূর্বে কেউ এতটুকু পর্যন্ত জানতে পারেনি যে, মায়ের গর্ভে পুত্র সন্তান বেড়ে উঠছে না কন্যা সন্তান। এসব দেখেশুনেও যদি কেউ খোদার খোদায়ীতে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সেজে বসে, কিংবা অন্য কাউকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে অংশীদার মনে করে তাহলে তা তার নিজের অদূরদর্শিতা, যার

পরিণাম সে নিজেই ভোগ করবে। কেউ নিজে নিজেই কোনো কিছু বিশ্বাস করে বসলে তাতে প্রকৃত সত্যে সামান্য কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না।[৩২৫]

○

"আল্লাহ সর্বশক্তিমান" সমগ্র বিশ্বজাহানের কথা বাদ দিন। শুধুমাত্র আমাদের এ ক্ষুদ্র পৃথিবীটির কথাই ধরা যাক। আর পৃথিবীরও সমস্ত তত্ত্ব ও ঘটনাবলীর কথা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র মানুষ ও উদ্ভিদের জীবনধারা বিশ্লেষণ করা যাক। এখানে তাঁর শক্তিমত্তার যে অভাবনীয় কর্মকাণ্ড দেখা যায় সেগুলো দেখার পর কি কোনো বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তি একথা বলতে পারেন যে, আজ আমরা আল্লাহকে যাকিছু করতে দেখছি তিনি কেবল অতটুকু করতে পারেন এবং কাল যদি তিনি কারো কিছু করতে চান তাহলে করতে পারবেন না ? আল্লাহ তো তবুও অনেক বড় ও উন্নত সত্তা, মানুষের সম্পর্কেও বিগত শতক পর্যন্ত লোকের ধারণা ছিল যে, এরা শুধুমাত্র মাটির ওপর চলাচলকারী গাড়িই তৈরি করতে পারে, বাতাসে উড়ে চলা গাড়ি তৈরি করার ক্ষমতা এদের নেই। কিন্তু আজকের উড়োজাহাজ-গুলো জানিয়ে দিয়েছে যে, মানুষের সম্ভাবনার সীমানা নির্ধারণ করার ব্যাপারে তাদের ধারণা কত ভুল ছিল। আজ যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর আজকের কাজগুলো দেখে তাঁর জন্য সম্ভাবনার কিছু সীমানা নির্ধারণ করে দিয়ে বলতে থাকে যে, তিনি যাকিছু করছেন এছাড়া আর কিছু করতে পারেন না, তাহলে সে শুধুমাত্র নিজেরই মনের সংকীর্ণতার প্রমাণ দেয়, আল্লাহর শক্তি তার বেঁধে দেয়া সীমানার মধ্যে আটকে থাকতে পারে না।[৩২৬]

○

এটি আল্লাহর অবাধ ক্ষমতারই একটি বর্ণনা। তাঁর ওপর কোনো আইনের বাঁধন নেই, কোনো বিশেষ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি বাধ্য নন। বরং তিনি সর্বময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।[৩২৭]

○

তিনি নিরংকুশ শক্তির মালিক। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। কোনো শক্তি তাঁর এ সীমাহীন কুদরতকে সীমাবদ্ধ বা সংকুচিত করতে পারে না।[৩২৮]

○

হযরত ঈসা (আ)-এর অলৌকিক জন্ম, তাঁর নৈতিক ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং দৃষ্টি ও অনুভূতিগ্রাহ্য অলৌকিক কার্যকলাপে বিভ্রান্ত হয়ে যারা হযরত ঈসা (আ)-কে 'আল্লাহ' মনে করছে তারা আসলে একান্তই অজ্ঞ। হযরত ঈসা (আ)-তো আল্লাহর অসংখ্য অলৌকিক সৃষ্টির একটি নমুনা মাত্র। এটি দেখেই এসব দুর্বল দৃষ্টির অধিকারী লোকদের চোখ ঝল্সে গেছে। এদের দৃষ্টি যদি আর একটু প্রসারিত হতো তাহলে এরা দেখতে পেতো, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির এর চাইতে আরো অনেক বেশী বিস্ময়কর নমুনা পেশ করে যাচ্ছেন এবং তাঁর শক্তি কোনো একটি বিশেষ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নেই। কাজেই সৃষ্টির কোনো বিস্ময়কর ক্ষমতা দেখে তাকে স্রষ্টা মনে করা বিরাট অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বরং সৃষ্টির কৃতিত্ব ও বিস্ময়কর কার্যাবলীর মধ্যে যে ব্যক্তি স্রষ্টার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে এবং তা থেকে ঈমানের আলো সংগ্রহ করে সে-ই যথার্থ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী।[৩২৯]

○

আল মুকতাদিরু : اَلْمُقْتَدِرُ

অর্থ : মহাশক্তিধর, মহা পরাক্রমশালী।

ব্যাখ্যা : আল কুরআনে বলা হয়েছে :

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ـ القمر : ٤٢

"কিন্তু তারা আমার সবগুলো নিদর্শনকে অস্বীকার করলো। অবশেষে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। যেভাবে কোনো মহা পরাক্রমশালী পাকড়াও করেন।"–সূরা আল কামার : ৪২

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ القمر : ٥٥

"আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষাকারীরা নিশ্চিতরূপে বাগান ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে অবস্থান করবে, সত্যিকার মর্যাদার স্থানে মহা শক্তিধর সম্রাটের সান্নিধ্যে।"–সূরা আল কামার : ৫৫

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ـ الكهف : ٤٥

"আল্লাহ সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।"–সূরা আল কাহ্ফ : ৪৫

اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِيْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ـ الزخرف : ٤٢

"কিংবা এদেরকে যে পরিণামের প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি তা তোমাকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেই, এখন তো এদেরকে শাস্তি দিতে হবে। এদের বিরুদ্ধে আমি পূর্ণ ক্ষমতা রাখি।"–সূরা আয্ যুখরুফ : ৪২

তিনি জীবনও দান করেন আবার মৃত্যুও। তিনি উত্থান ঘটান আবার পতনও ঘটান। তাঁর নির্দেশে বসন্ত আসে এবং পাতা ঝড়া শীত মওসুমও তাঁর নির্দেশেই আসে। আজ যদি তুমি সচ্ছল ও আয়েশ আরামের জীবন যাপন করে থাকো তাহলে এ অহংকারে মত্ত হয়ে থেকো না যে, এ অবস্থার পরিবর্তন নেই। যে আল্লাহর হুকুমে তুমি এসব কিছু লাভ করছো তাঁরই হুকুমে এসব কিছু তোমার কাছ থেকে ছিনিয়েও নেয়া যেতে পারে।[৩৩০]

○

তিনিই সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার শাসনকর্তা এবং দিন রাতের আবর্তন তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। রাতের অন্ধকার থেকে যে আল্লাহ দিনের আলো বের করে

আনেন এবং উজ্জ্বল দিনের ওপর যিনি রাতের অন্ধকার জড়িয়ে দেন তাঁরই এমন ক্ষমতা আছে যার ফলে আজ যাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সূর্য মধ্যগগণে কিরণ দিচ্ছে তাদের পতন ও সূর্যাস্তের দৃশ্যও দ্রুত দুনিয়াবাসী দেখতে পাবে এবং কুফর ও জাহেলিয়াতের যে অন্ধকার আজ সত্য ও ন্যায়ের প্রভাতের উদয়ের পথ রোধ করে আছে তা ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁর হুকুমে সরে যাবে এবং এ সংগে সেদিনের উদয় হবে যেদিন সত্য, সততা ও জ্ঞানের আলোকে সারা দুনিয়া আলোকিত হয়ে উঠবে।[৩৩১]

○

প্রথমে তোমরা বীর্য আকারে মা-বাপের দেহে ছিলে। অতপর আল্লাহর বিধান ও সৃষ্টিকৌশল অনুসারে এ দুটি বীর্য সংমিশ্রিত হয়ে তোমরা মাতৃগর্ভে স্থিতি লাভ করেছিলে। এরপর মাতৃগর্ভে দীর্ঘ নয়টি মাস ধরে ক্রমবিকাশ ও উন্নয়ন ঘটিয়ে তোমাদের পূর্ণাংগ মানবাকৃতি দেয়া হয়েছে এবং মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে কাজ করার জন্য যে শক্তি ও যোগ্যতার প্রয়োজন তা তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর তোমরা একটি জীবন্ত শিশু হিসেবে মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছো, প্রতি মুহূর্তেই একটি অবস্থা থেকে আরেকটি অবস্থায় তোমাদের উত্তরণ ঘটানো হয়েছে। অবশেষে তোমরা যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছো। এসব পর্যায় অতিক্রমকালে প্রতি মুহূর্তেই তোমরা পুরোপুরি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও কব্জায় ছিলে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমার জন্মের জন্য গর্ভ সঞ্চারই হতে দিতেন না এবং সে গর্ভে তোমার পরিবর্তে অন্য কেউ স্থিতিলাভ করতো। তিনি চাইলে মাতৃগর্ভেই তোমাদেরকে অন্ধ, বধির, বোবা কিংবা বিকলাঙ্গ করে দিতেন অথবা তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি বিশৃংখল ও ত্রুটিপূর্ণ করে দিতেন। তিনি চাইলে তোমরা জীবন্ত শিশুরূপে জন্মলাভই করতে পারতে না। জন্মলাভের পরও যে কোনো মুহূর্তে তিনি তোমাদের ধ্বংস করতে পারতেন। তাঁর একটিমাত্র ইংগিতেই তোমরা কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে যেতে। যে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণে তোমরা এতটা অসহায় তাঁর সম্পর্কে কি করে এ ধারণা পোষণ করে বসে আছো যে, তাঁর সাথে সব রকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অকৃতজ্ঞতার আচরণ করা যেতে পারে, তাঁর বিরুদ্ধে সব রকম বিদ্রোহ করা যেতে পারে। কিন্তু এসব আচরণের জন্য তোমাদের কোনো শাস্তি ভোগ করতে হবে না ?[৩৩২]

○

আল মুকাদ্দিমু : اَلْمُقَدِّمُ

অর্থ : অগ্রিম সতর্ককারী।

ব্যাখ্যা : সূরা কাফ-এ বলা হয়েছে :

قَالَ لَاتَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ○- ق : ٢٨

"জবাবে বলা হলো, আমার সামনে ঝগড়া করো না। আমি আগেই তোমাদেরকে মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলাম।"

—সূরা ক্বাফ : ২৮

গোমরাহ ব্যক্তি ও তার শয়তান উভয়ে আল্লাহর আদালতে পরস্পর ঝগড়া করছে। সে বলছে, জনাব, এ যালেম আমার পেছনে লেগেছিলো এবং শেষ পর্যন্ত সে-ই আমাকে পথভ্রষ্ট করে ক্ষান্ত হয়েছে। সুতরাং শাস্তি পাওয়া উচিত তার। শয়তান তার জবাবে বলছে : জনাব, আমার তো তার ওপরে কোনো হাত ছিল না যে, সে বিদ্রোহী হতে না চাইলেও আমি জোর করে তাকে বিদ্রোহী বানিয়ে দিয়েছি। এ দুর্ভাগার তো নিজেরই সৎকাজের প্রতি ঘৃণা এবং মন্দকাজের প্রতি আসক্তি ছিলো। তাই নবী-রাসূলদের কোনো কথাই তার মনোপুত হয়নি এবং আমার প্ররোচনায় সে ক্রমাগত বিপথগামী হয়েছে।[৩৩৩]

○

আল্লাহর ঘোষণা হলো, তোমাদের দু'জনকেই আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, তোমাদের মধ্যে যে অন্যকে বিভ্রান্ত করবে সে কি শাস্তি পাবে এবং যে বিভ্রান্ত হবে তাকে কি পরিমাণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমার এ সতর্কবাণী সত্ত্বেও তোমরা উভয়েই যখন অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত হওনি তখন এ মুহূর্তে ঝগড়া করে কি লাভ। এখন বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্তকারী উভয়কে বিভ্রান্ত হওয়া ও বিভ্রান্ত করার শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে।[৩৩৪]

○

আল মুয়াখ্খিরু : اَلْمُؤَخِّرُ

অর্থ : অবকাশ দানকারী।

ব্যাখ্যা : আল কুরআনে বলা হয়েছে :

يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ط -

"তিনি তোমাদের ডাকছেন তোমাদের গোনাহ্ মাফ করার এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেয়ার জন্য।"

–সূরা ইবরাহীম : ১০

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ٥- ابراهيم : ٤٢

"আল্লাহ তো তাদেরকে সময় দিচ্ছেন সেই দিন পর্যন্ত যখন তাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে যাবে..........।"–সূরা ইবরাহীম : ৪২

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ط - نوح : ٤

"আল্লাহ তোমাদের গোনাহ্ মাফ করে দেবেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন।"–সূরা নূহ : ৪

مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ج - النحل : ٦١

"............ তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোনো একটি জীবকেও ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি সবাইকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন।"

–সূরা আন নাহল : ৬১

مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ج -

"তাহলে পৃথিবীতে কোনো প্রাণ সত্তাকে জীবিত ছাড়তেন না। কিন্তু একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন।"

–সূরা আল ফাতির : ৪৫

رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ لا نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ط -

"হে আমাদের রব! আমাদের একটুখানি অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেবো এবং রাসূলদের অনুসরণ করবো।"

–সূরা ইবরাহীম : ৪৪

নির্দিষ্ট সময় মানে ব্যক্তির মৃত্যুকালও হতে পারে আবার কিয়ামতও হতে পারে। জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের ব্যাপারে বলা যেতে পারে, আল্লাহর কাছে তাদের উত্থান পতনের সময়কাল নির্দিষ্ট হওয়ার বিষয়টি তাদের গুণগত অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। একটি ভালো জাতি যদি তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিকৃতির সৃষ্টি করে তাহলে তার কর্মের অবকাশ কমিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে ধ্বংস করে ফেলা হয়। আর একটি ভ্রষ্ট জাতি যদি নিজেদের অসৎ গুণাবলীকে শুধরে নিয়ে সৎ গুণাবলীতে পরিবর্তিত করে তাহলে তার কর্মের অবকাশ বাড়িয়ে দেয়া হয়। এমনকি তা কিয়ামত পর্যন্তও দীর্ঘায়িত হতে পারে।

আল্লাহর ঘোষণা হলো, আমার নিয়ম হচ্ছে, প্রত্যেক জাতিকে শুনবার, বুঝবার ও নিজেকে শুধরে নেবার জন্য কি পরিমাণ অবকাশ দেয়া হবে এবং তার যাবতীয় দুষ্কৃতি ও অনাচার সত্ত্বেও পূর্ণ ধৈর্য সহকারে তাকে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার কতটুকু সুযোগ দেয়া হবে তা আমি পূর্বাহ্নেই স্থির করে নিই। যতক্ষণ এ অবকাশ থাকে এবং আমার নির্ধারিত শেষ সীমা না আসে ততক্ষণ আমি ঢিল দিতে থাকি।[৩৩৫]

○

আল্লাহ তাড়াহুড়া করেন না। যখনই রাসূলের দাওয়াত কোনো ব্যক্তি বা দলের কাছে পৌছে যায়, তখনই যারা ঈমান আনে কেবল তারাই রহমতের হকদার হবে এবং যারা তা মানতে অস্বীকার করবে অথবা মেনে নিতে ইতস্তত করবে তাদেরকে সাথে সাথে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া আল্লাহর রীতি নয়। বরং আল্লাহর রীতি হচ্ছে, নিজের বাণী পৌছিয়ে দেবার পর তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত মর্যাদা অনুযায়ী এবং প্রত্যেক দল ও জাতিকে তার সামগ্রিক মর্যাদা অনুসারে চিন্তা-ভাবনা ও বোঝাপড়া করার জন্য যথেষ্ট সময় দেন। এ অবকাশকাল অনেক সময় শত শত বছর ধরে চলতে থাকে। এ ব্যাপারে কার কতটা অবকাশ পাওয়া উচিত তা আল্লাহই ভাল জানেন। তারপর পুরোপুরি ইনসাফের ভিত্তিতে দেয়া এ অবকাশ যখন পূর্ণ হয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দল তার বিদ্রোহাত্মক নীতি পরিবর্তন করতে চায় না তখন এরি ভিত্তিতে তার ওপর আল্লাহ তাঁর ফায়সালা কার্যকর করেন। এ ফায়সালার সময়টি আল্লাহর নির্ধারিত সময় থেকে এক মুহূর্ত আগেও আসতে পারে না এবং সময় এসে যাবার পর মুহূর্তকালের জন্য তাকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।[৩৩৬]

○

৮৬
আল আউয়ালু : اَلْاَوَّلُ

অর্থ : সবার প্রথম।

ব্যাখ্যা : সূরা আল হাদীদে বলা হয়েছে :

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ - الحديد : ٣

"তিনিই প্রথম তিনিই শেষ আর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবই তিনি।"

–সূরা আল হাদীদ : ৩

যখন কিছুই ছিল না তখন তিনি ছিলেন।

আল আখিরু : اَلْاٰخِرُ

অর্থ : সর্বশেষ, যখন কিছুই থাকবে না, তখন তিনি থাকবেন।

ব্যাখ্যা : এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআন মজীদে জান্নাত ও জাহান্নামবাসীদের জন্য যে চিরস্থায়ী জীবনের কথা বলা হয়েছে আল্লাহ তাআলাই সর্বশেষ অর্থাৎ যখন কিছুই থাকবে না তখন তিনি থাকবেন— তার সাথে একথা কি করে খাপ খায় ? এর জবাব কুরআন মজীদের মধ্যেই বিদ্যমান। ৮৮ : كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ - اَلْقَصَص অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ছাড়া আর সব জিনিসই নশ্বর ও ধ্বংসশীল।" অন্য কথায় কোনো সৃষ্টিরই নিজস্ব স্থায়িত্ব নেই। যদি কোনো জিনিস স্থায়ী হয় বা স্থায়ী থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলা স্থায়ী রাখার কারণেই তা স্থায়ী হয়ে আছে এবং থাকতে পারে। অন্যথায় আল্লাহ ছাড়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে আর সবাই নশ্বর ও ধ্বংসশীল। কেউ অপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যে অবিনশ্বর বিধায় জান্নাত বা জাহান্নামে চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে—এমনটা নয়। বরং সেখানে তার স্থায়িত্ব লাভ করার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তাকে চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন। ফেরেশতাদের ব্যাপারটাও ঠিক তাই। তারা আপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যে অবিনশ্বর নয়। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তারা অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং যত সময় পর্যন্ত তিনি চাইবেন তত সময় পর্যন্তই তারা বেঁচে থাকতে পারে।[৩৩৭]

○

(৮৮)

আয্ যাহির : اَلظَّاهِرُ

অর্থ : সর্বাধিক প্রকাশ্য।

ব্যাখ্যা : তিনি সব প্রকাশ্যের চেয়ে অধিক প্রকাশ্য। কারণ পৃথিবীতে যে জিনিসের প্রকাশ দেখা যায় তা তাঁরই গুণাবলী, তাঁরই কার্যাবলী এবং তাঁরই নূরের প্রকাশ।[৩৩৮]

○

(৮৯)

আল বাতিনু ঃ اَلْبَاطِنُ

অর্থ ঃ সর্বাধিক গুপ্ত।

ব্যাখ্যা ঃ তিনি সব গুপ্ত জিনিসের চেয়ে অধিক গুপ্ত। কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা তার সত্তাকে অনুভব উপলব্ধি করা তো দূরের কথা বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা পর্যন্ত তাঁর রহস্য ও বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে পারে না। ইমাম আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী ও বায়হাকী হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে এবং হাফেয আবু ইয়া'লা মুসেলী তার মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি দোয়া সম্বলিত যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার নিম্নোক্ত কথাগুলোই এ আয়াতে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ঃ

انت الاول فليس قبلك شيئ وانت الاخر فليس بعدك شيئ ، وانت الظاهر فليس فوقك شيئ وانت الباطن فليس دونك شيئ، ١

"তুমিই সর্বপ্রথম। তোমার পূর্বে আর কেউ নেই। তুমিই সর্বশেষ। তোমার পরে আর কেউ নেই। তুমিই প্রকাশ্য। তোমার চেয়ে প্রকাশ্য কেউ নেই। তুমি গুপ্ত। তোমার চেয়ে অধিক গুপ্ত আর কেউ নেই।"৩৩৯

○

১. এটি সূরা আল হাদীদের তৃতীয় আয়াত যাতে এ নাম বর্ণিত হয়েছে।

আল ওয়ালী : اَلْوَالِىْ

অর্থ : সমর্থক, রক্ষক ও সাহায্যকারী, শাসক।

ব্যাখ্যা : ওয়ালী (والى) বা ওয়াল (وال) শব্দটি ওয়ালাইয়াত (ولايت) থেকে নির্গত। এর অর্থ রাষ্ট্রক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক এবং তত্ত্বাবধায়ক (সহায়) ও সাহায্যকারী।

কুরআনে সূরা আর রাআদে বলা হয়েছে :

وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ○

"আর যখন আল্লাহ্ কোনো জাতিকে দুর্ভাগ্য কবলিত করার ফায়সালা করে ফেলেন তখন কারো রদ করায় তা রদ হতে পারে না এবং আল্লাহর মুকাবিলায় এমন জাতির কোনো সহায় ও সাহায্যকারী থাকতে পারে না।"–সূরা আর রাআদ : ১১

আল্লাহ্ তাআলা তত্ত্বাবধায়ক। সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধানের অধিকার তারই এবং সবার ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। বিজয় ও সাহায্য, রাজ্য ও শাসনক্ষমতা, বিশ্বজগত পরিচালনা ও ভাগ্য নির্ধারণ সবই তাঁর ইচ্ছাধীন। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই প্রকৃত অর্থে ওয়ালী বা তত্ত্বাবধায়ক।

৯১

আল মুতাআলি ঃ اَلْمُتَعَالِ

অর্থ ঃ সর্বাবস্থায় পরাক্রান্ত ও সর্বোচ্চ।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আর রাআদে বলা হয়েছে ঃ

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ـ الرعد : ٩

"তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান প্রত্যেক জিনিসের জ্ঞান রাখেন। তিনি মহান ও সর্বাবস্থায় সবার ওপর অবস্থান করেন।"-আর রাআদ ঃ ৯

عُلُوٌّ শব্দ থেকে এ নামটির উৎপত্তি হয়েছে। علی، عـالی এবং تعـالی শব্দও এ 'শব্দমূল' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। আল মুতাআল আল্লাহর নাম হবার কারণ হলো, তিনি সকল মর্যাদাশালীর চেয়ে মহান ও উচ্চতর। সকল মহানত্বের দাবীদারকে পরাভূতকারী। মহানত্ব সেই পবিত্র সত্তারই বৈশিষ্ট্য। এ চূড়ান্ত সত্যকে হৃদয়ংগম করানোর জন্য কুরআনে আল্লাহ তাআলা এ গুণটিকে বার বার উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ

১. تَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

২. تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا

৩. تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

৪. سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ

৫. سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ

আল বাররু : اَلْبَرُّ, আল বারু : اَلْبَارُ

অর্থ : অতিশয় পরোপকারী

ব্যাখ্যা : সূরা আত্ তূর-এ ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ○ - الطور : ٢٨

"সত্যিই তিনি অতি বড় উপকারী ও দয়াবান।"—সূরা আত্ তূর : ২৮

সূরা ইবরাহীমের ৩২ থেকে ৩৪ আয়াতে বলা হয়েছে :

"আল্লাহ তো তিনিই, যিনি এ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তার মাধ্যমে তোমাদের জীবিকা দান করার জন্য নানা প্রকার ফল উৎপন্ন করেছেন। যিনি নৌযানকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর হুকুমে তা সাগরে বিচরণ করে এবং নদীসমূহকে তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, তারা অবিরাম চলছে এবং রাত ও দিনকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। যিনি এমন সবকিছু তোমাদের দিয়েছেন যা তোমরা চেয়েছো। যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও তাহলে তাতে সক্ষম হবে না। আসলে মানুষ বড়ই বেইনসাফ ও অকৃতজ্ঞ।"

অর্থাৎ তোমাদের প্রকৃতির সর্ববিধ চাহিদা পূরণ করেছেন। তোমাদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই সরবরাহ করেছেন। তোমাদের বেঁচে থাকা ও বিকাশ লাভ করার জন্য যেসব উপাদান ও উপকরণের প্রয়োজন ছিল তা সবই যোগাড় করে দিয়েছেন।[৩৪০]

○

সূরা আন নাহলের ৪ থেকে ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে :

"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ছোট্ট একটি ফোঁটা থেকে। তারপর দেখতে দেখতে সে এক কলহপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য পোশাক, খাদ্য এবং অন্যান্য নানাবিধ উপকারিতাও। তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য

সৌন্দর্য, যখন সকালে তোমরা তাদেরকে চারণভূমিতে পাঠাও এবং সন্ধ্যায় তাদেরকে ফিরিয়ে অনো। তারা তোমাদের জন্য বোঝা বহন করে এমন সব জায়গায় নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা কঠোর প্রাণান্ত পরিশ্রম না করে পৌঁছুতে পারো না। আসলে তোমার রব বড়ই স্নেহশীল ও করুণাময়। তোমাদের আরোহণ করার এবং তোমাদের জীবনের শোভা-সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। তিনি (তোমাদের উপকারার্থে) আরো অনেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো তোমরা জানোই না। আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে সেখানে সোজা পথ দেখাবার দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই বর্তেছে। তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে সত্য-সোজা পথে পরিচালিত করতেন।

তিনিই আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন, যা পান করে তোমরা নিজেরাও পরিতৃপ্ত হও এবং যার সাহায্যে তোমাদের পশুদের জন্যও খাদ্য উৎপন্ন হয়। এ পানির সাহায্যে তিনি শস্য উৎপন্ন করেন এবং যয়তুন, খেজুর, আংগুর ও আরো নানাবিধ ফল জন্মান। এর মধ্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য রয়েছে একটি বড় নিদর্শন।

তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করে রেখেছেন এবং সমস্ত তারকাও তাঁরই হুকুমে বশীভূত রয়েছে। যারা বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে প্রচুর নিদর্শন। আর এই যে বহু রং বেরংয়ের জিনিস তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করে রেখেছেন এগুলোর মধ্যেও অবশ্যি নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

তিনিই তোমাদের জন্য সাগরকে করায়ত্ত করে রেখেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তরতাজা গোশ্ত নিয়ে খাও এবং তা থেকে এমন সব সৌন্দর্য সামগ্রী আহরণ করো যা তোমরা অংগের ভূষণরূপে পরিধান করে থাকো। তোমরা দেখছো, সমুদ্রের বুক চিরে নৌযান চলাচল করে। এসব এ জন্য, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো।

তিনি পৃথিবীতে পাহাড়সমূহ গেড়ে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে। তিনি নদী প্রবাহিত করেছেন এবং প্রাকৃতিক পথ নির্মাণ করেছেন, যাতে তোমরা গন্তব্যে পৌঁছতে পারো। তিনি ভূপৃষ্ঠে পথনির্দেশক চিহ্নসমূহ রেখে দিয়েছেন এবং তারকার সাহায্যেও মানুষ পথের সন্ধান পায়।"

এরপর এ সূরারই ৭৮ থেকে ৮১ আয়াতে বলা হচ্ছে ঃ

"আল্লাহ তোমাদের মায়ের পেট থেকে তোমাদের বের করেছেন এমন অবস্থায় যখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, চিন্তা-ভাবনা করার মত হৃদয় দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

এরা কি কখনো পাখিদের দেখেনি, আকাশ নিঃসীমে কিভাবে তারা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে ? আল্লাহ ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রেখেছে ? এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান আনে তাদের জন্য।

আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরগুলোকে বানিয়েছেন শান্তির আবাস। তিনি পশুদের চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমনসব ঘর তৈরী করে দিয়েছেন যেগুলোকে তোমরা সফর ও স্বগৃহে অবস্থান উভয় অবস্থায়ই সহজে বহন করতে পারো। তিনি পশুদের পশম, লোম ও চুল থেকে তোমাদের জন্য পরিধেয় ও ব্যবহার সামগ্রীসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা জীবনের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের কাজে লাগবে।

তিনি নিজের সৃষ্ট বহু জিনিস থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়ে তোমাদের জন্য আশ্রয় তৈরী করেছেন এবং তোমাদের এমন পোশাক দিয়েছেন, যা তোমাদের গরম থেকে বাঁচায় আবার এমন কিছু অন্যান্য পোশাক তোমাদের দিয়েছেন যা পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদের হেফাজত করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করেন, হয়তো তোমরা অনুগত হবে।"

বান্দা আল্লাহর দেয়া যেসব নিয়ামত ভোগ করছে সেসব নিয়ামত সম্পর্কে তারা এ ধারণা পোষণ করে যে, তা কারো দেয়া নয়, বরং সে এমনিই তা লাভ করেছে। কিংবা এসব নিয়ামত আল্লাহর দান নয়, বরং নিজের যোগ্যতা ও সৌভাগ্যের ফল। অথবা একথা মনে করা যে, এসব নিয়ামত আল্লাহর দান বটে, কিন্তু সেই আল্লাহর তাঁর বান্দার ওপর কোনো অধিকার নেই। অথবা আল্লাহ নিজে তার প্রতি এসব অনুগ্রহ দেখাননি। বরং অন্য কোনো সত্তা তাকে দিয়ে তা করিয়েছেন। এসব ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে মানুষ আল্লাহ বিমুখ এবং তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পৃথিবীতে এমন সব কাজ-কর্ম করে, যা আল্লাহ করতে নিষেধ করেছেন এবং সেসব কাজ করে না, যা আল্লাহ করতে আদেশ দিয়েছেন। এ বিচারে প্রতিটি অপরাধ ও প্রতিটি গোনাহ মূলগতভাবে আল্লাহ তাআলার দান ও অনুগ্রহের অস্বীকৃতি ও অবমাননা। এ ক্ষেত্রে কেউ মুখে

তা মানুক বা অস্বীকার করুক তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু প্রকৃতই যে ব্যক্তি অস্বীকৃতি ও অবমাননার ইচ্ছা ও মনোবৃত্তি পোষণ করে না, বরং তার মনের গভীরে তার সত্য হওয়ার বিশ্বাস সদা বর্তমান, মানবিক দুর্বলতার কারণে কোনো সময় তার দ্বারা ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তা থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। এ জিনিসটি তাকে অস্বীকারকারীদের অন্তরভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়া আর সব অপরাধীই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ অবিশ্বাসকারী এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহসমূহ অস্বীকারকারী। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ যখন তোমরা অপরাধী হিসেবে ধরা পড়বে তখন আমি দেখবো তোমরা আমার কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করছো। একথাটিই সূরা "তাকাসূরে" এভাবে বলা হয়েছে ঃ لَتُسْـئَلُنَّ يَوْمَـئِـذٍ عَنِ النَّعِـيْمِ। "তোমাদেরকে যেসব নিয়ামত দেয়া হয়েছিল সেদিন ঐগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" অর্থাৎ জিজ্ঞেস করা হবে, আমিই তোমাদেরকে এসব নিয়ামত দিয়েছিলাম কিনা। ঐসব নিয়ামত লাভ করার পর তোমরা তোমাদের অনুগ্রহকারীর প্রতি কি আচরণ করেছিলে, আর ঐসব নিয়ামতকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছিলে ?[৩৪১]

○

সমস্ত নিয়ামত তাঁরই সৃষ্টি এবং সমস্ত সৃষ্টিরও প্রকৃত উপকারী ও কল্যাণ দাতাও তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। অন্য কোনো ব্যক্তি বা শক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিয়ামত আমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন। অন্যথায় সে যে নিয়ামতের স্রষ্টা নয়, তেমনি আল্লাহর দেয়া তাওফীক ও সামর্থ ছাড়া সে ঐ নিয়ামত আমাদের কাছে পৌছাতেও সক্ষম হতো না।[৩৪২]

○

(৯৩)

আত তাওয়াবু ঃ اَلتَّوَّابُ

অর্থ ঃ অত্যধিক তাওবা কবুলকারী, অত্যধিক ক্ষমাকারী।

ব্যাখ্যা ঃ তাওবার আসল অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা। বান্দার পক্ষ থেকে তাওবার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে সীমালংঘন ও বিদ্রোহের পথ পরিহার করে বন্দেগীর পথে পা বাড়িয়েছেন। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওবা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজের লজ্জিত ও অনুতপ্ত দাসের প্রতি অনুগ্রহ সহকারে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং বান্দার প্রতি তাঁর দান পুনর্বার বর্ষিত হতে শুরু করেছে।[৩৪৩]

○

গুনাহ করার পর বান্দার আল্লাহর কাছে তাওবা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, যে দাসটি তার প্রভুর নাফরমান ও অবাধ্য হয়ে প্রভুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সে এখন নিজের কার্যকলাপে অনুতপ্ত। সে প্রভুর আনুগত্য করার ও তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য ফিরে এসেছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার দিকে তাওবা করার মানে হচ্ছে এই যে, দাসের ওপর থেকে প্রভুর যে অনুগ্রহ দৃষ্টি সরে গিয়েছিল তা আবার নতুন করে তার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে। মহান আল্লাহ এ আয়াতে বলেন, আমার এখানে ক্ষমার দরজা একমাত্র সেইসব বান্দার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে, যারা ইচ্ছা করে নয় বরং অজ্ঞতার কারণে ভুল করে বসে এবং চোখের ওপর থেকে অজ্ঞতার পর্দা সরে গেলে লজ্জিত হয়ে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়। এহেন বান্দা তার ভুল বুঝতে পেরে যখনই প্রভু মহান রাব্বুল আলামীনের দিকে ফিরে আসবে তখনই নিজের জন্য তাঁর দরজা উন্মুক্ত দেখতে পাবে ঃ

این درگه ما درگه نومیدی نیست
صد بار اگر توبه شکستی بازا ابازا

"আমার এ দরবারে আশা ভংগ হয় না কারো
শতবার ভেঙেছো তাওবা, তবু তুমি ফিরে এসো, ফিরে এসো।"

কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় না করে সারা জীবন বেপরোয়াভাবে গুনাহ করতে থাকে তারপর ঠিক যখন মৃত্যুর ফেরেশতা সামনে এসে দাঁড়ায়

তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে, তাদের জন্য কোনো তাওবা নেই, তাদের গুনাহের কোনো ক্ষমা নেই। এ বিষয়টিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ -

"আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করতে থাকেন যতক্ষণ মৃত্যুর আলামত দেখা না দেয়।" কারণ পরীক্ষার সময় উত্তীর্ণ হবার এবং জীবন গ্রন্থের সব পাতা শেষ হয়ে যাবার পর এখন আর ফিরে আসার সুযোগটাই বা কোথায় ? এভাবে কোনো ব্যক্তি যখন কুফরীর অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় এবং পরবর্তী জীবনের সীমানায় প্রবেশ করে নিজের চোখেই সবকিছু প্রত্যক্ষ করে, দুনিয়ায় সে যাকিছু ভেবে এসেছিল এখন দেখছে আসল ব্যাপার তার সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন তার ক্ষমা চাওয়ার কোনো সুযোগই তো আর থাকে না।[৩৪৪]

○

গোনাহর ফল অনিবার্য এবং মানুষকে তা ভোগ করতেই হবে, কুরআন এ মতবাদ খণ্ডন করে। এটা মানুষের মনগড়া ভুল মতবাদগুলোর মধ্যে একটি বড়ই বিভ্রান্তিকর মতবাদ। কারণ যে ব্যক্তি একবার গোনাহে লিপ্ত হয়েছে এ মতবাদ তাকে চিরকালের জন্য হতাশার সাগরে নিক্ষেপ করে। একবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে ঐ ব্যক্তি যদি তার অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় এবং ভবিষ্যতে সৎ-সুন্দর জীবন যাপন করতে আগ্রহী হয়, তাহলে এ মতবাদ তাকে বলে, তোমার বাঁচার কোনো আশা নেই, যা কিছু তুমি করে এসেছো তার ফল অবশ্যি তোমাকে ভোগ করতে হবে। এর বিপরীত পক্ষে কুরআন বলে, সৎকাজের পুরস্কার ও অসৎকাজের শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। তোমরা যে সৎকাজের পুরস্কার পাও সেটা তোমাদের সৎ কাজের স্বাভাবিক ফল নয়, সেটা আল্লাহর দান। তিনি চাইলে দান করতে পারেন, চাইলে নাও করতে পারেন। অনুরূপভাবে তোমরা যে অসৎকাজের শাস্তি লাভ করো সেটা তোমাদের অসৎকাজের অনিবার্য ফল নয়। বরং এ ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রয়েছে। তিনি চাইলে ক্ষমা করতে এবং চাইলে শাস্তি দিতে পারেন। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত তাঁর জ্ঞানের সাথে গভীর সূত্রে আবদ্ধ। তিনি জ্ঞানী হবার কারণে তাঁর ক্ষমতা কর্তৃত্ব অন্ধের মতো ব্যবহার করেন না। কোনো সৎকাজের পুরস্কার দেয়ার সময় বান্দা আন্তরিকতা সহকারে, সাচ্চা নিয়তে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এ

সৎকাজটি করেছে, এ দিকটি বিবেচনা করেই তিনি তাকে পুরস্কৃত করেন। আর কোনো সৎকাজকে প্রত্যাখ্যান করলে এ উদ্দেশ্যে করেন যে, তার বাইরের রূপটি ছিল ঠিক সৎকাজের মতোই কিন্তু তার ভেতরে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নির্ভেজাল প্রেরণা ও ভাবধারা কার্যকর ছিল না। অনুরূপভাবে বিদ্রোহাত্মক ধৃষ্টতা সহকারে কোনো অসৎকাজ করা হলে তার পেছনে যদি লজ্জার মনোভাবের পরিবর্তে আরো বেশী অপরাধ করার প্রবণতা সক্রিয় থাকে তাহলে এ ধরনের অপরাধের তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন। আর যে অসৎকাজ করার পর বান্দা লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতে নিজের সংশোধন প্রয়াসী হয় এ ধরনের অসৎকাজের ত্রুটি তিনি নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেন। মারাত্মক ধরনের অপরাধী কট্টর কাফেরের জন্যও আল্লাহর দরবার থেকে নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, সে যদি তার অপরাধ স্বীকার করে, নিজের নাফরমানির জন্য লজ্জিত হয় এবং বিদ্রোহের মনোভাব ত্যাগ করে আনুগত্যের পথে এগিয়ে চলতে প্রস্তুত হয়, তাহলে আল্লাহ তার গোনাহ ও ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন।[৩৪৫]

○

সত্যিকার তাওবার অনিবার্য দাবী হচ্ছে কোনো ব্যক্তি পূর্বে যে অন্যায় করেছে নিজের সাধ্যমত তার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করবে। যে ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের কোনো উপায় বের করা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং নিজের ওপর যে কলংক লেপন করেছে তা পরিষ্কার করতে থাকবে। তবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য না থাকলে কোনো তাওবাই সত্যিকার তাওবা নয়। অন্য কোনো কারণে বা উদ্দেশ্যে কোনো খারাপ কাজ পরিত্যাগ করা আদৌ তাওবার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।[৩৪৬]

○

হযরত কা'ব বিন মালিক, হেলাল বিন উমাইয়াহ এবং মুরারাহ বিন রুবাঈ (রা) তাবুক যুদ্ধে মানবিক দুর্বলতার কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

এ সাহাবীগণ আল্লাহর দরবার থেকে যে ক্ষমা লাভ করেছিলেন এবং সেই ক্ষমার কথা বর্ণনা করার ভাষার মধ্যে যে স্নেহ ও করুণা ধারা প্রবাহিত হচ্ছে তার মূলে রয়েছে তাঁদের আন্তরিকতা। পঞ্চাশ দিনের কঠোর শাস্তি ভোগকালে তারা এ আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। ভুল

করার পর যদি তারা অহংকার করতেন, নিজেদের নেতার অসন্তোষের জবাবে ক্রোধ ও ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাতেন, শাস্তিলাভের ফলে এমনই বিক্ষুব্ধ হতেন যেমন স্বার্থবাদী লোকদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সামাজিক বয়কটকালে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে রাজি, কিন্তু নিজের আত্মাভিমানকে আহত করতে রাজি নই—এ নীতি অবলম্বন করতেন এবং যদি এ সমগ্র শাস্তিকালে দলের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে বেড়াতেন, তাহলে তাদের ক্ষমা করা তো দূরের কথা বরং নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, দল থেকে তাদেরকে আলাদা করে দেয়া হতো এবং এ শাস্তির মেয়াদ শেষ হবার পর তাদের যোগ্য শাস্তিই তাদেরকে দেয়া হতো। তাদেরকে বলা হতো, যাও তোমরা নিজেদের অহম পূজায় লিপ্ত থাকো। সত্যের কালেমা বুলন্দ করার সংগ্রামে অংশ নেবার সৌভাগ্য তোমাদের আর কখনো হবে না।

কিন্তু এ কঠিন পরীক্ষায় ঐ তিনজন সাহাবী এ পথ অবলম্বন করেননি, যদিও এ পথটি তাদের জন্য খোলা ছিল। তারা বরঞ্চ আমাদের আলোচিত পূর্বোক্ত পথ অবলম্বন করেছিলেন। এ পথ অবলম্বন করে তারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর আনুগত্যের নীতি তাদের হৃদয় থেকে পূজা ও বন্দনা করার মতো সকল মূর্তি অপসারিত করেছে। নিজেদের সমগ্র ব্যক্তিসত্তাকে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম সাধনা করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন। নিজেদের ফিরে যাবার নৌকাগুলোকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দিয়ে ইসলামী জামায়াতে প্রবেশ করেছিলেন যে, পেছনে ফিরে যেতে চাইলেও আর ফেরার কোনো জায়গা ছিল না। এখানেই মার খাবেন এবং এখানেই মরবেন। অন্য কোথাও কোনো বৃহত্তম সম্মান ও মর্যাদা লাভের নিশ্চয়তা পেলেও এখানকার লাঞ্ছনা ত্যাগ করে তা গ্রহণ করতে এগিয়ে যাবেন না। এরপর তাদেরকে উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে না ধরে আর কী করা যেতো ? এ কারণেই আল্লাহ তাদের ক্ষমার কথা বলেছেন অত্যন্ত স্নেহমাখা ভাষায়। তিনি বলেছেন, "আমি তাদের দিকে ফিরলাম যাতে তারা আমার দিকে ফিরে আসে।" এ কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে এমন একটি অবস্থার ছবি আঁকা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায় যে, প্রভু আগে ঐ বান্দাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু যখন তারা পালিয়ে না গিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে তাঁরই দোরগোড়ায় বসে পড়লো তখন তাদের বিশ্বস্ততার চিত্র দেখে প্রভু নিজে আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রেমের আবেগে অধীর হয়ে তাকে দরজা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি নিজেই বের হয়ে এলেন।[৩৪৭]

○

আবু লুবাবা বিন আবদিল মুনযির ও তার ছয়জন সাথীর অবস্থাও অনুরূপ ছিল। আবু লুবাবা ছিলেন তাদের একজন। বদর, ওহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে তিনি বরাবর অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের সময় মানবিক দুর্বলতা তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং কোনো প্রকার শরয়ী ওযর ছাড়াই তিনি ঘরে বসে থাকেন। তার অন্য সাথীরাও ছিলেন তারই মতো আন্তরিকতা সম্পন্ন। তারাও এ একই প্রকার দুর্বলতার শিকার হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুক অভিযান থেকে ফিরে এলেন এবং যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মতামত কি তা তারা জানতে পারলেন তখন তাঁরা ভীষণভাবে অনুতপ্ত হলেন। কোনো প্রকার জিজ্ঞাসাবাদের আগেই তাঁরা নিজেদেরকে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে নেন এবং বলেন, আমাদের মাফ না করে দেয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য আহার-নিদ্রা হারাম। এ অবস্থায় আমাদের প্রাণবায়ু বের হয়ে গেলেও আমরা তার পরোয়া করবো না। কয়েক দিন পর্যন্ত এভাবেই তারা বাঁধা অবস্থায় অনাহার অনিদ্রায় কাটান। এমনকি একদিন তারা বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। শেষে তাদের জানানো হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, ঘরের যে আরাম আয়েশ আমাদের ফরয থেকে গাফেল করে দিয়েছিল তা এবং নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ আমরা আল্লাহর পথে দান করে দেবো, এটাও আমাদের তাওবার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সমস্ত ধন-সম্পদ দান করে দেবার দরকার নেই, শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। তদনুসারে তখনই তারা সেগুলো আল্লাহর পথে ওয়াক্‌ফ করে দেন। এ ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার জানা যায়, কোন্ ধরনের দুর্বলতা আল্লাহ মাফ করেন। উল্লিখিত মহান সাহাবীগণ এ ধরনের আন্তরিকতাহীন আচরণে অভ্যস্ত ছিলেন না। বরং তাঁদের বিগত জীবনের কার্যকলাপ তাঁদের ঈমানী নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ ছিল এবারেও রাসূল (সা)-এর নিকট তাঁদের কেউ মিথ্যা অজুহাত পেশ করেননি। বরং নিজেদের ভুলকে নিজেরাই অকপটে ভুল হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তাঁরা ভুলের স্বীকারোক্তি সহকারে নিজেদের কার্যধারার মাধ্যমে একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁরা যথার্থই লজ্জিত হয়েছেন এবং নিজেদের গোনাহ মাফ করবার জন্য অত্যন্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন।

গোনাহ মাফের জন্য মুখ ও অন্তর দিয়ে তাওবা করার সাথে সাথে বাস্তব কাজের মাধ্যমেও তাওবা করতে হবে। আর আল্লাহর পথে ধন-

সম্পদ দান করা হচ্ছে বাস্তব তাওবার একটি পদ্ধতি। এভাবে নফসের মধ্যে যে দূষিত ময়লা আবর্জনা লালিত হচ্ছিল এবং যার কারণে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হয়েছিল তা দূর হয়ে যায় এবং ভালো ও কল্যাণের দিকে ফিরে যাবার যোগ্যতা বেড়ে যায়। গোনাহ করার পর তা স্বীকার করার ব্যাপারটি এমন যেমন এক ব্যক্তি গর্তের মধ্যে পড়ে যায় এবং নিজের পড়ে যাওয়াটা সে অনুভব করতে পারে। তারপর নিজের গোনাহের ওপর তার লজ্জিত হওয়াটা এ অর্থ বহন করে যে, এ গর্তকে সে নিজের অবস্থানের জন্য বড়ই খারাপ জায়গা মনে করে এবং এ জন্য ভীষণ কষ্ট অনুভব করতে থাকে। এরপর সাদ্‌কা, দান-খয়রাত এবং অন্যান্য সৎকাজের মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ করার প্রচেষ্টা চালানোর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, সে গর্ত থেকে বের হয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছে এবং হাত-পা ছুঁড়ছে।[৩৪৮]

○

অপরাধকারীও যদি তাওবা করে নিজের নীতি সংশোধন করে নেয় এবং খারাপ কাজের জায়গায় ভালো কাজ করতে থাকে, তাহলে আমার কাছে তার জন্য উপেক্ষা ও ক্ষমা করার দরজা খোলাই আছে। প্রসংগক্রমে একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল একদিকে সতর্ক করা এবং অন্যদিকে সুসংবাদ দেয়া। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অজ্ঞতাবশত একজন কিবতীকে হত্যা করে মিসর থেকে বের হয়েছিলেন। এটি ছিল একটি ত্রুটি। এদিকে সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়। এ ত্রুটিটি যখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল তখন তিনি পরক্ষণেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এই বলে ঃ

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ -

"হে আমার রব! আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আমাকে মাফ করে দাও।"

আল্লাহ সাথে সাথেই তাঁকে মাফ করে দিয়েছিলেন ঃ فَغَفَرَلَهٗ "আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দিলেন।"[৩৪৯]–সূরা আল কাসাস ঃ ১৬

○

গোনাহগার বান্দার তাওবা কবুল করা এবং তাকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে জান্নাত দান করা আল্লাহর জন্য ওয়াজিব নয়। বরং তিনি যদি মাফ করে দেন এবং পুরস্কারও দেন তাহলে তা হবে সরাসরি তাঁর দয়া ও

মেহেরবানী। বান্দার তাঁর ক্ষমালাভের আশা অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু তাওবা করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে এ ভরসায় গোনাহ্ করা উচিত নয়।[৩৫০]

○

এরপর অবশিষ্ট থাকে তাওবায়ে নাসূহ্ এর শরয়ী অর্থ। আমরা এর শরয়ী অর্থের ব্যাখ্যা পাই যির ইবনে হুবাইশের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে। যির ইবনে হুবাইশ বলেন ঃ আমি উবাই ইবনে কা'বের (রা) কাছে 'তাওবায়ে নাসূহাহ্'-এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একই প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, কখনো তোমার দ্বারা কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তুমি নিজের গোনাহর জন্য লজ্জিত হও। তারপর লজ্জিত হয়ে সেজন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং ভবিষ্যতে আর কখনো ঐ কাজ করো না। হযরত উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে মাসউদ (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এ অর্থই উদ্ধৃত হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে হযরত উমর (রা) 'তাওবায়ে নাসূহাহ'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে ঃ তাওবার পরে পুনরায় গোনাহ্ করা তো দূরের কথা তা করার আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত করবে না। (ইবনে জারীর)

হযরত আলী (রা) একবার এক বেদুঈনকে মুখ থেকে ঝটপট করে তাওবা ও ইসতিগফার শব্দ উচ্চারণ করতে দেখে বললেন, এতো মিথ্যাবাদীদের তাওবা। সে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে সত্যিকার তাওবা কি? তিনি বললেন ঃ সত্যিকার তাওবার সাথে ছয়টি জিনিস থাকতে হবে–(১) যা কিছু ঘটেছে তার জন্য লজ্জিত হও। (২) নিজের যে কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে গাফলতি করেছো তা সম্পাদন কর। (৩) যার হক নষ্ট করেছো তা তাকে ফিরিয়ে দাও। (৪) যাকে কষ্ট দিয়েছো তার কাছে মাফ চাও। (৫) প্রতিজ্ঞা করো ভবিষ্যতে এ গোনাহ্ আর করবে না এবং (৬) নফসকে এতদিন পর্যন্ত যেভাবে গোনাহ্র কাজে অভ্যস্ত করেছো ঠিক তেমনি আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত কর। এতদিন পর্যন্ত নফসকে যেভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার মজায় নিয়োজিত রেখেছিলে এখন তাকে তেমনি আল্লাহর আনুগত্যের তিক্ততা আস্বাদন করাও।–কাশ্শাফ

তাওবা সম্পর্কিত বিষয়ে আরো কয়েকটি জিনিস ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। প্রথমত, প্রকৃতপক্ষে তাওবা হচ্ছে কোনো গোনাহর কারণে এ জন্য লজ্জিত হওয়া যে, তা আল্লাহর নাফমানী। কোনো গোনাহর কাজ

স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বদনামের কারণ অথবা আর্থিক ক্ষতির কারণ হওয়ায় তা থেকে বিরত থাকার সংকল্প করা তাওবার সংজ্ঞায় পড়ে না। দ্বিতীয়ত, যখনই কেউ বুঝতে পারবে যে, তার দ্বারা আল্লাহর নাফরমানী হয়েছে, তার উচিত তৎক্ষণাৎ তাওবা করা এবং যেভাবেই হোক অবিলম্বে তার ক্ষতিপূরণ করা কর্তব্য, তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। তৃতীয়ত, তাওবা করে বারবার তা ভঙ্গ করা, তাওবাকে খেলার বস্তু বানিয়ে নেয়া এবং যে গোনাহ্ থেকে তাওবা করা হয়েছে বার বার তা করতে থাকা তাওবা মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ। কেননা, তাওবার প্রাণসত্তা হচ্ছে কৃত গোনাহ সম্পর্কে লজ্জিত হওয়া। কিন্তু বার বার তাওবা ভঙ্গ করা প্রমাণ করে যে, তার মধ্যে লজ্জার অনুভূতি নেই। চতুর্থত, যে ব্যক্তি সরল মনে তাওবা করে পুনরায় ঐ গোনাহ্ না করার সংকল্প করেছে মানবিক দুর্বলতার কারণে যদি পুনরায় তার দ্বারা সেই গোনাহর পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে এক্ষেত্রে পূর্বের গোনাহ পুনরুজ্জীবিত হবে না, তবে পরবর্তী গোনাহর জন্য তার পুনরায় তাওবা করা উচিত এবং ভবিষ্যতে সে আর তাওবা ভঙ্গ করবে না, এ ব্যাপারে কঠোর সংকল্প করা উচিত। পঞ্চমত, যখনই গোনাহর কথা মনে পড়বে তখনই নতুন করে তাওবা করা আবশ্যক নয়। কিন্তু তার প্রবৃত্তি যদি পূর্বের পাপময় জীবনের স্মৃতিচারণ করে আনন্দ পায় তাহলে গোনাহর স্মৃতিচারণ তাকে আনন্দ দেয়ার পরিবর্তে লজ্জাবোধ সৃষ্টির কারণ না হওয়া পর্যন্ত তার বারবার তাওবা করা উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি সত্যিই আল্লাহর ভয়ে গোনাহ থেকে তাওবা করেছে সে অতীতে আল্লাহর নাফরমানী করেছে এই চিন্তা করে কখনো আনন্দ অনুভব করতে পারে না। তা থেকে মজা পাওয়া ও আনন্দ অনুভব করা প্রমাণ করে যে, তার মনে আল্লাহর ভয় শিকড় গাড়তে পারেনি।[৩৫১]

○

আল মুনতাকিমু ঃ اَلْمُنْتَقِمُ

অর্থ ঃ প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আস সাজদায় বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ط اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ○

"আর তার চেয়ে বড় যালেম কে হবে যাকে তার রবের আয়াতের সাহায্যে উপদেশ দেয়া হয় এবং সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ? এ ধরনের অপরাধীদের থেকে তো আমি প্রতিশোধ নেবোই।"

–সূরা আস সাজদাহ ঃ ২২

"রবের আয়াত" অর্থাৎ তাঁর নিদর্শনাবলী। এ শব্দগুলো বড়ই ব্যাপক অর্থবোধক। সব ধরনের নিদর্শন এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কুরআন মজীদের সমস্ত বর্ণনা দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে জানা যায় যে, এ নিদর্শনাবলী নিম্নোক্ত ছয় প্রকারের ঃ

এক ঃ যে নিদর্শনাবলী পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের এবং বিশ্বজাহানের সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায়।

দুই ঃ যে নিদর্শনগুলো মানুষের নিজের জন্ম এবং তার গঠনাকৃতি ও অস্তিত্বের মধ্যে পাওয়া যায়।

তিন ঃ যে নিদর্শনাবলী মানুষের স্বতস্ফূর্ত অনুভূতিতে, তার অচেতন ও অবচেতন মনে এবং তার নৈতিক চিন্তাধারায় পাওয়া যায়।

চার ঃ যে নিদর্শনাবলী পাওয়া যায় মানুষের ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায়।

পাঁচ ঃ যে নিদর্শনাবলী মানুষের প্রতি অবতীর্ণ পার্থিব আপদ-বিপদ ও আসমানী বালা-মুসিবতের মধ্যে পাওয়া যায়।

ছয় ঃ আর এসবের পরে আল্লাহ তাঁর নবীগণের মাধ্যমে যেসব আয়াত পাঠান ও পরে বর্ণিত নিদর্শনগুলো যেসব সত্যের প্রতি ইংগিত করেছে এ আয়াতগুলোর সাহায্যে যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে মানুষকে সেসব সত্যের জ্ঞানদান করাই কাম্য।

এ সমস্ত নিদর্শন পূর্ণ একাত্মতা সহকারে সোচ্চার কণ্ঠে মানুষকে একথা বলে যাচ্ছে যে, তুমি মনিবহীন নও এবং বহু সংখ্যক মনিবের বান্দাও নও বরং তোমার মনিব মাত্র একজন। তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্য ছাড়া তোমার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

তোমাকে এ জগতে স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন করে পাঠানো হয়নি। বরং নিজের জীবনের সমস্ত কাজ শেষ করার পর তোমাকে তোমার আল্লাহর সামনে হাযির হয়ে জবাবদিহি করতে এবং নিজের কাজের প্রেক্ষিতে পুরস্কার ও শাস্তি পেতে হবে। কাজেই তোমার আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য নিজের নবী ও কিতাবসমূহের মাধ্যমে যে পথনির্দেশনা পাঠিয়েছেন তা মেনে চলো এবং স্বেচ্ছাচারী নীতি অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকো। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, মানুষকে এত বিভিন্নভাবে বুঝানো হয়েছে, যাকে উপদেশ দেবার ও পরিচালনা করার জন্য এমন অগণিত নিদর্শনাবলীর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এবং যাকে দেখার জন্য চোখ, শোনার জন্য কান এবং চিন্তা করার জন্য অন্তরের নিয়ামত দান করা হয়েছে। সে যদি সমস্ত নিদর্শনাবলীর দিক থেকে চোখ বন্ধ করে নেয়, যারা বুঝাচ্ছে তাদের কথা ও উপদেশের জন্যও নিজের কানের ছিদ্র বন্ধ করে নেয় এবং নিজের মনমস্তিষ্ক দিয়েও উল্টা দর্শনই তৈরি করার কাজে আত্মনিয়োগ করে, তাহলে তার চেয়ে বড় যালেম আর কেউ হতে পারে না। এরপর সে দুনিয়ায় নিজের পরীক্ষার মেয়াদ খতম করার পর যখন তার আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে তখন বিদ্রোহের পূর্ণ শাস্তি লাভ করার যোগ্যই হবে।[৩৫২]

○

সূরা আয্ যুখরুফে আল্লাহ বলেন ঃ

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ـ الزخرف : ٤١

"এখন তো আমাকে এদের শাস্তি দিতেই হবে, চাই তোমাকে আমি দুনিয়া থেকে উঠিয়েই নেই না কেন।"–সূরা আয্ যুখরুফ ঃ ৪১

মক্কার কাফেররা মনে করছিলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিসত্তাই তাদের জন্য বিপদ হয়ে আছে। মাঝপথ থেকেই এ কাঁটা সরিয়ে দিতে পারলেই তাদের সবকিছু সুন্দর ও ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কোনো না কোনোভাবে তাঁকে হত্যা করার জন্য তারা রাত দিন বসে বসে পরামর্শ করতো। এতে আল্লাহ তাদের দিক

থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁর নবীকে উদ্দেশ করে বলছেন ঃ তোমার সামনেই তাদের দুর্ভাগ্য নেমে আসবে। আর যদি তোমাকে উঠিয়ে নেয়া হয় তাহলে তোমার বিদায়ের পরে তাদের দফা রফা হবে। অশুভ কর্মফল এখন তাদের ভাগ্যের লিখন হয়ে গিয়েছে। এর হাত থেকে তাদের পক্ষে রক্ষা পাওয়া আর সম্ভব নয়।[৩৫৩]

○

সূরা আদ্ দুখানে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ○ - الدخان : ١٦

"যেদিন আমি বড় আঘাত করবো, সেদিন আমি তোমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।"–সূরা আদ দুখান ঃ ১৬

কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করো। সেই সময় যখন দুর্ভাগ্য ষোলকলায় পূর্ণ হবে তখন তোমরা ঠিকই বুঝতে পারবে, হক কি আর বাতিল কি?[৩৫৪]

○

সূরা আলে ইমরানে এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

"এখন যারা আল্লাহর বিধানসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তারা অবশ্যি কঠিন শাস্তি পাবে। আল্লাহ অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি অন্যায়ের শাস্তি দিয়ে থাকেন।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৪

সূরা ইবরাহীমে বলা হয়েছে ঃ

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

"কাজেই হে নবী ! কখ্খনো এ ধারণা করো না যে, আল্লাহ তাঁর নবীদের প্রতি প্রদত্ত ওয়াদার বিরুদ্ধাচরণ করবেন। আল্লাহ প্রতাপান্বিত ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৪৭

এ বাক্যে আপাতদৃষ্টে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আসলে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর বিরোধীদেরকে শুনানো। তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ পূর্বেই তাঁর রসূলদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ করেছেন এবং তাঁদের বিরোধীদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন। আর এখনও নিজের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সাথে তিনি যে ওয়াদা করছেন তা পূর্ণ করবেন এবং যারা এর বিরোধিতা করছে তাদেরকে বিধ্বস্ত করে দেবেন।[৩৫৫]

মুসলমানরা তাদের সংখ্যাল্পতা ও সমরাস্ত্রের অভাব সত্ত্বেও যেভাবে কাফেরদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ও উন্নত অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত সেনাদলের ওপর বিজয় লাভ করলো তাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, তারা আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট ছিল।

আল্লাহর প্রবল প্রতাপান্বিত ক্ষমতা সম্পর্কে গাফেল হয়ে যারা নিজেদের সাজ-সরঞ্জাম ও সমর্থকদের সংখ্যাধিক্যের কারণে আত্মম্ভরিতায় মেতে উঠেছিল, তাদের জন্য এ ঘটনাটি ছিল যথার্থই একটি চাবুকের আঘাত। আল্লাহ কিভাবে মাত্র গুটিকয় বিত্তহীন, অভাবী ও প্রবাসী মুহাজির এবং মদীনার কৃষক সমাজের মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর সহায়তায় কুরাইশদের মতো অভিজাত, শক্তিশালী ও সমগ্র আরবীয় সমাজের মধ্যমণি গোত্রকে পরাজিত করতে পারেন, তা তারা স্বচক্ষেই দেখে নিল।[৩৫৬]

○

সূরা আর রূমে বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاۤءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ط وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ○ - الروم : ٤٧

"আমি তোমার পূর্বে রসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাই এবং তাঁরা তাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে আসে। তারপর যারা অপরাধ করে তাদের থেকে আমি প্রতিশোধ নিই আর মুমিনদেরকে সাহায্য করা ছিল আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।"
–সূরা আর রূম ঃ ৪৭

সূরা আল হিজর-এ এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ○ۙ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ م - الحجر : ٧٨-٧٩

"আর আইকাবাসীরা যালিম ছিল। কাজেই দেখে নাও আমিও তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি।"–সূরা আল হিজর ঃ ৭৮-৭৯

আল আফুউয়্যু ঃ اَلْعَفُوُّ

অর্থ ঃ ক্ষমাকারী, নম্রতা ও উদারতা প্রদর্শনকারী।

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○ - الحج : ٦٠

"আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, আল্লাহ গোনাহ মাফকারী ও ক্ষমাশীল।"–সূরা আল হজ্জ ঃ ৬০

وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ○

"এসব লোক একটা অতি অপসন্দনীয় ও মিথ্যা কথাই বলে থাকে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহ অত্যধিক ক্ষমাকারী, অতীব ক্ষমাশীল।"

–সূরা আল মুজাদালা ঃ ২

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا○- النساء : ٤٣

"তাহলে পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ করো এবং তা নিজেদের চেহারা ও হাতের ওপর বুলাও নিসন্দেহে আল্লাহ কোমলতা অবলম্বনকারী ও ক্ষমাশীল।"–সূরা আন নিসা ঃ ৪৩

فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا○

"(তবে যেসব পুরুষ নারী ও শিশু যথার্থই অসহায় এবং তারা বের হবার কোনো পথ উপায় খুঁজে পায় না), আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেবেন এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৯৯

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا○

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে সৎকাজ করে যাও অথবা কমপক্ষে অসৎকাজ থেকে বিরত থাকো, তাহলে আল্লাহও বড়ই ক্ষমা গুণের অধিকারী। অথচ তিনি শাস্তি দেবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।"

–সূরা আন নিসা ঃ ১৪৯

এ আয়াতে মুসলমানদের একটি অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা দান করা হয়েছে। সে সময় মুনাফিক, ইহুদী ও মূর্তিপূজারী সবাই একই

সংগে সম্ভাব্য যাবতীয় উপায়ে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট করার ও ইসলাম গ্রহণকারীকে কষ্ট দেবার ও হয়রানী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এ নতুন আন্দোলনটির বিরুদ্ধে এমন কোনো নিকৃষ্টতম কৌশল ছিল না যা তারা অবলম্বন করেনি। কাজেই মুসলমানদের মধ্যে এর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্রোধের অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাদের মনে এ ধরনের অনুভূতির প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হতে দেখে আল্লাহ বলেন, তোমাদের খারাপ কথা বলা ও অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা আল্লাহর কাছে কোনো পসন্দনীয় কাজ নয়। তোমরা মযলুম, এতে সন্দেহ নেই। আর মযলুম যদি যালেমের বিরুদ্ধে অশোভন কথা বলে, তাহলে তাদের সে অধিকার আছে। কিন্তু তবুও প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় ভাল কাজ করে যাওয়া ও খারাপ কাজ পরিহার করাই উত্তম। কারণ তোমাদের চরিত্র আল্লাহর চরিত্রের নিকটতর হওয়া উচিত। তোমরা যাঁর নৈকট্য লাভ করতে চাও তাঁর অবস্থা হচ্ছে এই যে, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু। মারাত্মক অপরাধীদেরও তিনি রিযিক দান করেন এবং বড় বড় পাপ ও ত্রুটি-বিচ্যুতিও তিনি ক্ষমা করে দেন। কাজেই তাঁর নিকটতর হবার জন্য তোমরাও উচ্চ মনোবল, বুলন্দ হিম্মত ও উদার হৃদয়ের অধিকারী হও।[৩৫৭]

○

তোমরা যে আল্লাহর বান্দা তিনি ভুলত্রুটি মার্জনা করেন ও গোনাহ মাফ করে দেন। তাই তোমাদেরও সামর্থ অনুযায়ী মানুষের ভুলত্রুটি ও অপরাধ মার্জনা করা উচিত। মু'মিনরা ক্ষমাশীল, উদার হৃদয় ও ধৈর্যশীল, এগুলো তাদের চরিত্রের ভূষণ। প্রতিশোধ নেবার অধিকার অবশ্যই তাদের আছে। কিন্তু নিছক প্রতিশোধ স্পৃহা ও প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা লালন করা তাদের জন্য শোভনীয় নয়।[৩৫৮]

○

সূরা আল মুজাদালার দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে (স্ত্রীদেরকে মায়ের সাথে তুলনা করে) তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা কেবল তারাই যারা তাদেরকে প্রসব করেছে। এসব লোক একটা অতি অপসন্দনীয় ও মিথ্যা কথাই বলে থাকে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহ মাফ করেন, তিনি অতীব ক্ষমাশীল।"

এটি এমন একটি কাজ যে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কঠিন শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার মেহেরবানী যে, তিনি প্রথমত যিহারের ব্যাপারে জাহেলী আইন-কানুন বাতিল করে তোমাদের পারিবারিক জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। দ্বিতীয়ত এ অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। তার সবচেয়ে বড় মেহেরবানী এই যে, জেলখাটা বা মারপিট আকারে এ অপরাধের শাস্তি বিধান করেননি। বরং এমন কিছু ইবাদাত ও নেকীর কাজকে এ অপরাধের শাস্তি হিসেবে নির্ধারিত করেছেন যা তোমাদের প্রবৃত্তির সংশোধন করে এবং সমাজে কল্যাণ ও সুকৃতির বিস্তার ঘটায়।[৩৫৯]

○

আর রাউফু : اَلرَّءُوْفُ

অর্থ : অত্যন্ত স্নেহময়, দয়াবান, হীতাকাঙ্ক্ষী, কোমল স্বভাব।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

"আল্লাহ তোমাদের এ ঈমানকে কখনো নষ্ট করবেন না। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, তিনি মানুষের জন্য অত্যন্ত স্নেহশীল ও করুণাময়।"
–সূরা আল বাকারা : ১৪৩

وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ○- البقرة : ٢٠٧

"এ ধরনের বান্দাদের ওপর আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল ও মেহেরবান।"
–সূরা আল বাকারা : ২০৭

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ○ - ال عمران : ٣٠

"আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছেন। আর তিনি নিজের বান্দাদের জন্য গভীর শুভাকাঙ্ক্ষী।"
–সূরা আলে ইমরান : ৩০

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○- التوبة : ١١٧

"আল্লাহ তাদেরকে মা'ফ করে দিয়েছেন। নিসন্দেহে এ লোকদের প্রতি তিনি স্নেহশীল ও মেহেরবান।"–সূরা আত তাওবা : ১১৭

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلاَّ بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ط اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○- النحل : ٧

"তারা তোমাদের জন্য বোঝা বহন করে এমন সব জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে তোমরা কঠোর প্রাণান্তকর পরিশ্রম না করে পৌঁছুতে পারো না। আসলে তোমাদের রব বড়ই স্নেহশীল ও করুণাময়।"
–সূরা আন নাহল : ৭

اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ط فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ - النحل : ٤٧

"কিংবা এমন অবস্থায় তাদেরকে পাকড়াও করবেন না যখন তারা নিজেরাই আগামী বিপদের জন্য উৎকণ্ঠায় দিন কাটাবে এবং তার হাত থেকে বাঁচার চিন্তায় সতর্ক হবে ? তিনি যাই কিছু করতে চান তারা তাকে নিষ্ক্রিয় করার ক্ষমতা রাখে না। আসল ব্যাপার হলো, তোমাদের রব বড়ই কোমল হৃদয় ও করুণাময়।"

–সূরা আন নাহ্ল ঃ ৪৭

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○- الحج : ٦٥

"আসলে আল্লাহ লোকদের জন্য বড়ই স্নেহশীল ও মেহেরবান।"

–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৬৫

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○- النور : ٢٠

"যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর করুণা তোমাদের প্রতি না হতো এবং আল্লাহ যদি স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র না হতেন (তাহলে যে জিনিস এখনই তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিল তার পরিণাম হতো অতি ভয়াবহ)।"–সূরা আন নূর ঃ ২০

لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○-

"যাতে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতীব দয়ালু ও মেহেরবান।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ৯

وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

"আর আমাদের দিলে ঈমানদার লোকদের জন্য কোনো হিংসা ও শত্রুতার ভাব রেখো না—হে আমাদের রব! তুমি বড়ই অনুগ্রহ সম্পন্ন এবং করুণাময়।"–সূরা আল হাশর ঃ ১০

তিনি পূর্বাহ্নেই তোমাদের এমনসর্ব কাজ থেকে সতর্ক করে দিচ্ছেন, যা পরিণামে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারতো, এটা তাঁর চরম কল্যাণাকাংখারই প্রকাশ।[৩৬০]

○

৯৭

মালিকাল মুলক : مَالِكَ الْمُلْكِ

অর্থ : রাজ্যের অধিপতি, বিশ্বজাহানের শাসক ও মালিক।

ব্যাখ্যা : সমগ্র বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা, মালিক, শাসক ও প্রতিপালক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। অন্যদিকে এ সমগ্র বিশ্বব্যবস্থাকে বহু ইলাহর মিলিত সাম্রাজ্য মনে করা বা একজন বড় প্রভুর প্রভুত্বের মধ্যে অন্যান্য ছোট ছোট প্রভুদেরও কিছু মালিকানা আছে বলে মনে করে নেয়াই হচ্ছে এ সত্যের মুকাবিলায় মিথ্যা।[৩৬১]

○

এটা কোনোভাবেই সম্ভব হতে পারে না যে, বিশ্বজগতের বিভিন্ন শক্তি ও বিভিন্ন অংশের স্রষ্টা ও মালিক আলাদা আলাদা খোদা হবে, এরপর তাদের মাঝে পরিপূর্ণ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যেমন তোমরা এ গোটা বিশ্বব্যবস্থার অগণিত শক্তি ও অসংখ্য জিনিসের মধ্যে, অসংখ্য তারকা ও গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে দেখতে পাও। বিশ্বব্যবস্থার নিয়মতান্ত্রিকতা এবং এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমন্বয় থেকে কর্তৃত্বের এককেন্দ্রিকতা ও অখণ্ড ঐক্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্তৃত্ব যদি বিভিন্ন জনের হাতে বণ্টিত হতো তবে কর্তৃত্বশীলদের মাঝে মতবিরোধ প্রকাশিত হওয়া সুনিশ্চিতভাবে অবধারিত ছিল। আর এ মতবিরোধ তাদের মধ্যে যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত করেই ছাড়তো।

এ বিষয়টিই সূরা আল আম্বিয়ায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ○- الانبياء : ٢٢

"যদি আকাশে ও পৃথিবীতে এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ হতো তাহলে (পৃথিবী ও আকাশ) উভয়ের শৃংখলা ধ্বংস হয়ে যেতো।"—সূরা আল আম্বিয়া : ২২

এবং এ যুক্তিই সূরা বনী ইসরাঈলে পেশ করা হয়েছে যে,

لَوْ كَانَ مَعَهُ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لاَّبْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلاً ○

"যদি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ্ও থাকতো যেমন এরা বলে, তাহলে তারা আরশের মালিকের জায়গায় পৌঁছে যাবার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করতো।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪২

বিশ্বজাহানের সমগ্র ব্যবস্থা পৃথিবীর নিম্নতম স্তর থেকে নিয়ে দূরবর্তী গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত সবকিছুই একটি বিশ্বজনীন নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এর অসংখ্য ও অগণিত জিনিসগুলোর মধ্যে যদি পারস্পরিক সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, সমতা, সমঝোতা ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত না থাকতো তাহলে এ ব্যবস্থাটি এক মুহূর্তের জন্যও চলতে পারতো না। আর কোনো প্রবল প্রতাপান্বিত আইন এ অসংখ্য বস্তু ও শক্তিকে পূর্ণ সমতা ও ভারসাম্য সহকারে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে বাধ্য না করতে থাকা পর্যন্ত এসব কিছু সম্ভব নয়। এখন এটা কেমন করে ধারণা করা যেতে পারে যে, বহু স্বতন্ত্র স্বাধীন শাসকের রাজ্যে একই আইন এ ধরনের নিয়মানুবর্তিতা সহকারে চলতে পারে ? নিয়ম ও শৃংখলা যে বজায় আছে এটাই নিয়ম পরিচালকের একক অস্তিত্বকে অপরিহার্য করে তোলে। আইন ও শৃংখলার ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতা নিজেই একথার সাক্ষ্য দেয় যে, ক্ষমতা একই সার্বভৌম কর্তৃত্বে কেন্দ্রীভূত রয়েছে এবং এ সার্বভৌম কর্তৃত্ব বিভিন্ন শাসকদের মধ্যে বিভক্ত নয়।[৩৬২]

○

কারণ অনেকগুলো সত্তা আল্লাহর সার্বভৌমত্বে শরীক হলে সেখানে অনিবার্যভাবে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হবে। এক. তারা সবাই হবে প্রত্যেকের জায়গায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ইলাহ। দুই. তাদের একজন হবে আসল ইলাহ আর বাদবাকি সবাই হবে তার বান্দা এবং সে তাদেরকে নিজের প্রভুত্ব কর্তৃত্বের কিছু কিছু অংশ সোপর্দ করবে। প্রথম অবস্থাটিতে কোনোক্রমেই এসব স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ইলাহর পক্ষে সবসময় সব ব্যাপারে পরস্পরের ইচ্ছা ও সংকল্পের প্রতি আনুকূল্য বজায় রেখে এ অনন্ত অসীম বিশ্বলোকের আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা এতো পরিপূর্ণ ঐক্য, সামঞ্জস্য, সমতা ও ভারসাম্য সহকারে পরিচালনা করা সম্ভবপর ছিল না। তাদের পরিকল্পনা ও সংকল্পের প্রতি পদে পদেই সংঘর্ষ বাধা ছিল অনিবার্য। প্রত্যেকেই যখন দেখতো অন্য ইলাহদের আনুকূল্য ছাড়া তার প্রভুত্ব চলছে না তখন সে একাই সমগ্র বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র মালিক হয়ে যাবার চেষ্টা করতো। আর দ্বিতীয় অবস্থা সম্পর্কে বলা যায়, বান্দার সত্তা প্রভুত্বের ক্ষমতা তো দূরের কথা প্রভুত্বের সামান্যতম ভাবকল্প ও স্পর্শ-গন্ধ ধারণ করার ক্ষমতাও রাখে না। যদি কোথাও কোনো সৃষ্টির দিকে সামান্যতম

প্রভুত্ব কর্তৃত্ব স্থানান্তরিত করে দেয়া হতো তাহলে সে দাম্ভিক হয়ে যেতো, আর সামান্য ক্ষণের জন্যও সে বান্দা হয়ে থাকতে রাজী হতো না এবং তখনি সে বিশ্বজাহানের ইলাহ হয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে দিতো।

যে বিশ্বজাহানে পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত শক্তি মিলে একসাথে কাজ না করলে গমের একটি দানা এবং ঘাসের একটি পাতা পর্যন্তও উৎপন্ন হতে পারে না তার সম্পর্কে শুধুমাত্র একজন নিরেট মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন লোকই একথা চিন্তা করতে পারে যে, একাধিক স্বাধীন বা অর্ধ স্বাধীন ইলাহ তার শাসন কার্য পরিচালনা করছে। অন্যথায় যে ব্যক্তিই এ ব্যবস্থার মেজাজ ও প্রকৃতি বুঝবার জন্য সামান্যতম চেষ্টাও করেছে সে এ সিদ্ধান্তে না পৌঁছে থাকতে পারে না যে, এখানে শুধুমাত্র একজনেরই প্রভুত্ব চলছে এবং তাঁর সাথে অন্য কারো কোনো পর্যায়েই কোনো প্রকারে শরীক হবার আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই।[৩৬৩]

○

সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে ঃ

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ - بنى اسراء يل : ١١١

"আর বলো, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি কোনো পুত্রও গ্রহণ করেননি। তাঁর বাদশাহীতে কেউ শরীকও হয়নি এবং তিনি এমন অক্ষমও নন যে, কেউ তাঁর সাহায্যকারী ও সহযোগী হবে।"

—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১১

যেসব মুশরিক বিভিন্ন দেবতা ও জ্ঞানীগুণী মহামানবদের সম্পর্কে বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিভিন্ন বিভাগ এবং নিজের রাজত্বের বিভিন্ন এলাকা তাদের ব্যবস্থাপনায় দিয়ে দিয়েছেন তাদের এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এ বাক্যে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপ। এ অর্থহীন বিশ্বাসটির পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ নিজে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের বোঝা বহন করতে অক্ষম। তাই তিনি নিজের জন্য কোনো সাহায্যকারী ও নির্ভর তালাশ করে বেড়াচ্ছেন। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ অক্ষম নন। তাঁর কোনো ডেপুটি, সহকারী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই।[৩৬৪]

○

যুল জালালি ওয়াল ইকরাম ঃ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থ ঃ মহিমান্বিত ও দয়াবান সত্তা।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আর রাহ্মানের দুটি আয়াতে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমতঃ

وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ٥ـ الرحمن : ٢٧

"এবং তোমার মহীয়ান ও দয়াবান রবের সত্তাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।"–সূরা আর রহ্মান ঃ ২৭

দ্বিতীয়ত ঃ

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ٥ ـ الرحمن : ٧٨

"তোমার মহিমান্বিত ও দাতা রবের নাম অত্যন্ত কল্যাণময়।"

–সূরা আর রহ্মান ঃ ৭৮

অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী শুধুমাত্র মহা সম্মানিত ও সুমহান আল্লাহ্র সত্তা, এ বিশাল বিশ্বজাহান যার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং যাঁর বদান্যতায় তোমাদের ভাগ্যে এসব নিয়ামত জুটেছে। এখন যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ "আমার চেয়ে কেউ বড় নেই" এই গর্বে গর্বিত হয় তাহলে এটা তার বুদ্ধির সংকীর্ণতা ছাড়া কিছুই নয়। কোনো নির্বোধ যদি তার ক্ষমতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ডঙ্কা বাজায়, কিংবা কতিপয় মানুষ তার কর্তৃত্ব স্বীকার করায় সে তাদের খোদা হয়ে বসে, তাহলে তার এ মিথ্যার বেসাতি কত দিন চলতে পারে? মহাবিশ্বের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে পৃথিবীর অনুপাত যেখানে মটরশুটির দানার মতও নয় তার এক নিভৃত কোণে দশ বিশ কিংবা পঞ্চাশ ষাট বছর যে কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চলে এবং তারপরই অতীত কাহিনীতে রূপান্তরিত হয় তা এমন কোন্ কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যার জন্য কেউ গর্ব করতে পারে?[৩৬৫]

○

আল মুকসিতু ঃ اَلْمُقْسِطُ

অর্থ ঃ ন্যায় বিচারক।

(এর ব্যাখ্যার জন্য 'আল আদলু' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

(১০০)

আল জামি'উ : اَلْجَامِعُ

অর্থ : সমবেতকারী।

ব্যাখ্যা : হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তটি পর্যন্ত যেসব মানুষ জন্ম নেবে, তারা মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে দুনিয়ার বুকে একবার মাত্র নিঃশ্বাস নিলেও, তাদের প্রত্যেককে সে সময় পুনরবার পয়দা করা হবে এবং সবাইকে একই সাথে জমা করে দেয়া হবে।[৩৬৬]

○

সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে :

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّارَيْبَ فِيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُخْلِفُ الْمِيْعَادَO-

"হে আমাদের রব! অবশ্যি তুমি সমগ্র মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করবে, যে দিনটির আগমনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তুমি কখনো ওয়াদা থেকে বিচ্যুত হও না।"-আলে ইমরান : ৯

সূরা আন নিসায় বলা হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًاO - النساء : ١٤٠

"নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একই জায়গায় একত্র করবেন।"-সূরা আন নিসা : ১৪০

সূরা আশ্ শূরায় এরশাদ হয়েছে :

وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ -

"যখন ইচ্ছা তিনি এদেরকে একত্র করতে পারেন।"-আশ শূরা : ২৯

তিনি যেমন তাদের ছড়িয়ে দিতে সক্ষম তেমনি একত্র করতেও সক্ষম। তাই কিয়ামত আসতে পারে না এবং আগের ও পরের সবাইকে একই সময়ে উঠিয়ে একত্রিত করা যেতে পারে না, এ ধারণা মিথ্যা।[৩৬৭]

○

আল কুরআনে বলা হয়েছে :

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًاO

"আর সেদিন আমি লোকদেরকে ছেড়ে দেবো, তারা (সাগর তরংগের মতো) পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং আমি সব মানুষকে একত্র করবো।"-সূরা আলকাহ্ফ ঃ ৯৯

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط - التغابن : ٩

"যখন একত্রিত হবার দিন তিনি তোমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন।"–সূরা আত তাগাবুন ঃ ৯

'একত্রিত হবার দিন' বলতে কিয়ামতের দিনটি বুঝানো হয়েছে। আর সব মানুষকে একত্রিত করার অর্থ প্রথম মানব সৃষ্টির দিন হতে চূড়ান্ত প্রলয়ের দিন পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছে তাদের সকলকে একই সময়ে জীবিত করে একত্রিত করা। কুরআনের কয়েকটি স্থানে একথাটি অধিক স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। যেমন সূরা হূদে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لا لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ - هود : ١٠٣

"তা হবে এমন একটি দিন যেদিন সমস্ত লোক একত্র হবে এবং তারপর সেদিন যাকিছু হবে সবার চোখের সামনে হবে।"

–সূরা হূদ ঃ ১০৩

সূরা আল ওয়াকিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۝ لَمَجْمُوْعُوْنَ لا اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

"(হে নবী! এদের) বলে দাও, নিশ্চিতভাবেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের সব মানুষকে একদিন একত্রিত করা হবে। সেজন্য সময় নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।"–সূরা আল ওয়াকেয়াহ্ ঃ ৪৯-৫০

ভবিষ্যতে এমন দিনও আসবে যখন আল্লাহ সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে তাদের হিসাব নিবেন। কোনো ব্যক্তি যদি তার গোমরাহী ও দুষ্কর্মের পরিণাম ফল থেকে পৃথিবীতে বেঁচে গিয়েও থাকে তাহলে সেদিন তার বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না। আর সেই ব্যক্তি তো বড়ই দুর্ভাগা যে এখানেও অকল্যাণ লাভ করলো, সেখানেও দুর্ভাগ্যের শিকার হলো।৩৬৮

○

সূরা আন নিসায় বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ ط وَمَنْ اَصْدَقُ

مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۝ - النساء : ٨٧

"আল্লাহ তিনিই যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি তোমাদের সবাইকে সেই কিয়ামতের দিন একত্র করবেন যার আসার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর আল্লাহর কথার চাইতে বেশী সত্য আর কার কথা হতে পারে ?"–সূরা আন নিসা ঃ ৮৭

কাফের, মুশরিক ও নাস্তিকরা যা কিছু করছে তাতে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় না। তাঁর এক আল্লাহ এবং নিরংকুশ ও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন ইলাহ হওয়া এমন একটি বাস্তব সত্য, যাকে উল্টে দেবার ক্ষমতা কারো নেই। তারপর একদিন তিনি সমগ্র মানব জাতিকে একত্রে সমবেত করে তাদের প্রত্যেককে তার কর্মফল দেখিয়ে দেবেন। তাঁর ক্ষমতার সীমানা পেরিয়ে কেউ পালিয়ে যেতে পারবে না। কাজেই আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহাত্মক আচরণকারীদের বিরুদ্ধে কেউ তাঁর পক্ষ থেকে বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করবে এবং তাদের সাথে অসদাচরণ করে ও তিক্ত বাক্য শেলে তাদেরকে বিদ্ধ করে আহত হৃদয়ে প্রলেপ লাগাবে, আল্লাহর এর কোনো প্রয়োজন নেই।

দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ইচ্ছামতো পথে চলতে পারে এবং যে পথে ইচ্ছা সে তার প্রচেষ্টা ও কর্মশক্তি নিয়োগ করতে পারে। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সবশেষে একদিন সবাইকে আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে। সেদিন আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রভু থাকবে না। সেখানে সবাই নিজের প্রচেষ্টা ও কাজের ফল স্বচক্ষে দেখে নেবে।[৩৬৯]

○

সূরা আল জাসিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ -

"(হে নবী! এদের) বলো, আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেন এবং তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান। তিনিই আবার সেই কিয়ামতের দিন তোমাদের একত্রিত করবেন যার আগমনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।"–সূরা আল জাসিয়া ঃ ২৬

যখনই কেউ তাদেরকে বলবে, মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন হবে তখনই তাকে কবর থেকে একজন মৃতকে জীবিত করে উঠিয়ে সামনে আনতে হবে। যদি তা না করা হয় তাহলে তারা একথা মানতে প্রস্তুত নয় যে, মৃত মানুষকে আবার কোনো সময় পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে।

অথচ কেউ কখনো তাদেরকে একথা বলেনি যে, মাঝে মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে এ পৃথিবীতে মৃতদের জীবিত করা হবে। যা কিছু বলা হয়েছে তা হচ্ছে, কিয়ামতের পরে আল্লাহ এক সময় যুগপৎ সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তাদের সবার কৃতকর্ম পর্যালোচনা করে পুরস্কার ও শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।[৩৭০]

○

অস্বীকারকারীরা মনে করে, সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারী অসংখ্য মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ যা মাটিতে মিশে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বিক্ষিপ্ত হয়ে মিশে যাবে তা একত্রিত করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, ঐ সব দেহাংশের একেকটি যেখানে যে অবস্থায় আছে আল্লাহ তাআলা তা সরাসরি জানেন, তাছাড়া আল্লাহর দফতরে তার পূর্ণাংগ রেকর্ডও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। একটি ক্ষুদ্র অণুও তা থেকে বাদ পড়ছে না। যখন আল্লাহর নির্দেশ হবে সেই মুহূর্তেই তাঁর ফেরেশতারা উক্ত রেকর্ড দেখে একেটি অণুকে খুঁজে বের করবে এবং সমস্ত মানুষ যে দেহ নিয়ে দুনিয়াতে কাজ করেছিল সেই দেহ তারা পুনরায় বানিয়ে দেবে।[৩৭১]

○

আখিরাত শুধু একটি আত্মিক জগত হবে না, বরং মানুষকে সেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে পুনরায় ঠিক তেমনি জীবিত করা হবে যেমনটি বর্তমানে তারা এ পৃথিবীতে জীবিত আছে—এ আয়াতটি তারই একটি। শুধু তাই নয়, যে দেহ নিয়ে তারা এ পৃথিবীতে আছে ঠিক সে দেহই তাদের দেয়া হবে। যেসব উপাদান, অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং অণু-পরমাণুর (Atoms) সমন্বয়ে এ পৃথিবীতে তাদের দেহ গঠিত কিয়ামতের দিন সেগুলোই একত্রিত করে দেয়া হবে এবং যে দেহে অবস্থান করে সে পৃথিবীতে কাজ করেছিলো পূর্বের সেই দেহ দিয়েই তাকে উঠানো হবে।[৩৭২]

○

(১০১)

আল গানিয়্যু : اَلْغَنِيُّ

অর্থ : যে সত্তা কারো মুখাপেক্ষী নয়।

ব্যাখ্যা : "গনী" মানে হচ্ছে, তিনি সবকিছুর মালিক, প্রত্যেকটি জিনিসের অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। তিনি কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন।

তিনি এমন গনী যিনি সব রকমের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী। কারণ তিনি তোমাদের এবং বিশ্বজাহানের যাবতীয় জড় ও জীবের প্রয়োজন পূর্ণ করেন।[৩৭৩]

○

তিনি এমন ধরনের অভাব থেকেও মুক্ত যার কারণে মরণশীল মানুষদের সন্তানদের দত্তক নেবার প্রয়োজন হয়।[৩৭৪]

○

তিনি কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মুখাপেক্ষী নন। কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ফলে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সামান্য পরিমাণও বৃদ্ধি পায় না, আবার কারো অকৃতজ্ঞতার ফলে তাতে এক চুল পরিমাণ কমতিও হয় না, তিনি নিজস্ব শক্তি বলে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে যাচ্ছেন। বান্দাদের মানা না মানার ওপর তাঁর খোদায়ী কর্তৃত্ব নির্ভরশীল নয়। কুরআন মজীদে একথাটিই এক জায়গায় হযরত মূসার মুখ দিয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে :

إِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا لا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ٥

"যদি তোমরা এবং সারা দুনিয়াবাসী মিলে কুফরী করো তাহলেও তাতে আল্লাহর কিছু এসে যায় না এবং আপন সত্তায় অপনি প্রশংসিত।"–সূরা ইবরাহীম : ৮

সহীহ মুসলিমের নিম্নোক্ত হাদীসে কুদসীতেও এ একই বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে :

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا عِبَادِيْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا

عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَا زَادَ ذَالِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا ـ يَا عِبَادِيْ لَوْ اَنَّ

اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَالِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا - يَا عِبَادِىْ اِنَّمَا هِىَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمُدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَالِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهٗ -

"মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দারা ! যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হয়ে যাও, তাহলে তার ফলে আমার বাদশাহী ও শাসন কর্তৃত্বে কিছুমাত্র বৃদ্ধি ঘটে না। হে আমার বান্দারা! যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে বেশী বদকার ব্যক্তিটির হৃদয়ের মতো হয়ে যাও, তাহলে এর ফলে আমার বাদশাহীতে কোনো কমতি দেখা যাবে না। হে আমার বান্দারা! এগুলো তোমাদের নিজেদেরই কর্ম, তোমাদের হিসেবের খাতায় আমি এগুলো গণনা করি, তারপর এগুলোর পুরোপুরি প্রতিদান আমি তোমাদের দিয়ে থাকি। কাজেই যার ভাগ্যে কিছু কল্যাণ এসেছে তার আল্লাহর শোকরগুযারী করা উচিত এবং যে অন্যকিছু লাভ করেছে তার নিজেকে ভর্ৎসনা করা উচিত।"[৩৭৫]

○

তাঁর নিজের জন্য তোমাদের থেকে নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি যদি তোমাদেরকে তার পথে কিছু ব্যয় করতে বলেন, তা নিজের জন্য বলেন না, বরং তোমাদেরই কল্যাণের জন্য বলেন।[৩৭৬]

○

এমন মু'মিনদের দিয়ে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই, যারা তাঁর দীনের অনুসারী হবার দাবীও করবে, আবার তাঁর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বও রাখবে। তিনি বেপরোয়া। তাঁর খোদায়ী এর মুখাপেক্ষী নয় যে, এসব লোক তাকে খোদা মানুক।[৩৭৭]

○

কোনো ব্যাপারেই আল্লাহ তাদের কাছে ঠেকা ছিলেন না যে, তারা তাকে খোদা হিসেবে মানলে তবেই তিনি খোদা থাকবেন অন্যথায় তাঁর

কর্তৃত্বের আসন হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তিনি তাদের ইবাদাত-বন্দেগীরও মুখাপেক্ষী নন, কিংবা প্রশংসা ও স্তব-স্তুতিরও মুখাপেক্ষী নন।[৩৭৮]

○

আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী, তোমরা তাঁকে আল্লাহ বলে মেনে না নিলে তাঁর সার্বভৌম ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চলবে না এবং তোমরা তাঁর ইবাদাত ও বন্দেগী না করলে তাঁর কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে, এ ভুল ধারণা পোষণ করো না। আসল ব্যাপার হচ্ছে তোমরা তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি যদি তোমাদের জীবিত না রাখেন এবং যেসব উপকরণের সহায়তায় তোমরা দুনিয়ায় বেঁচে থাকো এবং কাজ করতে পারো সেগুলো তোমাদের জন্য সরবরাহ না করেন, তাহলে তোমাদের জীবন এক মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকতে পারে না। কাজেই তাঁর আনুগত্য ও ইবাদাতের পথ অবলম্বন করার জন্য তোমাদেরকে যে তাকীদ দেয়া হয় তা এ জন্য নয় যে, আল্লাহর এর প্রয়োজন আছে বরং এ জন্য যে, এরি ওপর নির্ভর করে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য। এমনটি না করলে তোমরা নিজেদেরই সর্বনাশ করে ফেলবে, আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[৩৭৯]

○

তাঁর কোনো কাজ তোমাদের জন্য আটকে নেই। তোমাদের সাথে তাঁর কোনো স্বার্থ জড়িত নেই। কাজেই তোমাদের নাফরমানীর ফলে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না। অথবা তোমাদের আনুগত্যের ফলে তিনি লাভবানও হবেন না। তোমরা সবাই মিলে কঠোরভাবে তাঁর হুকুম অমান্য করলে তাঁর বাদশাহী ও সার্বভৌম কর্তৃত্বে এক বিন্দু পরিমাণ কমতি দেখা দেবে না। আবার সবাই মিলে তাঁর হুকুম মেনে চললে এবং তাঁর বন্দেগী করতে থাকলেও তাঁর সাম্রাজ্যের এক বিন্দু পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটবে না। তিনি তোমাদের সেলামীর মুখাপেক্ষী নন। তোমাদের মানত-নযরানারও তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর বিপুল ভাণ্ডার তোমাদের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছেন এবং এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে কিছুই চান না।[৩৮০]

○

(১০২)

আল মুগনী ঃ اَلْمُغْنِىْ

অর্থ ঃ যে সত্তা কাউকে অভাবহীন, অমুখাপেক্ষী করে দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ০

"যদি তারা গরীব হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ আপন মেহেরবানীতে তাদেরকে ধনী করে দেবেন, আল্লাহ বড়ই প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।"
—সূরা আন নূর ঃ ৩২

وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اِنْ شَاۤءَ ط - التوبة : ٢٨

"আর যদি তোমাদের দারিদ্রের ভয় থাকে, তাহলে আল্লাহ চাইলে তাঁর নিজ অনুগ্রহে শীঘ্রই তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন।"
—সূরা আত তাওবা ঃ ২৮

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ০

"কিন্তু স্বামী স্ত্রী যদি পরস্পর থেকে আলাদা হয়েই যায়, তাহলে আল্লাহ তাঁর বিপুল ক্ষমতার সাহায্যে প্রত্যেককে অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি মহাজ্ঞানী।"—সূরা আন নিসা ঃ ১৩০

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ০ - النجم : ٤٨

"তিনিই সম্পদশালী করেছেন এবং স্থায়ী সম্পদ দান করেছেন।"
—সূরা আন্ নাজ্‌ম ঃ ৪৮

সূরা আদ্ দুহার ৮ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে ঃ

وَوَجَدَكَ عَاۤئِلاً فَاَغْنٰى ০ - الضحى : ٨

"তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পান, তারপর তোমাকে ধনী করেন।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৈতৃক সূত্রে উত্তরাধিকার হিসেবে শুধুমাত্র একটি উটনী ও একটি বাঁদী লাভ করেছিলেন। এভাবে

দারিদ্রের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের সূচনা হয়। তারপর এমন এক সময় আসে যখন মক্কার সবচেয়ে ধনাঢ্য মহিলা হযরত খাদীজা (রা) প্রথমে ব্যবসায়ে তাঁকে নিজের সাথে শরীক করে নেন, তারপর তিনি তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হন। এভাবে তাঁর সমস্ত ব্যবসায়ের দায়িত্বও তিনি নিজের হাতে তুলে নেন। এ সুবাদে তিনি কেবল ধনীই হননি এবং তাঁর ধনাঢ্যতা নিছক স্ত্রীর ধনের ওপর নির্ভরশীল ছিল না বরং তাঁর ব্যবসায়ের উন্নতি বিধানে তাঁর নিজের যোগ্যতা ও শ্রম বিরাট ভূমিকা পালন করে।[৩৮১]

○

(১০৩)

আল মানি'উ : اَلْمَانِعُ

অর্থ ঃ দান প্রতিহতকারী।

ব্যাখ্যা ঃ এ নামটিও কুরআন মজীদে উল্লেখ হয়নি। তবে ইমাম বুখারী (র) বুখারী শরীফে 'কিতাবুত দাওয়াত' অধ্যায়ে একটি দোয়া বর্ণনা করেছেন যা নবী (সা) প্রত্যেক নামাযের পর পড়তেন।

এ দোয়ায় 'منع' শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত। দোয়াটি নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা প্রতিহত করার কেউ নেই এবং তুমি যা প্রতিহত কর, তা দেয়ার শক্তি কারো নেই।"

(১০৪)

আদদাররু ঃ اَلضَّارُّ

অর্থ ঃ ক্ষতি ও লোকসানের সর্বময় কর্তা।

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক মানুষের এটা বুঝা উচিত যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। এ আস্থা ও প্রত্যয় তার মনে এমন দুর্জয় শক্তির জন্ম দেবে যে, অনেক ভিত্তিহীন শংকা এবং কাল্পনিক ভয়ভীতি ও উৎকণ্ঠা থেকে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। দুষ্কৃতিকারীদের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত মনে আপন কাজে নিয়োজিত থাকবে। আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল মু'মিন ব্যক্তি এমন অস্থিরচিত্ত হয় না যে, যে কোনো ভীতি ও আংশকা তার মনকে বিচলিত ও অশান্ত করে তুলবে। সে এতটা হীনমনাও হয় না যে, দুষ্কৃতিকারীদের উস্কানিতে উত্তেজিত ও ধৈর্যহারা হয়ে নিজেও ইনসাফ বিরোধী কার্যকলাপ করতে আরম্ভ করবে।[৩৮২]

○

আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদদের উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ, মূলত ও যথার্থই তাদের উপকার ও ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা নেই।[৩৮৩]

○

(কোনো নবী কারো উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন না) আল্লাহর ঘোষণা হলো ঃ

قُلْ اِنِّيْ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ رَشَدًا ۝ - الجن : ٢١

"(হে নবী! এদের) বলো, আমি তোমাদের ক্ষতি ও ভালো কোনোটাই করার ইখতিয়ার রাখি না।"-সূরা আল জিন ঃ ২১

আমি কখনো এ দাবী করি না যে, আল্লাহর প্রভুত্বে আমার কোনো দখলদারী বা কর্তৃত্ব আছে, কিংবা মানুষের ভাগ্য ভাঙা বা গড়ার ব্যাপারে আমার কোনো ক্ষমতা আছে। আমি তো আল্লাহর একজন রাসূল মাত্র। আমার ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা তোমাদের কাছে

আল্লাহ তাআলার বাণী পৌছিয়ে দেয়ার অধিক আর কিছুই নয়। আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ব্যাপার তো পুরোপুরি আল্লাহরই করায়ত্ত। অন্য কারো কল্যাণ বা ক্ষতি সাধন তো দূরের কথা; নিজের ক্ষতি ও কল্যাণের ব্যাপারটিও আমার নিজের ইচ্ছাধীন নয়। আমি যদি আল্লাহর নাফরমানী করি তাহলে তাঁর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করে কোথাও আশ্রয় লাভ করতে পারবো না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে ছাড়া আমার আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই।[৩৮৪]

○

তোমাদের মধ্যে যারা খোদাপ্রাপ্তি এবং আধ্যাত্মিকতার প্রহসন করে, সাধারণত ঘটা করে তা দাবী করে, আল্লাহর নবী তেমন কোনো দাবী করেন না। জাহেলী সমাজে সাধারণভাবে এ ধারণা প্রচলিত আছে যে, 'দরবেশ' শ্রেণীর লোকেরা এমন প্রতিটি মানুষের ভাগ্য নষ্ট করে দেয় যারা তাদের সাথে বে-আদবী করে। এমনকি তাদের মৃত্যুর পরেও কেউ যদি তাদের কবরেরও অবমাননা করে এবং অন্য কিছু না করলেও যদি তাদের মনের মধ্যে কোনো খারাপ ধারণার উদয় হয় তাহলেই তাকে ধ্বংস করে দেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ ধারণা ঐসব "দরবেশ মহামান্যরা" নিজেরাই প্রচার করেন এবং যেসব নেককার লোক নিজেরা এ কাজ করেন না কিছু ধূর্ত লোক তাদের হাড্ডিসমূহকে নিজেদের ব্যবসায়ের পুঁজি বানানোর জন্য তাদের সম্পর্কে এ ধারণা প্রচার করতে থাকে। যাই হোক মানুষের ভাগ্য গড়া ও ভাঙার ক্ষমতা-ইখতিয়ার থাকাকেই সাধারণ মানুষ রূহানিয়াত ও খোদাপ্রাপ্তির অতি আবশ্যকীয় দিক বলে মনে করছে।[৩৮৫]

○

(এ ইখতিয়ার শুধুমাত্র আল্লাহরই রয়েছে)

সূরা আল আনআমে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهٗ اِلاَّ هُوَ ط - الانعام : ١٧

"যদি আল্লাহ তোমার কোনো ধরনের ক্ষতি করেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে তোমাকে ঐ ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৭

মক্কার কাফেররা নবী (স)-কে বলতো, তুমি আমাদের উপাস্যদের সাথে বেআদবী করে থাকো এবং তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে থাকো। তারা কত বড় সম্মানিত সত্তা তা তুমি জানো না। যে-ই তাদের অবমাননা ও

অপমান করেছে সে-ই ধ্বংস হয়েছে। তুমি যদি তোমার কথাবার্তা থেকে বিরত না হও তাহলে এরা তোমাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।

এসব উপাস্যদের শক্তি ও মর্যাদার প্রতি এসব নির্বোধদের ভাল খেয়াল আছে। কিন্তু এ খেয়াল তাদের কখনো আসে না যে, আল্লাহ এক মহা পরাক্রমশালী সত্তা, শিরক করে এরা তাঁর যে অপমান ও অবমাননা করছে সে জন্যও শাস্তি হতে পারে।[৩৮৬]

○

আনন্দ ও দুঃখের কার্যকারণ তার পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভাল ও মন্দ ভাগ্যের মূলসূত্র তাঁরই হাতে। কারো ভাগ্যে যদি আরাম ও আনন্দ জুটে থাকে তাহলে তা তাঁর দানেই হয়েছে। আবার কেউ যদি বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হয়ে থাকে তাও তাঁর ইচ্ছায়ই হয়েছে। এ বিশ্বজাহানে এমন আর কোনো সত্তা নেই ভাগ্যের ভাঙা গড়ায় যার কোনো হাত আছে।[৩৮৭]

আন নাফিউ' : اَلنَّافِعُ

অর্থ : উপকারকারী, কল্যাণকারী।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য মাবুদদের উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ, মূলত ও যথার্থই তাদের উপকার ও ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা নেই।

তাদের কাছে দোয়া চেয়ে এবং অভাব ও প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের সামনে হাত পাতার মাধ্যমে সে নিজের ঈমান সাথে সাথেই ও নিশ্চিতভাবেই হারিয়ে বসে। তবে যে লাভের আশায় সে তাদেরকে ডেকেছিল তা অর্জিত হবার ব্যাপারে বলা যায়, প্রকৃত সত্যের কথা বাদ দিলেও প্রকাশ্য অবস্থার দৃষ্টিতে সে নিজেও একথা স্বীকার করবে যে, তা অর্জিত হওয়াটা নিশ্চিত নয় এবং বাস্তবে তা সংঘটিত হবার নিকটতর সম্ভাবনাও নেই। হতে পারে, আল্লাহ্ তাকে আরো বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন করার জন্য কোনো আস্তানায় তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। আবার এও হতে পারে যে, সে আস্তানায় সে নিজের ঈমানও বিকিয়ে দিয়ে এসেছে এবং তার মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হয়নি।[৩৮৮]

○

কাউকে কিয়ামতের দিন তার কর্মফল ভোগ করার হাত থেকে নিষ্কৃতি দান করার ক্ষমতা কারোর থাকবে না। কেউ সেখানে এমন প্রভাবশালী বা আল্লাহর প্রিয়ভাজন হবে না যে, আল্লাহর আদালতে তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে বেঁকে বসে একথা বলতে পারে, অমুক ব্যক্তি আমার আত্মীয়, প্রিয় বা আমার সাথে সম্পর্কিত, কাজেই দুনিয়ায় সে যত খারাপ কাজ করে থাকুক না কেন তাকে তো মাফ করতেই হবে।[৩৮৯]

○

মুশরিকরা বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ, ফেরেশতা বা অন্যান্য সত্তা সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহর কাছে তাদের বিরাট প্রতিপত্তি। তারা যে দাবীর ওপর অটল থাকে, তা তারা আদায় করেই ছাড়েন। আর আল্লাহর কাছ থেকে তারা যে কোনো কার্যোদ্ধার করতে সক্ষম। এখানে তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহর ওখানে প্রতিপত্তির তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না,

এমনকি কোনো শ্রেষ্ঠতম নবী-রাসূল এবং কোনো নিকটতম ফেরেশতাও এ পৃথিবী ও আকাশের মালিকের দরবারে বিনা অনুমতিতে একটি শব্দও উচ্চারণ করার সাহস রাখে না।[৩৯০]

○

খোদায়ীর সর্বময় ক্ষমতা ও ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার হাতে। এ ক্ষমতা ও ইখতিয়ার অন্য কারো আদৌ নেই। তাই সে তোমাদের জন্য ভাল বা মন্দ ভাগ্য গড়তে পারে না। তিনি আনলেই কেবল সুসময় আসতে পারে এবং তিনি দূর করলেই কেবল দুঃসময় দূর হতে পারে। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে মনেপ্রাণে একমাত্র ইলাহ্ বলে স্বীকার করে সে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করবে এবং একজন ঈমানদার হিসেবে এ বিশ্বাস রেখে দুনিয়াতে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকবে যে, আল্লাহ্ যে পথ দেখিয়েছেন কেবল সে পথেই কল্যাণ নিহিত। এ ছাড়া তার জন্য আর কোনো পথ নেই। এ পথে সফলতা লাভ হলে তা আল্লাহ্র সাহায্য, সহযোগিতা ও তাওফীকের মাধ্যমেই হবে ; অপর কোনো শক্তির সাহায্যে তা হওয়ার নয়। আর এ পথে যদি কঠোর পরিস্থিতি, বিপদাপদ, ভয়ভীতি ও ধ্বংস আসে তাহলে তা থেকেও কেবল তিনিই রক্ষা করতে পারেন, অন্য কেউ নয়।[৩৯১]

○

সূরা আল ফাত্হ-এ বলা হয়েছে ঃ

قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ط

"তাদেরকে বলো! ঠিক আছে, এটাই যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র ফায়সালাকে কার্যকর হওয়া থেকে বাধা দানের সামান্য ক্ষমতা কি কারো আছে যদি তিনি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে চান অথবা চান কোনো কল্যাণ দান করতে।"

–সূরা আল ফাত্হ ঃ ১১

(১০৬)

আন নূরু : اَلنُّوْرُ, আল মুনীরু : اَلْمُنِيْرُ, নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ : نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থ : সমগ্র বিশ্বজগতের আলো।

ব্যাখ্যা : সূরা আন নূরে বলা হয়েছে :

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط - النور : ٣٥

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আলো।"–সূরা আন নূর : ৩৫

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী শব্দ সাধারণভাবে কুরআন মজীদে "বিশ্বজাহান" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই অন্য কথায় আয়াতের অনুবাদ এও হতে পারে : আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজাহানের আলো।

আলো বলতে এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যার বদৌলতে দ্রব্যের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ যে নিজে নিজে প্রকাশিত হয় এবং অন্য জিনিসকেও প্রকাশ করে দেয়। মানুষের চিন্তায় নূর ও আলোর এটিই আসল অর্থ। কিছুই বুঝতে না পারার অবস্থাকে মানুষ অন্ধকার নাম দিয়েছে। আর এর বিপরীতে যখন সবকিছু বুঝা যেতে থাকে এবং প্রত্যেকটি জিনিস প্রকাশ হয়ে যায় তখন মানুষ বলে, আলো হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার জন্য "নূর" তথা আলো শব্দটির ব্যবহার এ মৌলিক অর্থের দিক দিয়েই করা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ তিনি এমন কোনো আলোকরশ্মি নন যা সেকেণ্ডে ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইল বেগে চলে এবং আমাদের চোখের পরদায় পড়ে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রকে প্রভাবিত করে, আলোর এ ধরনের কোনো অর্থ এখানে নেই। মানুষের মস্তিষ্ক যে অর্থের জন্য এ শব্দটি উদ্ভাবন করেছে, আলোর এ বিশেষ অবস্থা সে অর্থের মৌল তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তার ওপর এ শব্দটি আমরা এ বস্তুজগতে আমাদের অভিজ্ঞতায় যে আলো ধরা দেয় তার দৃষ্টিতে প্রয়োগ করি। মানুষের ভাষায় প্রচলিত যতগুলো শব্দ আল্লাহর জন্য বলা হয়ে থাকে সেগুলো তাদের আসল মৌলিক অর্থের দৃষ্টিতে বলা হয়ে থাকে, তাদের বস্তুগত অর্থের দৃষ্টিতে বলা হয় না। যেমন আমরা তাঁর জন্য দেখা শব্দটি ব্যবহার করি। এর অর্থ এ হয় না যে, তিনি মানুষ ও পশুর মতো চোখ নামক একটি অংগের মাধ্যমে দেখেন। আমরা তাঁর জন্য শোনা শব্দ ব্যবহার করি। এর মানে এ নয় যে,

তিনি আমাদের মতো কানের সাহায্যে শোনেন। তাঁর জন্য আমরা পাকড়াও ও ধরা শব্দ ব্যবহার করি। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি হাত নামক একটি অংগের সাহায্যে ধরেন। এসব শব্দ সবসময় তাঁর জন্য একটি প্রায়োগিক মর্যাদায় বলা হয়ে থাকে এবং একমাত্র একজন স্বল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এ ভুল ধারণা করতে পারে যে, আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় শোনা, দেখা ও ধরার যে সীমাবদ্ধ ও বিশেষ আকৃতি রয়েছে তার বাইরে এগুলোর অন্য কোনো আকৃতি ও ধরন হওয়া অসম্ভব। অনুরূপভাবে "নূর" বা আলো সম্পর্কেও একথা মনে করা নিছক একটি সংকীর্ণ চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, এর অর্থের ক্ষেত্র শুধুমাত্র এমন রশ্মিরই আকারে পাওয়া যেতে পারে যা কোনো উজ্জ্বল অবয়ব থেকে বের হয়ে এসে চোখের পরদায় প্রতিফলিত হয়। এ সীমিত অর্থে আল্লাহ্ আলো নন বরং ব্যাপক, সার্বিক ও আসল অর্থে আলো। অর্থাৎ এ বিশ্বজাহানে তিনিই একক আসল "প্রকাশের কার্যকারণ", বাকি সবই এখানে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যান্য আলোক বিতরণকারী জিনিসগুলোও তাঁরই দেয়া আলো থেকে আলোকিত হয় ও আলো দান করে। নয়তো তাদের কাছে নিজের এমন কিছু নেই যার সাহায্যে তারা এ ধরনের বিস্ময়কর কাণ্ড করতে পারে।

আলো শব্দের ব্যবহার জ্ঞান অর্থেও হয় এবং এর বিপরীতে অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতাকে অন্ধকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এ অর্থে আল্লাহ্ বিশ্বজাহানের আলো। কেননা, এখানে সত্যের সন্ধান ও সঠিক পথের জ্ঞান একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই এবং তার কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাঁর দান গ্রহণ করা ছাড়া মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার এবং তার ফলশ্রুতিতে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়।[৩৯২]

○

আল্লাহকে "আলো" বলার মানে এ নয় যে, নাউযুবিল্লাহ! আলোই তাঁর স্বরূপ। আসলে তিনি তো হচ্ছেন একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংগ সত্তা। তিনি জ্ঞানী, শক্তিশালী, প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ইত্যাদি হবার সাথে সাথে আলোর অধিকারীও। কিন্তু তাঁর সত্তাকে আলো বলা হয়েছে নিছক তাঁর আলোকোজ্জ্বলতার পূর্ণতার কারণে। যেমন কারো দানশীলতা গুণের পূর্ণতার কথা বর্ণনা করার জন্য তাকেই "দান" বলে দেয়া অথবা তার সৌন্দর্যের পূর্ণতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে স্বয়ং তাকেই সৌন্দর্য আখ্যা দেয়া।[৩৯৩]

○

যদিও আল্লাহর এ একক ও একচ্ছত্র আলো (যার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগীই নেই, যা কখনো অন্তর্হিত ও নিশ্চিহ্ন হয় না এবং যা সবসময় একইভাবে সব দিক আচ্ছন্ন করে থাকে।) সমগ্র বিশ্বজাহান আলোকিত করছে কিন্তু তা দেখার, জানার ও উপলব্ধি করার সৌভাগ্য সবার হয় না। তা উপলব্ধি করার সুযোগ এবং তার দানে অনুগৃহীত হবার সৌভাগ্য আল্লাহই যাকে চান তাকে দেন। নয়তো অন্ধের জন্য যেমন দিনরাত সমান ঠিক তেমনি অবিবেচক ও অদূরদর্শী মানুষের জন্য বিজলী, সূর্য, চাঁদ ও তারার আলো তো আলোই, কিন্তু আল্লাহর নূর ও আলো সে ঠাহর করতে পারে না। এ দিক থেকে এ দুর্ভাগার জন্য বিশ্বজাহানে সবদিকে অন্ধকারই অন্ধকার। দু'চোখ অন্ধ। তাই নিজের একান্ত কাছের জিনিসই সে দেখতে পারে না। এমনকি তার সাথে ধাক্কা খাওয়ার পরই সে জানতে পারে এ জিনিসটি এখানে ছিল। এভাবে ভিতরের চোখ যার অন্ধ অর্থাৎ যার অন্তরদৃষ্টি নেই সে তার নিজের পাশেই আল্লাহর আলোয় যে সত্য জ্বলজ্বল করছে তাকেও দেখতে পায় না। যখন সে তার সাথে ধাক্কা খেয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের শিকলে বাঁধা পড়ে কেবলমাত্র তখনই তার সন্ধান পায়।[৩৯৪]

○

সূরা আন নূরের ৩৫ আয়াতে আল্লাহর আলোর উপমা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর ঘোষণা হলো ঃ

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

"তাঁর আলোর উপমা যেন একটি 'তাকে' একটি প্রদীপ রাখা আছে, প্রদীপটি আছে একটি চিমনীর মধ্যে, চিমনীটি দেখতে এমন যেন মুক্তার মতো ঝকমকে নক্ষত্র ; আর এ প্রদীপটি যয়তুনের একটি মুবারক গাছের তেল দিয়ে উজ্জ্বল করা হয়, যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। যার তেল আপনা আপনিই জ্বলে ওঠে, চাই আগুন তাকে স্পর্শ করুক বা না করুক। (এভাবে) আলোর ওপরে আলো (বৃদ্ধির সমস্ত উপকরণ একত্র হয়ে গেছে)। আল্লাহ যাকে চান নিজের আলোর দিকে পথনির্দেশ করেন।"

এ উপমায় প্রদীপের সাথে আল্লাহর সত্তাকে এবং তাকের সাথে বিশ্বজাহানকে তুলনা করা হয়েছে। আর চিমনী বলা হয়েছে এমন পরদাকে যার মধ্যে মহাসত্যের অধিকারী সমস্ত সৃষ্টিকুলের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন, অর্থাৎ এ পরদাটি যেন গোপন করার পরদা নয় বরং প্রবল প্রকাশের পরদা। সৃষ্টির দৃষ্টি যে তাঁকে দেখতে অক্ষম এর কারণ এটা নয় যে, মাঝখানে অন্ধকার আছে, বরং আসল কারণ হচ্ছে, মাঝখানের পরদা স্বচ্ছ এবং এ স্বচ্ছ পরদা অতিক্রম করে আগত আলো এত বেশী তীক্ষ্ণ, তীব্র, অবিমিশ্র ও পরিবেষ্টনকারী যে, সীমিত শক্তিসম্পন্ন চক্ষু তা দেখতে অক্ষম হয়ে গেছে। এ দুর্বল চোখগুলো কেবলমাত্র এমন ধরনের সীমাবদ্ধ আলো দেখতে পারে যার মধ্যে কমবেশী হতে থাকে, যা কখনো অন্তর্হিত আবার কখনো উদিত হয়, যার বিপরীতে কোনো অন্ধকার থাকে এবং নিজের বিপরীতধর্মীর সামনে এসে সে সমুজ্জ্বল হয়। কিন্তু নিরেট, ভরাট ও ঘন আলো, যার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগীই নেই, যা কখনো অন্তর্হিত ও নিশ্চিহ্ন হয় না এবং যা সবসময় একইভাবে সব দিক আচ্ছন্ন করে থাকে, তাকে পাওয়া ও তাকে দেখা এদের সাধ্যের বাইরে।

আর "এ প্রদীপটি যয়তুনের এমন একটি মুবারক গাছের তেল দিয়ে উজ্জ্বল করা হয় যা পূর্বেরও নয় পশ্চিমের নয়।" এ বক্তব্য কেবলমাত্র প্রদীপের আলোর পূর্ণতা ও তার তীব্রতার ধারণা দেবার জন্য বলা হয়েছে। প্রাচীন যুগে যয়তুনের তেলের প্রদীপ থেকেই সর্বাধিক পরিমাণ আলোক লাভ করা হতো। এর মধ্যে আবার উঁচু ও খোলা জায়গায় বেড়ে ওঠা যয়তুন গাছগুলো থেকে যে তেল উৎপন্ন হতো সেগুলোর প্রদীপের আলো হতো সবচেয়ে জোরালো। উপমায় এ বিষয়বস্তুর বক্তব্য এ নয় যে, প্রদীপের সাথে আল্লাহর যে সত্তার তুলনা করা হয়েছে তা অন্য কোনো জিনিস থেকে শক্তি (Energy) অর্জন করছে। বরং একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, উপমায় কোনো মামুলি ধরনের প্রদীপ নয় বরং তোমাদের দেখা উজ্জ্বলতম প্রদীপের কথা চিন্তা করো। এ ধরনের প্রদীপ যেমন সারা ঘর বাড়ি আলোকজ্জ্বল করে ঠিক তেমনি আল্লাহর সত্তাও সারা বিশ্বজাহানকে আলোক নগরীতে পরিণত করে রেখেছে।[৩৯৫]

○

আলহাদিয়্যু ঃ اَلْـهَادِیُ

অর্থ ঃ পথপ্রদর্শক।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আল আ'রাফে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ط وَيَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

"আল্লাহ যাকে পথ নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করেন তার জন্য আর কোনো পথ নির্দেশক নেই। আর আল্লাহ তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দেন।"

–সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৮৬

সূরা আল ফুরকানে বলা হয়েছে ঃ

وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ○ - الفرقان : ٣١

"এবং তোমার জন্য তোমার রবই পথ দেখানোর ও সাহায্য দানের জন্য যথেষ্ট।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৩১

পথ দেখানো অর্থ কেবলমাত্র সত্যজ্ঞান দান করাই নয় বরং ইসলামী আন্দোলনকে সাফল্যের সাথে চালানো এবং শত্রুদের কৌশল ব্যর্থ করার জন্য যথাসময়ে সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার পথও দেখিয়ে দেয়া বুঝায়।[৩৯৬]

○

ইসলামী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে যখন হক ও বাতিলের লাগাতর সংঘাত চলে সে সময় নবী ও তাঁর অনুসারীদের মনে সাহস সঞ্চার করে যেতে হবে। এজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একবার একটি লম্বা-চওড়া নির্দেশনামা পাঠিয়ে দিয়ে সারা জীবন সমগ্র দুনিয়ার যাবতীয় বাধা-বিপত্তির মুকাবিলা করার জন্য তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেবার তুলনায় বারবার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের কাছে পয়গাম আসা বেশী কার্যকর হয়ে থাকে। প্রথম অবস্থায় মানুষ মনে করে সে প্রবল বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরংগের মুখে পড়ে গেছে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষ অনুভব করে, যে আল্লাহ তাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছেন তিনি তার প্রতি

দৃষ্টি রেখেছেন। তার কাজে আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তার অবস্থা দেখছেন, তার সমস্যা ও সংকটে তাকে পথ দেখাচ্ছেন এবং প্রত্যেকটি প্রয়োজনের সময় তাকে তাঁর সামনে হাজির হবার ও সম্বোধন করার সৌভাগ্য দান করে তার সাথে নিজের সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করতে থেকেছেন। এ জিনিসটি তার উৎসাহ বৃদ্ধি এবং সংকল্প সুদৃঢ় করে।[৩৯৭]

○

সূরা আল হাজ্জে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ - الحج : ٥٤

"যারা ঈমান আনে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ চিরকাল সত্য সরল পথ দেখিয়ে থাকেন।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫৪

সূরা আল মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ

مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ -

"কিন্তু সেখানে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচানোর কেউ থাকবে না। সত্য কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করে দেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না।"–সূরা আল মু'মিন ঃ ৩৩

আল্লাহর হেদায়াত তথা সত্য-সরল পথে পরিচালিত করার অর্থ হচ্ছে এই যে, একজন সত্যান্বেষী ব্যক্তি জ্ঞানের উপকরণসমূহ থেকে লাভবান হবার সুযোগ লাভ করে এবং আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে সত্যের লক্ষ্যে পৌঁছার নিশানীগুলো লাভ করে যেতে থাকে। এ তিনটি অবস্থার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আজকাল প্রায়ই আমাদের সামনে এসে থাকে। এমন বহু লোক আছে যাদের সামনে পৃথিবীর বস্তুনিচয় ও প্রাণীকুলের মধ্যে তাদের জন্য আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু তারা জন্তু-জানোয়ারের মতো সেগুলো দেখে থাকে এবং সেখান থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে না। বহু লোক প্রাণীবিদ্যা (ZOOLOGY), উদ্ভিদ বিদ্যা (BOTANY), জীববিদ্যা (BIOLOGY), ভূ-তত্ত্ব (GEOLOGY), মহাকাশ বিদ্যা (ASTRONOMY), শরীর বিজ্ঞান (PHYSIOLOGY), শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (ANATOMY), এবং বিজ্ঞানের আরো বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ব্যাপক অধ্যয়ন করেন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানে গবেষণা করেন এবং এমন সব নিদর্শন তাদের সামনে আসে যেগুলো হৃদয়কে ঈমানের আলোয় ভরে দেয়। কিন্তু যেহেতু তারা বিদ্বেষ ও পক্ষপাতদুষ্ট মানসিকতা নিয়ে অধ্যয়নের সূচনা করেন এবং তাদের সামনে বৈষয়িক লাভ ছাড়া

আর কিছুই থাকে না, তাই এ অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণকালে তারা সত্যের দোরগোড়ায় পৌঁছবার মতো কোনো নিদর্শন পায় না। বরং তাদের সামনে যে নিদর্শনটিই উপস্থিত হয় সেটিই তাদেরকে নাস্তিকতা, আল্লাহ বিমুখতা, বস্তুবাদিতা ও প্রকৃতিবাদিতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাদের মুকাবিলায় এমন লোকের সংখ্যাও একেবারে নগণ্য নয় যারা সচেতন বুদ্ধি বিবেকের সাথে চোখ মেলে বিশ্বপ্রকৃতির এ সুবিশাল কর্মক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করেন এবং বলে ওঠেন ঃ

"সচেতন দৃষ্টি সমুখে গাছের প্রতিটি সবুজ পাতা
একেকটি গ্রন্থ যেন স্রষ্টা–সন্ধানের এনেছে বারতা।"[৩৯৮]

○

এ দুনিয়ায় চিন্তা ও কর্মের সমস্ত পথ আল্লাহর ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অধীন। আল্লাহর হুকুম অনুমতি ও তাওফীক তথা সুযোগ দান ছাড়া কোনো একটি পথেও চলার ক্ষমতা মানুষের নেই। তবে কোন্ ব্যক্তি কোন্ পথে চলার অনুমতি পায় এবং কোন্ পথে চলার উপকরণ তার জন্য সংগ্রহ করে দেয়া হয় এটা পুরোপুরি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজের চাহিদা, প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপর। যদি আল্লাহর সাথে তার মানসিক সংযোগ থাকে, সে সত্যানুসন্ধানী হয় এবং সাচ্চা নিয়তে আল্লাহর পথে চলার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে আল্লাহ তাকে তারই অনুমতি ও সুযোগ দান করেন। তখন এ পথে চলার যাবতীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম তার আয়ত্তাধীন হয়ে যায়। বিপরীত পক্ষে যে ব্যক্তি গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা পসন্দ করে এবং ভুল পথে চলার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য হেদায়াতের সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং সে সমস্ত পথ তার জন্য খুলে দেয়া হয় যেগুলো সে নিজের জন্য বাছাই করে নিয়েছে। এহেন ব্যক্তিকে ভুল চিন্তা করার, ভুল কাজ করার ও ভুল পথে নিজের শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করা থেকে নিরস্ত রাখার ক্ষমতা কারো নেই। যে ব্যক্তি নিজেই তার ভাগ্যের সঠিক পথ হারিয়ে বসে এবং আল্লাহ যাকে সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত করেন, কেউ তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে এবং এ হারানো নেয়ামত খুঁজে দিতে পারে না।[৩৯৯]

○

মহান আল্লাহ মানবাত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিশক্তি দিয়ে দুনিয়ায় একেবারে চেতনাহীনভাবে ছেড়ে দেননি বরং একটি প্রাকৃতিক চেতনার মাধ্যমে তার অবচেতন মনে নেকী ও গোনাহর পার্থক্য, ভালো ও মন্দের প্রভেদ এবং ভালোর ভালো হওয়া ও মন্দের মন্দ হওয়ার বোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।[৪০০]

○

প্রত্যেক ব্যক্তির অবচেতন মনে আল্লাহ্ এ চিন্তাটি রেখে দিয়েছেন যে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে কোন্ জিনিস ভালো ও কোন্ জিনিস মন্দ এবং সৎ নৈতিক বৃত্তি ও সৎকাজ এবং অসৎ নৈতিক বৃত্তি ও অসৎকাজ সমান নয়। ফুজূর (দুষ্কৃতি ও পাপ) একটি খারাপ বিষয় এবং তাকওয়া (খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা) একটি ভালো বিষয়, এ ধারণা মানুষের জন্য নতুন নয়। বরং তার প্রকৃতি এগুলোর সাথে পরিচিত। স্রষ্টা তার মধ্যে জন্মগতভাবে ভালো ও মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। একথাটিই সূরা আল বালাদে এভাবে বলা হয়েছে ঃ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ "আর আমি ভালো ও মন্দ উভয় পথ তার জন্য সুস্পষ্ট করে রেখে দিয়েছি।" (আয়াত ১০) সূরা আদ্ দাহরে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا "আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে আবার চাইলে হতে পারে অস্বীকারকারী।" (আয়াত ৩) একথাটিই সূরা আল কিয়ামায় বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে ঃ মানুষের মধ্যে একটি নফ্সে লাওয়ামাহ (বিবেক) আছে। সে অসৎকাজ করলে তাকে তিরস্কার করে। (আয়াত ২) আর প্রত্যেক ব্যক্তি সে যতই ওযর পেশ করুক না কেন সে কি, তা সে খুব ভালো করেই জানে।–আয়াত ঃ ১৪-১৫

এখানে একথাটিও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, মহান আল্লাহ স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত ইলহাম করেছেন প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি তার মর্যাদা, ভূমিকা ও স্বরূপ অনুযায়ী। যেমন সূরা ত্বা-হায় বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى "যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন, তারপর তাকে পথ দেখিয়েছেন।" (আয়াত ৫০) যেমন প্রাণীদের প্রত্যেক প্রজাতিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। যার ফলে মাছ নিজে নিজেই সাঁতার কাঁটে, পাখি উড়ে বেড়ায়, মৌমাছি মৌচাক তৈরী করে, চাতক বাসা বানায়। মানুষকেও তার বিভিন্ন পর্যায় ও ভূমিকার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। মানুষ এক দিক দিয়ে প্রাণীগোষ্ঠীভুক্ত। এ দিক দিয়ে তাকে যে ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে তার একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মানব শিশু জন্মের সাথে সাথেই মায়ের স্তন চুষতে থাকে। আল্লাহ্ যদি প্রকৃতিগতভাবে তাকে এ শিক্ষাটি না দিতেন তাহলে তাকে এ কৌশলটি শিক্ষা দেবার সাধ্য কারো ছিল না। অন্যদিক দিয়ে মানুষ একটি বুদ্ধি বৃত্তিক প্রাণী। এদিক দিয়ে তার সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ্ তাকে অনবরত ইলহামী পথনির্দেশনা দিয়ে চলছেন। এর ফলে সে একের পর এক উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব সভ্যতার বিকাশ সাধন করছে। এই

সমস্ত উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ইতিহাস অধ্যয়নকারী যে কোনো ব্যক্তিই একথা অনুভব করবেন যে, সম্ভবত মানুষের চিন্তা ও পরিশ্রমের ফল হিসেবে দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকটি আবিষ্কার আকস্মিকভাবে শুরু হয়েছে। হঠাৎ এক ব্যক্তির মাথায় একটি চিন্তার উদয় হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে সে কোনো জিনিস আবিষ্কার করেছে। এ দুটি মর্যাদা ছাড়াও মানুষের আর একটি মর্যাদা ও ভূমিকা আছে। সে একটি নৈতিক জীবও। এ পর্যায়ে আল্লাহ তাকে ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি এবং ভালোকে ভালো ও মন্দকে মন্দ জানার অনুভূতি ইলহাম করেছেন। এ শক্তি, বোধ ও অনুভূতি একটি বিশ্বজনীন সত্য। এর ফলে আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এমন কোনো সমাজ সভ্যতা গড়ে ওঠেনি যেখানে ভালো ও মন্দের ধারণা ও চিন্তা কার্যকর ছিল না। আর এমন কোনো সমাজ ইতিহাসে কোনো দিন পাওয়া যায়নি এবং আজো পাওয়া যায় না যেখানকার ব্যবস্থায় ভালো ও মন্দের এবং সৎ ও অসৎকাজের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির কোনো না কোনো পদ্ধতি অবলম্বিত হয়নি। প্রতিযুগে, প্রত্যেক জায়গায় এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রত্যেক পর্যায়ে এ জিনিসটির অস্তিত্বই এর স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এছাড়াও একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ স্রষ্টা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এটি গচ্ছিত রেখেছেন, একথাও এ থেকে প্রমাণিত হয়। কারণ যেসব উপাদানে মানুষ তৈরী এবং যেসব আইন ও নিয়মের মাধ্যমে জড় জগত চলছে তার কোথাও নৈতিকতার কোনো একটি বিষয়ও চিহ্নিত করা যাবে না।[৪০১]

○

ভালো ও মন্দের যে চেতনালব্ধজ্ঞান আল্লাহ মানুষের প্রকৃতিতে রেখে দিয়েছেন তা মানুষের সঠিক পথের সন্ধান লাভ করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাকে পুরোপুরি না বুঝার কারণে মানুষ ভালো ও মন্দের বিভ্রান্তিকর দর্শন ও মানদণ্ড নির্ণয় করে পথভ্রষ্ট হতে থেকেছে। তাই মহান আল্লাহ এ প্রকৃতিগত চেতনাকে সাহায্য করার জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের ওপর সুস্পষ্ট এ দ্ব্যর্থহীন অহী নাযিল করেছেন। এর ফলে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে লোকদেরকে নেকী ও গোনাহ কি তা জানাতে পারবেন।[৪০২]

○

তাছাড়া চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-অনুসন্ধান ছাড়াই একজন মানুষকে যে অব্যর্থ কৌশল বা নির্ভুল মত অথবা চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ বুঝানো হয় তাও অহী। (وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ - القصص) এ অহী

থেকে কোনো একজন মানুষও বঞ্চিত নয়। দুনিয়ায় যত নতুন নতুন উদ্ভাবন ও কল্যাণকর আবিষ্কার হয়েছে যত বড় বড় শাসক, বিজেতা, চিন্তানায়ক ও লেখক যুগান্তকারী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী কর্ম সম্পাদন করেছেন তার সবের পেছনেই এ অহীর কার্যকারিতা দেখা যায়। বরং সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তা হচ্ছে এই যে, কখনো বসে বসে একটি কথা মনে হলো অথবা কোনো কৌশল মাথায় এলো কিংবা স্বপ্নে কিছু দেখা গেলো এবং পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেলো যে, অদৃশ্য থেকে পাওয়া সেটি তার জন্য একটা সঠিক পথনির্দেশনা ছিল।[৪০৩]

○

দুনিয়ায় মানুষের প্রয়োজন শুধুমাত্র তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক, ও জীবন যাপনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করা এবং বিপদ-আপদ ও ক্ষতি থেকে সংরক্ষিত থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবন যাপন করার সঠিক পদ্ধতি জানাও তার একটি প্রয়োজন (এবং সবচেয়ে বড় প্রয়াজন)। তার আরো জানতে হবে, নিজের ব্যক্তিগত সত্তার সাথে, নিজের শক্তি-সামর্থ্য, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার সাথে পৃথিবীতে যে উপায়-উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জাম তার কর্তৃত্বাধীনে আছে তার সাথে, যে অসংখ্য মানুষের সাথে বিভিন্নভাবে তাকে জড়িত হতে হয় তাদের সাথে এবং সামগ্রিকভাবে যে বিশ্বব্যবস্থার আওতাধীনে তাকে কাজ করতে হয় তার সাথে তার কি ধরনের ব্যবহার করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে। এটা জানা এজন্য প্রয়োজন যেন তার জীবন সামগ্রিকভাবে সফলকাম হয় এবং তার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম বিভিন্ন ভুল পথে নিয়োজিত হয়ে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। এ সঠিক পদ্ধতির নাম হক বা সত্য আর যে পথনির্দেশনা মানুষকে এ পদ্ধতির দিকে নিয়ে যায় সেটিই 'হকের হেদায়াত' বা 'সত্যের পথনির্দেশনা'।

মানুষের সমস্ত প্রয়োজন দুই ধরনের। এক ধরনের প্রয়োজন হচ্ছে—তার একজন প্রতিপালক হবে, একজন আশ্রয়দাতা হবে, একজন প্রার্থনা শ্রবণকারী ও অভাব পূরণকারী হবে। এ কার্যকারণের জগতের অস্থায়ী ও অস্থিতিশীল সহায়গুলোর মধ্যেও হঠকারিতা ছাড়া মানুষের মুশরিকী ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) তামাদ্দুনিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির সাথে লেপটে থাকার আর কোনো কারণ থাকে না।[৪০৪]

○

দুনিয়ায় এমন কোনো জিনিস নেই যাকে তিনি নিজের গঠনাকৃতিকে কাজে লাগাবার এবং নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পদ্ধতি শেখাননি। কানকে শোনা ও চোখকে দেখা তিনিই শিখিয়েছেন। মাছকে সাঁতার কাটার ও পাখিকে ওড়ার শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন। গাছকে ফুল ও ফল দেবার ও মাটিকে উদ্ভিদ উৎপাদন করার নির্দেশ তিনিই দিয়েছেন। মোটকথা তিনি সারা বিশ্বজাহান এবং তার সমস্ত জিনিসের শুধুমাত্র স্রষ্টাই নন বরং তাদের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকও।[৪০৫]

○

আল্লাহ যিনি সমগ্র বিশ্বজাহানের পথনির্দেশক এবং যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে তার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে পথনির্দেশনা দিচ্ছেন, তাঁর পথনির্দেশনা দেবার বিশ্বজনীন দায়িত্বের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষের সচেতন জীবনের জন্যও পথনির্দেশনা দেবার ব্যবস্থা করবেন। আর মাছ ও মুরগীর জন্য যে ধরনের পথনির্দেশনা উপযোগী, মানুষের সচেতন জীবনের জন্য সে ধরনের পথনির্দেশনা উপযোগী হতে পারে না। এর সবচেয়ে মানানসই পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, একজন সচেতন মানুষ তাঁর পক্ষ থেকে মানুষদের পথ দেখাবার জন্য নিযুক্ত হবেন এবং তিনি মানুষদের বুদ্ধি ও চেতনার প্রতি আবেদন জানিয়ে তাদেরকে সঠিক-সোজা পথ দেখাবেন।[৪০৬]

○

যে মুহূর্তে মানুষ দুনিয়ায় পদার্পণ করে তখনই তার মায়ের বুকে দুধের ধারা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে কোনো অদৃশ্য শক্তি তাকে স্তন চোষার ও গলা দিয়ে দুধ নিচের দিকে নামিয়ে নেবার কায়দা শিখিয়ে দেয়। তারপর প্রতিপালন, প্রশিক্ষণ ও পথপ্রদর্শনের কাজ প্রথম দিন থেকে শুরু হয়ে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বরাবর চালু থাকে। জীবনের প্রতি পর্যায়ে মানুষের নিজের অস্তিত্ব, বিকাশ, উন্নয়ন ও স্থায়িত্বের জন্য যেসব ধরনের সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় তা সবই তার স্রষ্টা পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সর্বত্রই সঠিকভাবে যোগান দিয়ে রেখেছেন। এ সাজ-সরঞ্জাম থেকে লাভবান হবার এবং একে কাজে লাগাবার জন্য তার যে ধরনের শক্তি ও যোগ্যতার প্রয়োজন সেসবও তার আপন সত্তায় সমাহিত রাখা হয়েছে। জীবনের প্রতিটি বিভাগে তার যে ধরনের পথনির্দেশনার প্রয়োজন হয় তা দেবার পূর্ণ ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন।[৪০৭]

○

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মানুষ যতই গবেষণা করছে ততই তার সামনে আল্লাহর এমনসব নিয়ামতের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে যা পূর্বে তার সম্পূর্ণ অগোচরে ছিল। আবার আজ পর্যন্ত যেসব নিয়ামতের জ্ঞান মানুষ লাভ করতে পেরেছে সেগুলো এমনসব নিয়ামতের তুলনায় তুচ্ছ যেগুলোর ওপর থেকে এখনো গোপনীয়তার পর্দা ওঠেনি।[৪০৮]

○

আমি তাকে শুধু জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই ছেড়ে দেইনি, বরং এগুলো দেয়ার সাথে সাথে তাকে পথও দেখিয়েছি, যাতে সে জানতে পারে শোকরিয়ার পথ কোন্‌টি এবং কুফরীর পথ কোন্‌টি। এরপর যে পথই সে অবলম্বন করুক না কেন তার জন্য সে নিজেই দায়ী। এ বিষয়টিই সূরা আল বালাদে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ "আমি তাকে দুটি পথ (অর্থাৎ ভাল ও মন্দ পথ) স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি।" সূরা আশ শামসে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে ঃ سَوَّىٰهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا "শপথ (মানুষের) প্রবৃত্তির আর সে সত্তার যিনি তাকে (সব রকম বাহ্যিক) ও অভ্যন্তরীণ শক্তি দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। আর পাপাচার ও তাকওয়া-পরহেযগারীর অনুভূতি দুটোই তার ওপর ইলহাম করেছেন।" এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সামনে রেখে বিচার করলে এবং পৃথিবীতে মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা যেসব ব্যবস্থার কথা কুরআন মজীদে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন তাও সামনে রাখলে বুঝা যায় যে, এ আয়াতে পথ দেখানোর যে কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা পথপ্রদর্শনের কোনো একটি মাত্র পন্থা ও উপায় বুঝানো হয়নি, বরং এর দ্বারা অনেক পন্থা ও উপায়ের কথা বলা হয়েছে যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। যেমন ঃ

এক ঃ প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির যোগ্যতা দেয়ার সাথে সাথে তাকে একটি নৈতিক বোধ ও অনুভূতি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে প্রকৃতিগতভাবেই ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে, কিছু কাজ-কর্ম ও বৈশিষ্ট্যকে খারাপ বলে জানে, যদিও সে নিজেই তাতে লিপ্ত। আবার কিছু কাজ-কর্ম ও গুণাবলীকে ভাল বলে মনে করে যদিও সে নিজে তা থেকে দূরে অবস্থান করে। এমন কি যেসব লোক তাদের স্বার্থ ও লোভ-লালসার কারণে এমন সব দর্শন রচনা করেছেন যার ভিত্তিতে তারা অনেক খারাপ ও পাপকার্যকেও নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছে তাদের অবস্থাও এমন যে, সে একই মন্দ কাজ করার অভিযোগ যদি কেউ তাদের ওপর আরোপ

করে, তাহলে তারা প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠবে এবং তখনই জানা যায় যে, নিজেদের মিথ্যা ও অলীক দর্শন সত্ত্বেও বাস্তবে তারা নিজেরাও সেসব কাজকে খরাপই মনে করে থাকে। অনুরূপ ভাল কাজ ও গুণাবলীকে কেউ মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা এবং সেকেলে ঠাওরিয়ে রাখলেও কোনো মানুষের কাছ থেকে তারা যখন নিজেরাই নিজেদের সদাচরণের সুফল বা উপকার লাভ করে তখন তারা সেটিকে মূল্যবান মনে করতে বাধ্য হয়ে যায়।

দুই ঃ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা বিবেক (তিরস্কারকারী নফস) বলে একটি জিনিস রেখে দিয়েছেন। যখন সে কোনো মন্দ কাজ করতে উদ্যত হয় অথবা করতে থাকে অথবা করে ফেলে তখন এ বিবেকই তাকে দংশন করে। যতই হাত বুলিয়ে বা আদর-সোহাগ দিয়ে মানুষ এ বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে দিক, তাকে অনুভূতিহীন বানানোর যত চেষ্টাই সে করুক সে তাকে একদম নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম নয়। হঠকারী হয়ে দুনিয়ায় সে নিজেকে চরম বিবেকহীন প্রমাণ করতে পারে, সে সুন্দর সুন্দর অজুহাত খাড়া করে দুনিয়াকে ধোঁকা দেয়ার সব রকম প্রচেষ্টা চালাতে পারে, সে নিজের বিবেককে প্রতারিত করার জন্য নিজের কর্মকাণ্ডের সপক্ষে অসংখ্য ওযর পেশ করতে পারে ; কিন্তু এসব সত্ত্বেও আল্লাহ তার স্বভাব-প্রকৃতিতে যে হিসেব পরীক্ষককে নিয়োজিত রেখেছেন সে এত জীবন্ত ও সজাগ যে, সে নিজে প্রকৃতপক্ষে কি তা কোনো অসৎ মানুষের কাছেও গোপন থাকে না। সূরা আল কিয়ামায় একথাটিই বলা হয়েছে যে, "মানুষ যত ওযরই পেশ করুক না কেন সে নিজেকে নিজে খুব ভাল করেই জানে।"

–আয়াত ঃ ১৫

তিন ঃ মানুষের নিজের সত্তায় এবং তার চারপাশে যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত গোটা বিশ্বজাহানের সর্বত্র এমন অসংখ্য নিদর্শনাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, এতসব জিনিস কোনো আল্লাহ ছাড়া হতে পারে না কিংবা বহুসংখ্যক খোদা এ বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা বা পরিচালক হতে পারে না। বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র এবং মানুষের আপন সত্তার অভ্যন্তরে বিদ্যমান এ নিদর্শনাবলীই কিয়ামত ও আখেরাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছে। মানুষ যদি এসব থেকে চোখ বন্ধ করে থাকে অথবা বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগিয়ে এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা না করে অথবা তা যেসব সত্যের প্রতি ইংগিত করছে তা মেনে নিতে টালবাহানা ও গড়িমসি করে তাহলে তা তার নিজেরই অপরাধ। আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে তার সামনে সত্যের সন্ধান দাতা নিদর্শনাদি পেশ করতে আদৌ কোনো অসম্পূর্ণতা রাখেননি।

চার ঃ মানুষের নিজের জীবনে, তার সমসাময়িক পৃথিবীতে এবং তার পূর্বের অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতায়, এমন অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং হয়ে থাকে যা প্রমাণ করে যে, একটি সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর শাসন-কর্তৃত্ব তার ওপর এবং সমগ্র বিশ্বজাহানের ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন যাঁর সামনে সে নিতান্তই অসহায়। যাঁর ইচ্ছা সবকিছুর ওপর বিজয়ী এবং যাঁর সাহায্যের সে মুখাপেক্ষী। এসব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বাহ্যিক ক্ষেত্রসমূহেই শুধু এ সত্যের প্রমাণ পেশ করে না, বরং মানুষের নিজের প্রকৃতির মধ্যেও সে সর্বোচ্চ শাসন-কর্তৃত্বের প্রমাণ বিদ্যমান যার কারণে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে খারাপ সময়ে নাস্তিকরা আল্লাহর সামনে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে এবং কট্টর মুশরিকরাও সব মিথ্যা খোদাকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে।

পাঁচ ঃ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতিগত জ্ঞানের অকাট্য ও চূড়ান্ত রায় হলো অপরাধের শাস্তি এবং উত্তম কার্যাবলীর প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ার প্রত্যেক সমাজে কোনো না কোনো রূপে বিচার-ব্যবস্থা কায়েম করা হয় এবং যেসব কাজ-কর্ম প্রশংসনীয় বলে মনে করা হয় তার জন্য পুরস্কার ও প্রতিদান দেয়ারও কোনো না কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নৈতিকতা এবং প্রতিদান বা ক্ষতিপূরণ আইনের মধ্যে এমন একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান যা অস্বীকার করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। একথা যদি স্বীকার করা হয় যে, এ পৃথিবীতে এমন অসংখ্য অপরাধ আছে যার যথাযোগ্য শাস্তি তো দূরের কথা আদৌ কোনো শাস্তি দেয়া যায় না এবং এমন অসংখ্য সেবামূলক ও কল্যাণকর কাজ আছে যার যথাযোগ্য প্রতিদান তো দূরের কথা কাজ সম্পাদনকারী আদৌ কোনো প্রতিদান লাভ করতে পারে না তাহলে আখেরাতকে মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। তবে কোনো নির্বোধ যদি মনে করে অথবা কোনো হঠকারী ব্যক্তি যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকে যে, ন্যায় ও ইনসাফের ধারণা পোষণকারী মানুষ এমন এক পৃথিবীতে জন্মলাভ করে ফেলেছে যেখানে ন্যায় ও ইনসাফের ধারণা একেবারেই অনুপস্থিত তবে সেটা আলাদা কথা। এরপর অবশ্য একটি প্রশ্নের জওয়াব দেয়া তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে পড়ে। তাহলো, এমন এক বিশ্বে জন্মলাভকারী মানুষের মধ্যে ইনসাফের এ ধারণা এলো কোথা থেকে?

ছয় ঃ এসব উপায়-উপকরণের সাহায্যে মানুষকে হেদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে নবী পাঠিয়েছেন এবং

কিতাব নাযিল করেছেন। এসব কিতাবে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, শোকরের পথ কোন্‌টি ও কুফরের পথ কোন্‌টি এবং এ দুটি পথে চলার পরিণামই বা কি ? নবী-রাসূল এবং তাঁদের আনীত কিতাবসমূহের শিক্ষা জানা-অজানা, দৃশ্য-অদৃশ্য অসংখ্য উপায় ও পন্থায় এত ব্যাপকভাবে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে যে, কোনো জনপদই আল্লাহ ও আখেরাতের ধারণা, সৎ ও অসৎকাজের পার্থক্য বোধ এবং তাঁদের পেশকৃত নৈতিক নীতিমালা ও আইন-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ নয়, নবী-রাসূলদের আনীত কিতাবসমূহের শিক্ষা থেকেই তারা এ জ্ঞান লাভ করেছে তা তাদের জানা থাক বা না থাক। বর্তমানে যেসব লোক নবী-রাসূলগণ এবং আসমানী কিতাবসমূহকে অস্বীকার করে অথবা তাঁদের সম্পর্কে কোনো খবরই রাখে না তারাও এমন অনেক জিনিস অনুসরণ করে থাকে যা মূলত ঐসব শিক্ষা থেকে উৎসারিত ও উৎপন্ন হয়ে তাদের কাছে পৌঁছেছে। অথচ মূল উৎস কি সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না।[৪০৭]

○

(১০৮)

আল বাদী'উ : اَلْبَدِيْعُ

বাদী'উস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ :

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থ : আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা।

ব্যাখ্যা : সূরা আল বাকারায় এরশাদ হয়েছে :

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ○

"তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি যে বিষয়েই সিদ্ধান্ত নেন সে সম্পর্কে কেবলমাত্র হুকুম দেন, 'হও' তাহলেই তা হয়ে যায়।"

—সূরা আল বাকারা : ১১৭

সূরা আল আনআমে বলা হয়েছে :

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ط -

"তিনি তো আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক। তাঁর কোনো সন্তান হতে পারে কেমন করে, যখন তাঁর কোনো জীবন সংগিনী নেই।"

—সূরা আল আনআম : ১০২

আকাশসমূহকে অদৃশ্য ও অননুভূত স্তম্ভসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপাতদৃষ্টে মহাশূন্যে—এমন কোনো জিনিস নেই, যা এ সীমাহীন মহাকাশ ও নক্ষত্র জগতকে ধরে রেখেছে। কিন্তু একটি অননুভূত শক্তি তাদের প্রত্যেককে তার নিজের স্থানে ও আবর্তন পথের ওপর আটকে রেখেছে এবং মহাকাশের এ বিশাল বিশাল নক্ষত্রগুলোকে পৃথিবীপৃষ্ঠে বা তাদের পরস্পরের ওপর পড়ে যেতে দিচ্ছে না।[৪১০]

○

তাঁর হুকুমে (আকাশ ও পৃথিবী) একবার অস্তিত্ব লাভ করেছে শুধু এতটুকু নয় বরং তাদের সবসময় প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং তাদের মধ্যে একটি বিশাল নির্মাণ কারখানার প্রতিনিয়ত সচল থাকাও তাঁরই হুকুমের বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যও যদি তার হুকুম তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত না রাখে, তাহলে এ সমগ্র ব্যবস্থা এক নিমিষেই ওলটপালট হয়ে যাবে।[৪১১]

○

কেবল এতটুকুই সত্য নয় যে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা আল্লাহ! বরং পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে যেসব জিনিস পাওয়া যায় তিনিই এসবের মালিক। আল্লাহ তাঁর এ বিশ্বজাহান সৃষ্টি করে একে এমনিই ছেড়ে দেননি যে, যে কেউ চাইলে এর বা এর কোনো অংশের মালিক হয়ে বসবে। নিজের সৃষ্টির তিনি নিজেই মালিক। এ বিশ্বজাহানে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন।[৪১২]

○

এ সমগ্র বিশ্বজাহান এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে মহান আল্লাহই এসবের স্রষ্টা। তাঁর সত্তা ছাড়া বাকি এখানে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি। মহান আল্লাহ এ দুনিয়া সৃষ্টি করার পর কোথাও গিয়ে ঘুমিয়েও পড়েননি। বরং তিনিই নিজের এ রাজ্যের সিংহাসনে আসীন এবং শাসনকর্তা হয়েছেন।[৪১৩]

○

বিশ্বজাহান সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয়, আমাদের এ ক্ষুদ্র পৃথিবীটি যেসব উপাদানে গঠিত, এ সমগ্র বিশ্বজাহান সে একই উপাদানে গঠিত হয়েছে এবং এর মধ্যে আমাদের পৃথিবীর মতো একই নিয়ম সক্রিয় রয়েছে। নয়তো এ পৃথিবীতে বসে আমরা যে অতি দূরবর্তী বিশ্বগুলো পর্যবেক্ষণ করছি, তাদের দূরত্ব পরিমাপ করছি এবং তাদের গতির হিসেব কষছি এসব কোনোক্রমেই সম্ভবপর হতো না। এসব কি একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় যে, এ সমস্ত বিশ্বজাহান একই আল্লাহর সৃষ্টি এবং একই শাসকের রাজ্য ?[৪১৪]

○

সূরা হা-মীম আস্ সাজদায় এরশাদ হয়েছে ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ - حم السجدة : ١١

"তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেছেন যা সেই সময় কেবল ধূঁয়া ছিল।"–সূরা হা-মীম আস্ সাজদা ঃ ১১

ধূঁয়া বলতে বস্তুর এ প্রাথমিক অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ এ জিনিসকেই নীহারিকা (Ncbula) বলে ব্যাখ্যা করেন। বিশ্বজাহান সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণাও হচ্ছে, যে বস্তু থেকে বিশ্বজাহান সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টির পূর্বে তা এই ধূঁয়া অথবা নীহারিকার আকারে ছড়ানো ছিল।[৪১৫]

○

আল বাকী ঃ اَلْبَاقِىْ

অর্থ ঃ চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আর রাহমানে বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْإِكْرَامِ ۝-

"এ ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিটি জিনিসই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার মহীয়ান ও দয়াবান রবের সত্তাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।"

-সূরা আর রহমান ঃ ২৬-২৭

অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী শুধুমাত্র মহা সম্মানিত ও সুমহান আল্লাহর সত্তা, এ বিশাল বিশ্বজাহান যার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং যাঁর বদান্যতায় তোমাদের ভাগ্যে এসব নিয়ামত জুটেছে। এখন যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ "আমার চেয়ে কেউ বড় নেই" এ গর্বে গর্বিত হয় তাহলে এটা তার বুদ্ধির সংকীর্ণতা ছাড়া কিছুই নয়। কোনো নির্বোধ যদি তার ক্ষমতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ডঙ্কা বাজায়, কিংবা কতিপয় মানুষ তার কর্তৃত্ব স্বীকার করায় সে তাদের খোদা হয়ে বসে, তাহলে তার এ মিথ্যার বেসাতি কতদিন চলতে পারে ? মহাবিশ্বের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে পৃথিবীর অনুপাত যেখানে মটরশুটির দানার মতও নয়, তার এক নিভৃত কোণে দশ বিশ কিংবা পঞ্চাশ ষাট বছর যে কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চলে এবং তারপরই অতীত কাহিনীতে রূপান্তরিত হয় তা এমন কোন্ কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যার জন্য কেউ গর্ব করতে পারে ?

মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া তোমরা আর যেসব সত্তাকেই উপাস্য, বিপদে রক্ষাকারী ও অভাব মোচনকারী হিসেবে গ্রহণ করে থাক তারা ফেরেশতা, নবী-রাসূল, অলী-দরবেশ কিংবা চন্দ্র-সূর্য বা অন্য কোনো সৃষ্টি যাই হোক না কেন তাদের কেউই তোমাদের কোনো প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম নয়। অভাব মোচন ও প্রয়োজন পূরণের জন্য ওরা নিজেরাই তো মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাদের নিজেদের হাতই তার সামনে প্রসারিত। তারা নিজেদের ক্ষমতায় নিজের বিপদই যেখানে দূর করতে পারে না সেখানে সে তোমাদের বিপদ মোচন কি করে করবে ? পৃথিবী থেকে আকাশ রাজ্য পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত এ মহাবিশ্বে যা কিছু

হচ্ছে, শুধু এক আল্লাহর নির্দেশেই হচ্ছে। মহান এ কর্মকাণ্ডে আর কারো কোনো কর্তৃত্ব ও আধিপত্য নেই। তাই কোনো ব্যাপারেই সে কোনো বান্দার ভাগ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।[৪১৬]

○

আল্লাহ শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই চিরস্থায়ী। যেমন–সূরা ত্বাহায় বলা হয়েছে–

وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○ - طه : ٧٣

"আল্লাহই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই স্থায়িত্ব লাভকারী।"–সূরা ত্বাহা ঃ ৭৩

এই বিশ্বজাহানে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী নয় এবং ছোট বড় কেউ-ই এমন নেই যে, তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয়।[৪১৭]

○

১১০

আল ওয়ারিসু ঃ اَلْوَارِثُ

অর্থ ঃ প্রকৃত উত্তরাধিকারী

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আল হিজ্‌র-এ বলা হয়েছে ঃ

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ۝

"জীবন ও মৃত্যু আমিই দান করি এবং আমিই হব সবার উত্তরাধিকারী।"–সূরা আল হিজ্‌র ঃ ২৩

অর্থাৎ তোমাদের ধ্বংসের পরে একমাত্র আমিই টিকে থাকবো। তোমরা যা কিছু পেয়েছো, ওগুলো নিছক সাময়িকভাবে ব্যবহার করার জন্য পেয়েছো। শেষ পর্যন্ত আমার দেয়া সব জিনিস ত্যাগ করে তোমরা এখান থেকে বিদায় নেবে একেবারে খালি হাতে এবং এসব জিনিস যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি আমার ভাণ্ডারে থেকে যাবে।[৪১৮]

○

সূরা আল আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَاتَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۝

"আর যাকারিয়ার কথা (স্মরণ করো), যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল ঃ 'হে আমার প্রতিপালক!' আমাকে একাকী ছেড়ে দিও না এবং সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তো তুমিই।"-সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৯

মানে হচ্ছে, তুমি সন্তান না দিলে কোনো দুঃখ নেই। তোমার পবিত্র সত্তা-উত্তরাধিকারী হবার জন্য যথেষ্ট।[৪১৯]

○

পৃথিবী ও আকাশের যে কোনো জিনিসই যে কেউ ব্যবহার করছে তা আসলে আল্লাহর মালিকানাধীন। তার ওপর সৃষ্টির আধিপত্য ও তাকে ব্যবহার করার অধিকার সাময়িক। প্রত্যেককেই অবশ্যি তার দখল ছাড়তে হবে। অবশেষে সবকিছুই আল্লাহর কাছে চলে যাবে।[৪২০]

○

যেমন সূরা আস সাবায় বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ط وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ج وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○ - سبا : ٣٩

"(হে নবী!) তাদেরকে বলো, আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান মুক্ত হস্তে রিযিক দান করেন এবং যাকে চান মাপাযোপা দেন। যা কিছু তোমরা ব্যয় করে দাও তার জায়গায় তিনি তোমাদের আরো দেন, তিনি সব রিযিকদাতার চেয়ে ভালো রিযিকদাতা।"
–সূরা আস সাবা ঃ ৩৯

সূরা আল কাসাসে বলা হয়েছে ঃ

وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ○ القصص : ٥

"তাদেরকে নেতৃত্ব দান করবো এবং তাদেরকেই উত্তরাধিকারী করবো।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৫

وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ -

"শেষ পর্যন্ত আমিই হয়েছি উত্তরাধিকারী।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৫৮

সূরা মারইয়ামে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ○ - مريم : ٤٠

"শেষ পর্যন্ত আমিই হবো পৃথিবী ও তার সমস্ত জিনিসের উত্তরাধিকারী এবং সবকিছু আমারই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।"
–সূরা মারইয়াম ঃ ৪০

কোনো মানুষ পৃথিবীতে সর্বাধিক সম্পদ লাভ করলেও স্বল্পতম সময়ের জন্যই লাভ করেছে। সে কয়েক বছর মাত্র তা ভোগ করে তারপর সবকিছু ছেড়ে খালি হাতে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যায়। তাছাড়া সে সম্পদ যত অঢেলই হোক না কেন বাস্তবে তার একটা ক্ষুদ্রতম অংশই ব্যক্তির ব্যবহারে আসে। এ ধরনের সম্পদের কারণে গর্বিত হওয়া এমন কোনো মানুষের কাজ নয় যে, নিজের এ অর্থ-সম্পদের এবং এ পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে।[৪২১]

○

(১১১)

আর রাশীদু, আর রাশিদু : اَلرَّشِيْدُ، اَلرَّاشِدُ

অর্থ : সঠিক পথ প্রদর্শনকারী।

ব্যাখ্যা : দুনিয়ায় মানুষের প্রয়োজন শুধুমাত্র তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও জীবনযাপনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করা এবং বিপদ-আপদ ও ক্ষতি থেকে সংরক্ষিত থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবনযাপন করার সঠিক পদ্ধতি জানাও তার একটি প্রয়োজন (এবং সবচেয়ে বড় প্রয়োজন)। তার আরো জানতে হবে, নিজের ব্যক্তিগত সত্তার সাথে, নিজের শক্তি-সামর্থ, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার সাথে, পৃথিবীতে যে উপায়-উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জাম তার কর্তৃত্বাধীনে আছে তার সাথে, যে অসংখ্য মানুষের সাথে বিভিন্নভাবে তাকে জড়িত হতে হয় তাদের সাথে তার কি ব্যবহার করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে। এটা জানা এ জন্য প্রয়োজন, যেন তার জীবন সামগ্রিকভাবে সফলকাম হয় এবং তার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম বিভিন্ন ভুল পথে নিয়োজিত হয়ে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। এটা মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন যে, তার এমন একজন পথ প্রদর্শক থাকতে হবে যিনি দুনিয়ায় বসবাস করার সঠিক নীতি নির্ধারণ করে দেবেন এবং যার দেয়া জীবন বিধানের আনুগত্য পরিপূর্ণ অবস্থায় করা যেতে পারে। আর এ প্রয়োজন পূরণকারী একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই।[৪২২]

○

(১১২)

আস্ সাবূরু : اَلصَّبُوْرُ

অর্থ : অত্যধিক ধৈর্য ধারণকারী।

আল কুরআনে এ নামটির উল্লেখ নেই।

১১৩

আর রাব্বু : اَلـرَّبُّ

অর্থ : প্রতিপালক, প্রভু, মালিক, শাসক।

ব্যাখ্যা : আল কুরআনে বলা হয়েছে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○ـ الفاتحة : ١

"প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল বিশ্ব জাহানের রব।"–সূরা আল ফাতিহা : ১

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ـ

"হে মানব জাতি! ইবাদাত করো তোমাদের রবের, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের সবার সৃষ্টিকর্তা।"
–সূরা আল বাকারা : ২১

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○ ـ

"বলো, আসলে আল্লাহর হেদায়াতই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল হেদায়াত এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে, বিশ্বজাহানের প্রভুর সামনে আনুগত্যের শির নত করে দাও।"
–সূরা আল আনআম : ৭১

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ط ـ الانعام : ١٦٤

"বলো, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো রবের সন্ধান করবো অথচ তিনিই সকল কিছুর মালিক ?"–সূরা আনআম : ১৬৪

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط ـ الرعد : ١٦

"এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশ ও পৃথিবীর রব কে ?"
–সূরা আর রাআদ : ১৬

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ○ـ الانبياء : ٢٢

"কাজেই এরা যেসব কথা বলে বেড়াচ্ছে আরশের প্রভু আল্লাহ তা থেকে পাক পবিত্র।"–সূরা আল আম্বিয়া : ২২

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ○ ـ

"কাজেই প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহ্ হচ্ছেন উচ্চতর ও উন্নততর, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, সম্মানিত আরশের তিনিই মালিক।"
–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১১৬

ر - بَ - ب -ধাতু থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন। এর প্রাথমিক এবং মৌলিক অর্থ প্রতিপালন। অতপর তা থেকে ভোগ-ব্যবহার, তত্ত্বাবধান, অবস্থার পরিবর্তন সাধন, সমাপ্তিকরণ এবং পরিপূর্ণতা বিধানের অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। এরই ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে প্রাধান্য, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, আধিপত্য এবং প্রভুত্বের অর্থ। অভিধানে এর ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ এই ঃ

এক ঃ প্রতিপালন করা, ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতি সাধন এবং বর্ধিত করণ। উদাহরণস্বরূপ– পালক পুত্রকে রবীব (ربيب) এবং পালক কন্যাকে (ربيبة) রবীবা বলা হয়। বিমাতার গৃহে প্রতিপালিত শিশুকেও রবীবী (ربيب) বলা হয়। লালন-পালনকারী দাইকেও রবীবা (ربيبة) বলা হয়। বিমাতাকে বলা হয় রাব্বাহ (رابه)। কারণ তিনি মাতা না হলেও শিশুর লালন-পালন করেন। এ কারণেই সৎ-পিতাকে বলা হয় رابّ (রাব্বুন)। যে ঔষধ হেফাযত করে রাখা হয়, তাকে বলা হয় মোরাব্বাব বা মোরাব্বা (مربب - مربى)। رب يرب ربا -এর অর্থ সংযোজন করা, বর্ধিত করা এবং সমাপ্তিতে নিয়ে যাওয়া। যথা رب النعمة -এর অর্থ—অনুগ্রহে সংযোজন করেছে বা অনুগ্রহের শেষ সীমায় পৌঁছেছে।

দুই ঃ সংকুচিত করা, সংগ্রহ করা এবং একত্রিত করা। যেমন, বলা হয় فلان يرب الناس অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি লোকদেরকে একত্রিত করে বা তার কাছে সব লোক জড়ো হয়। একত্রে মিলিত হওয়ার স্থানকে বলা হবে (مـــرب) 'মারাব্ব' সংকুচিত হওয়া এবং সংগৃহিত হওয়াকে বলা হবে তারাব্বুব (تربب)।

তিন ঃ তত্ত্বাবধান করা, অবস্থার সংশোধন-পরিবর্তন সাধন করা, দেখাশোনা করা এবং জামিন হওয়া। যেমন, رب ضيعته এর অর্থ হবে— অমুক ব্যক্তি তার সম্পত্তির দেখাশোনা এবং তত্ত্বাবধান করেছে। আবু সুফিয়ানকে ছাফওয়ান বলেছিলেন ঃ

لِاَنْ يَّرُبَّنِىْ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ يَّرُبَّنِىْ رَجُلٌ مِّنْ هَوَازِنَ-

হাওয়াযিনের কোনো ব্যক্তি আমাকে লালন-পালন করার চেয়ে কুরাইশের কোনো ব্যক্তি আমাকে পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রহণ করা আমার কাছে অধিক প্রিয়।

আলকামা ইবনে ওবায়দার একটি কবিতা ঃ

وَكُنْتُ امْرَأً اَفْضَتْ اِلَيْكَ رِبَابَتِيْ
وَقَبْلَكَ رَبَّتْنِيْ فَضِعْتُ رُبُوْبِيْ -

"তোমার পূর্বে যে সত্তারা আমার মুরুব্বী ছিলো, আমি তাকে খুইয়ে বসেছি, অবশেষে আমার লালন-পালনের ভার তোমার হাতে এসেছে।"

কবি ফরযদাক বলেন ঃ

كَانُوْا كَسَاتِلَةٍ حَمْقَاءَ اِذْ حَقَنَتْ
سَلاَءَ هَا فِيْ اَدِيْمٍ غَيْرِ مَرْبُوْبٍ -

এ কবিতায় اديم غير مربوب-এর অর্থ—যে চামড়ার লোম পৃথক করা হয়নি, যে চামড়াকে দাবাগত করে পরিষ্কার করা হয়নি। فلان يرب صنعته عند فلان এর অর্থ হবে—অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির কাছে আপন পেশার কাজ করে অথবা তার কাছে কারিগরী শিক্ষা লাভ করে।

চার ঃ প্রাধান্য, কর্তৃত্ব, সর্দারী, হুকুম চালানো, ব্যবহার করা, যথা- قد رب فلان قومه অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি আপন জাতিকে নিজের অনুগত করে নিয়েছে। ربيت القوم অর্থাৎ আমি জাতির ওপর হুকুম চালিয়ে কর্তা সেজে বসেছি। লবীদ ইবনে রবীয়া বলেন ঃ

وَاَهْلَكْنَ يَوْمًا رَبَّ كِنْدَةَ وَابْنَه
وَرَبَّ مَعَدٍ بَيْنَ خَبْتٍ وَعَرْعَرٍ

এখানে رب كندة মানে কিন্দার সরদার সে কবীলায় যার হুকুম চলতো। এ অর্থেই নাবেগা যুবইয়ানীর কবিতা ঃ

تُخِبُّ اِلَى النُّعْمَانِ حَتَّى تَنَالَه
فِدًى لَكَ مِنْ رَبٍّ تَلِيْدِيْ وَلاَرِفِيْ -

পাঁচ ঃ মালিক হওয়া। যেমন হাদীস শরীফে আছে, নবী (স) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছেন ارب غنم ام رب ابل ঃ তুমি কি বকরির মালিক, না উটের ? এ অর্থে ঘরের মালিককে رب الدار (রব্বুদ্দার), উষ্ট্রীর মালিককে رب الناقة (রব্বুন্নাকাহ) এবং সম্পত্তির মালিককে رب الضيعة (রাব্বুয-যাইয়াহ) বলা হয়। মুনিব অর্থেও রব শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং আব্দ (عبد) বা গোলামের বিপরীত অর্থে বলা হয়। অজ্ঞতাবশত রব

শব্দকে শুধু পরওয়ারদিগার প্রতিপালকের অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। রুবুবিয়াতের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে– هو انشاء الشئ حالا فحالا الى حد التمام ঃ একটি জিনিসকে পর্যায়ক্রমে তরক্কী দিয়ে পূর্ণতার শেষ পর্যায়ে উন্নীত করা। অথচ এটা হচ্ছে শব্দটির ব্যাপক অর্থের একটি অর্থ মাত্র, এর পূর্ণ অর্থ নয়। এর পূর্ণ ব্যাপকতা পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থসমূহ প্রকাশ করে ঃ

এক ঃ প্রতিপালক, প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহকারী তরবিয়ত এবং ক্রমবিকাশ দাতা।

দুই ঃ যিম্মাদার, তত্ত্বাবধায়ক, দেখা-শোনা এবং অবস্থার সংশোধন পরিবর্তনের দায়িত্বশীল।

তিন ঃ যিনি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোক সমবেত হয়।

চার ঃ নেতা-সর্দার, যার আনুগত্য করা হয় ; ক্ষমতাশালী কর্তা ব্যক্তি, যার নির্দেশ চলে, যার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়, হস্তক্ষেপ এবং বল প্রয়োগের অধিকার আছে যার।

পাঁচ ঃ মালিক-মুনিব।

কুরআনে রব শব্দের ব্যবহার

কুরআন মজীদে রব শব্দটি এসব অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও এসবের কোনো এক বা দুই অর্থ উদ্দেশ্য ; কোথাও এর চেয়েও বেশী, আর কোথাও পাঁচটি অর্থই এক সাথে বুঝান হয়েছে। কুরআনের আয়াত থেকে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে আমরা এ বিষয়টি স্পষ্ট করবো।

প্রথম অর্থে ঃ

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ط - يوسف : ٢٣

"সে বললো ঃ খোদার আশ্রয়! যিনি আমাকে ভালোভাবে রেখেছেন, তিনিই তো আমার রব।"[১]–সূরা ইউসুফ ঃ ২৩

---

১. কেউ যেন ধারণা করে না বসে যে, হযরত ইউসুফ (আ) আযীয মিসরকে তাঁর রব বলেছেন। কোনো কোনো তাফসীরকার এমন সন্দেহও করেছেন। মূলত 'সে' বলে খোদার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি যার আশ্রয় চেয়েছেন, বলেছেন– معاذ الله انه ربى ঃ খোদাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা যখন নিকটে উল্লেখিত রয়েছে, তখন অনুল্লেখিত 'মুশারুন ইলাইহে' খুঁজে বেড়াবার দরকারই বা কিসের ?

দ্বিতীয় অর্থে ঃ প্রথম অর্থের ধারণাও যাতে অল্প-বিস্তর শামিল রয়েছে ঃ

فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلاَّ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ۝ وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ۝ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۝ الشعراء : ٧٧-٨٠

"বিশ্বজাহানের রব, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমাকে পথ প্রদর্শন করেন, পানাহার করান, আমি পিড়ীত হলে আরোগ্য দান করেন, তিনি ছাড়া তোমাদের এ সকল রব তো আমার দুশমন।"
–সূরা আশ শুআরা ঃ ৭৭-৮০

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ ۝ ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝ - النحل : ٥٣-٥٤

"তোমরা যে নিয়ামত-সম্ভোগই লাভ করেছো, তা লাভ করেছো আল্লাহর তরফ থেকে। অতঃপর তোমাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে হতচকিত হয়ে তোমরা তাঁর হুজুরেই প্রত্যাবর্তন করো। কিন্তু তিনি যখন তোমাদের বিপদ কেটে নেন, তখন তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা (নিয়ামত দান এবং দুর্যোগ মুক্তিতে) আপন রব-এর সাথে অন্যদেরকেও শরীক করতে শুরু করে।"
–সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ৫৩-৫৪

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ط - الانعام : ١٦٤

"বল, আল্লাহ ছাড়া আমি কি অপর কোনো রব তালাশ করবো ? অথচ তিনিই তো হচ্ছেন সবকিছুর রব।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৬৪

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً ۝ - المزمل : ٩

"তিনি মাশরিক-মাগরিব—প্রাচ্য-প্রতীচ্যের রব। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং তাঁকেই তোমার উকিল (নিজের সকল ব্যাপারের যামিন ও যিম্মাদার) হিসেবে গ্রহণ করো।"-সূরা আল মুয্‌যাম্মিল ঃ ৯

هُوَ رَبُّكُمْ قف وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ – هود : ٣٤

"তিনিই তো তোমাদের রব, তোমরা ঘুরেফিরে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।"–সূরা হূদ ঃ ৩৪

ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ - الزمر : ٧

"অতপর তোমাদের রব-এর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।"
–সূরা আয্ যুমার ঃ ৭

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ـ سبا : ٢٦

"বল, আমাদের রব আমাদের উভয় দলকেই একত্রিত করবেন।"
–সূরা সাবা ঃ ২৬

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلاَّ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ط

مَافَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَئٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ○ ـ الانعام : ٣٨

"যমীনের বুকে বিচরণশীল যতো প্রাণী রয়েছে, আর দুটো পাখায় ভর করে যেসব পাখী উড়ছে, সে সবের মধ্যে এমন কিছুই নেই, যা তোমাদের মতো দল নয়। আমরা দপ্তরে কোনো বিষয়ের সন্নিবেশেই ক্রুটি করিনি। অবশেষে তাদের সকলকেই আপন রব-এর দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে।"–সূরা আল-আনআম ঃ ৩৮

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ○ ـ

"শিঙ্গায় ফুঁক দিবামাত্রই তারা নিজ নিজ ঠিকানা থেকে আপন রব-এর দিকে বেরিয়ে পড়বে।"-সূরা ইয়াসীন ঃ ৫১

তৃতীয় ও চতুর্থ অর্থে ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ التوبة : ٣١

"তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের দরবেশ, ওলামা-পাদ্রী-পুরোহিতদেরকে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে।"–সূরা তাওবা ঃ ৩১

وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط ـ ال عمران : ٦٤

"আর আমাদের কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে নিজের রব না বানায়।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪

দুটি আয়াতেই আরবাব (রব-এর বহুবচন) অর্থ সে সব ব্যক্তি, জাতি এবং জাতির বিভিন্ন দল, যাদেরকে সাধারণভাবে নিজেদের পথপ্রদর্শক এবং নেতা স্বীকার করে নিয়েছে। কোনো উর্ধতন অনুমোদন ছাড়াই যাদের আদেশ-নিষেধ, আইন-বিধান এবং হারাম-হালালকে স্বীকার করে নেয়া হতো, যাদেরকে রীতিমত আদেশ-নিষেধের অধিকারী মনে করা হতো।

اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّهٗ خَمْرًاۚ ...... وَقَالَ لِلَّذِىْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا

اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ ز فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ - يوسف : ٤١-٤٢

"(ইউসুফ বললেন) অবশ্য তোমাদের একজন তার রবকে শরাব পান করাবে....। তাদের দু'জনের মধ্যে যার সম্পর্কে ইউসুফের ধারণা ছিল, সে মুক্তি লাভ করবে। ইউসুফ তাকে বললেন, তোমার রব-এর কাছে আমার কথা বলো। কিন্তু শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিলো, তাই আপন রব-এর কাছে ইউসুফের কথা উল্লেখ করতে তার স্মরণ ছিল না।"

–সূরা ইউসুফ ঃ ৪১-৪২

فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ

قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ط اِنَّ رَبِّىْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ○ - يوسف : ٥٠

"বার্তাবাহক ইউসুফের কাছে হাজির হলে ইউসুফ তাকে বললো, তোমার রব-এর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যেসব মহিলারা নিজেরাই নিজেদের হাত কেটেছিল, তাদের কি অবস্থা। আমার রব-তো তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেনই।"

–সূরা ইউসুফ ঃ ৫০

এসব আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ) মিসরীয়দের সাথে কথাবার্তাকালে মিসরের শাসনকর্তা ফিরাউনকে—তাদের রব বলে বারবার উল্লেখ করেছেন কারণ, তারা তখন তার কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব এবং সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতো, তাকে আদেশ-নিষেধের অধিকারী জ্ঞান করতো, তখন সেই ছিল তাদের রব। পক্ষান্তরে হযরত ইউসুফ (আ) আল্লাহকে তাঁর রব বলছেন ; কারণ, তিনি মিসরের শাসনকর্তা ফিরাউনকে নয় বরং কেবল আল্লাহকেই সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং আদেশ-নিষেধের মালিক মনে করেন।

পঞ্চম অর্থে ঃ

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ○ الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ○ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ○

"সুতরাং তাদের উচিত, এ ঘরের মালিকের ইবাদাত করা, যিনি তাদের রিযিক সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ রেখেছেন।"–সূরা আল কুরাইশ ঃ ৩-৪

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ○ ـ الصفت : ١٨٠

"তোমার রব—যিনি সম্মান এবং ক্ষমতার মালিক—ওরা তাঁর সম্পর্কে যেসব দোষ-ত্রুটির কথা বলছে, তিনি সেসব থেকে মুক্ত-পবিত্র।"–সূরা আস সাফ্‌ফাত ঃ ১৮০

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○- النبياء : ٢٢

"আল্লাহ, যিনি আরশের মালিক—তারা যেসব দোষ-ত্রুটির কথা বলছে তিনি সেসব হতে মুক্ত-পবিত্র।"–সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ২২

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○- المؤمنون : ٨٦

"জিজ্ঞেস কর, সপ্ত আসমান এবং মহান আরশের মালিক কে ?"
–সূরা আল মুমিনূন ঃ ৮৬

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ○ - الصفت : ٥

"তিনি আসমান-যমীন এবং আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, তৎসমুদয়ের মালিক। যেসব বস্তুর ওপর সূর্য উদয় হয়, তিনি তারও মালিক।"–সূরা আস সাফ্‌ফাত ঃ ৫

وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ○- النجم : ٤٩

"আর তিনিই তো শি'য়রা (নক্ষত্র বিশেষের নাম)-এর মালিক, রব।"–সূরা আন নাজ্‌ম ঃ ৪৯

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে কুরআনের অবতরণকাল পর্যন্ত যতগুলো জাতিকে কুরআন যালেম, ভ্রান্ত চিন্তাধারার অধিকারী এবং বিপথগামী বলে উল্লেখ করেছে, তাদের কোনো একটি জাতিও আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না ; আল্লাহই যে রব ও ইলাহ—তাদের কেউ তা আদৌ অস্বীকার করতো না। অবশ্য তাদের সকলেরই আসল এবং যৌথ গোমরাহী এই ছিল যে, তারা রুবুবিয়াতের পাঁচটি অর্থকে—অভিধান এবং কুরআনের সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে শুরুতেই আমরা যা প্রতিপন্ন করেছি—দুটি ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছিল।

অতি-প্রাকৃতিকভাবে তিনি সৃষ্ট জীবের প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, অভাব-অভিযোগ পূরণ এবং দেখাশোনার জন্যে যথেষ্ট—রব এর এ অর্থ তাদের দৃষ্টিতে ভিন্ন অর্থজ্ঞাপক ছিল। এ অর্থ অনুযায়ী যদিও তারা আল্লাহকেই সর্বশ্রেষ্ঠ রব বলে স্বীকার করতো ; কিন্তু তার সাথে ফেরেশতা, দেবতা, জ্বিন, অদৃশ্য শক্তি, গ্রহ-নক্ষত্র, নবী-ওলী এবং পীর-পুরোহিতদেরকেও রুবুবিয়াতে শরীক করতো।

তিনি আদেশ-নিষেধের অধিকারী, সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক, হেদায়াত এবং পথনির্দেশের উৎস, আইন-বিধানের মূল, রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং সমাজ সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু—রবের এ ধারণা তাদের ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এ অর্থের দিক থেকে তারা হয় আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকেই রব মনে করতো ; অথবা মতবাদ হিসেবে আল্লাহকে রব মনে করলেও কার্যত মানুষের নৈতিক তমুদ্দুনিক এবং রাজনৈতিক রুবুবিয়াতের সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করতো।

এ গোমরাহী দূর করার জন্যেই শুরু থেকে নবী-রাসূলদের আবির্ভাব হয়েছে। আর এ জন্যেই শেষ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মাদ (স) আগমন করেছেন, তাঁদের সকলেরই দাওয়াত ছিল এই ঃ এ সকল অর্থে রব কেবল একজন। আর তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। রুবুবিয়াত অভিভাজ্য। কোনো অর্থেই কেউ রুবুবিয়াতের কোনো অংশ লাভ করতে পারে না। বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপনা এক পরিপূর্ণ ব্যবস্থার অধীন কেন্দ্রীয় বিধান। এক আল্লাহই তার স্রষ্টা। একই আল্লাহ তার ওপর কর্তৃত্ব করছেন। বিশ্বজাহানের সকল ক্ষমতা-ইখতিয়ারের মালিক এক আল্লাহ। বিশ্বজাহানের সৃষ্টিতে কারো কোনো দখল নেই ; পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনায়ও নেই তাঁর কোনো শরীক। শাসনকার্যেও নেই কেউ তাঁর অংশীদার। কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধিকার হিসেবে তিনি একাই তোমাদের অতি প্রাকৃতিক রব। নৈতিক, তমুদ্দুনিক এবং রাজনৈতিক রবও তিনিই। তিনিই তোমাদের মাবুদ, তিনিই তোমাদের রুকূ’-সিজদা পাওয়ার যোগ্য। তিনিই তোমাদের দোয়া-প্রার্থনার শেষ কেন্দ্রস্থল। তিনিই তোমাদের আশা-ভরসার অবলম্বন, তিনিই তোমাদের অভাব-অভিযোগ পূরণকারী। এমনিভাবে তিনিই বাদশাহ, মালেকুল মুলক্-রাজাধিরাজ। তিনিই আইন-বিধানদাতা, আদেশ-নিষেধের অধিকারী। রুবুবিয়াতের এ দুটি দিক জাহেলিয়াতের কারণে তোমরা যাকে পৃথক করে নিয়েছিলে—আসলে খোদায়ীর অপরিহার্য অংশ এবং আল্লাহর বৈশিষ্ট্য বিশেষ ; এর কোনোটিকেই একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, এর কোনো এক প্রকারেই কোনো সৃষ্ট জীবকে খোদার শরীক করা বৈধ নয়।

এ আয়াতগুলো পর্যায়ক্রমে অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট জানা যায় যে, কুরআন রুবুবিয়তকে সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ সমার্থক বলে প্রতিপন্ন করছে। আর রব-এর এ ধারণা আমাদের সামনে পেশ করছে যে, তিনি বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি, নিরংকুশ শাসক এবং লা-শরীক মালিক ও বিচারক।

এ হিসেবে তিনি আমাদের এবং সারা জাহানের প্রতিপালক, মুরুব্বী এবং অভাব-অভিযোগ পূরণকারী।

এ হিসেবে তিনি আমাদের তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক, কর্মধারক এবং পৃষ্ঠপোষক।

এ হিসেবে তাঁর ওফাদারী এমন এক প্রাকৃতিক ভিত্তি, যার ওপর আমাদের সমাজ জীবনের প্রাসাদ সুষ্ঠু সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাঁর কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি এবং দলের মধ্যে এক উম্মতের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

এ হিসেবে তিনি আমাদের এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলের বন্দেগী, আনুগত্য এবং অর্চনা পাওয়ার যোগ্য।

এ হিসেবে তিনি আমাদের এবং সমুদয় বস্তুর মালিক, মুনিব এবং একচ্ছত্র অধিপতি।

আরববাসী ও দুনিয়ার সকল অজ্ঞ-মূর্খ ব্যক্তিরা সকল যুগে এ ভুলে নিমজ্জিত ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে যে, রুবুবিয়তের এ ব্যাপক ধারণাকে তারা পাঁচটি ভিন্ন ধরনের রুবুবিয়াতে বিভক্ত করে ফেলে। নিজেদের ধারণা-কল্পনা দ্বারা তারা সিদ্ধান্ত করেছে যে, বিভিন্ন ধরনের রুবুবিয়াত বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে, এবং আছেও। কিন্তু কুরআন স্বীয় বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করেছে যে, সার্বভৌম ক্ষমতা যার হাতে ন্যস্ত থাকবে, তিনি ছাড়া রুবুবিয়াতের কোনো কর্ম কোনোও এক পর্যায়েই অন্য কোনো সত্তার হাতে ন্যস্ত হবে—বিশ্ব-চরাচরের এ পরিপূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় তার বিন্দুমাত্র অবকাশও নেই। এ ব্যবস্থার কেন্দ্রীকতা নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে যে, সকল প্রকার রুবুবিয়াত এক আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট, বিশেষিত, যিনি এ ব্যবস্থাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। সুতরাং এ ব্যবস্থার অধীনে অবস্থান করে যে ব্যক্তি রুবুবিয়াতের কোনো অংশও কোনো অর্থেই খোদা ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে করে বা কার্যত সম্পৃক্ত করে, বস্তুত সে ব্যক্তি বাস্তবতার সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং বাস্তবতার বিরুদ্ধে কাজ করে স্বয়ং নিজেকেই ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে।[৪২৩]

○

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করার সাথে সাথে পথনির্দেশনা, প্রতিপালন, দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। যে মুহূর্তে মানুষ দুনিয়ায় পদার্পণ করে তখনই তার মায়ের বুকে দুধের ধারা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে কোনো অদৃশ্য শক্তি তাকে স্তন চোষার ও গলা দিয়ে দুধ নীচের দিকে নামিয়ে নেবার কায়দা শিখিয়ে দেয়। তারপর এ প্রতিপালন, প্রশিক্ষণ ও পথ প্রদর্শনের কাজ প্রথম দিন থেকে শুরু হয়ে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বরাবর চালু থাকে। জীবনের প্রতি পর্যায়ে মানুষের নিজের অস্তিত্ব, বিকাশ, উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বের জন্য যেসব ধরনের সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয় তা সবই তার স্রষ্টা পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সর্বত্রই সঠিকভাবে যোগান দিয়ে রেখেছেন। এ সাজ-সরঞ্জাম থেকে লাভবান হবার এবং একে কাজে লাগাবার জন্য তার যে ধরনের শক্তি ও যোগ্যতার প্রয়োজন সেসবও তার আপন সত্তায় সমাহিত রাখা হয়েছে। জীবনের প্রতিটি বিভাগে তার যে ধরনের পথনির্দেশনার প্রয়োজন হয় তা দেবার পূর্ণ ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন। এ সংগে তিনি মানবিক অস্তিত্বের সংরক্ষণের এবং তাকে বিপদ-আপদ, রোগ-শোক, ধ্বংসকর জীবাণু ও বিষাক্ত প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য তার নিজের শরীরের মধ্যে এমন শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন মানুষের জ্ঞান এখনো যার পুরোপুরি সন্ধান লাভ করতে পারেনি। আল্লাহর এ শক্তিশালী প্রাকৃতিক ব্যবস্থা যদি না থাকতো, তাহলে সামান্য একটি কাঁটা শরীরের কোনো অংশে ফুটে যাওয়াও মানুষের জন্য ধ্বংসকর প্রমাণিত হতো এবং নিজের চিকিৎসার জন্য মানুষের কোনো প্রচেষ্টাই সফল হতো না। স্রষ্টার এ সর্বব্যাপী অনুগ্রহ ও প্রতিপালন কর্মকাণ্ড যখন প্রতি মুহূর্তে সকল দিক থেকে মানুষকে সাহায্য করছে তখন মানুষ তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো সত্তার সামনে মাথা নত করবে এবং প্রয়োজন পূরণ ও সংকট উত্তরণের জন্য অন্য কারো আশ্রয় গ্রহণ করবে, এর চেয়ে বড় মূর্খতা ও বোকামী এবং এর চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা আর কী হতে পারে ?[৪২৪]

○

১১৪

আল কাফী ঃ اَلْكَافِىْ

অর্থ ঃ যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আয্ যুমারে বলা হয়েছে ঃ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ- الزمر : ٣٦

"(হে নবী)! আল্লাহ নিজে কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন ?"
–সূরা আয্ যুমার ঃ ৩৬

সূরা আল হিজ্‌রে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

"যেসব বিদ্রূপকারী আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও ইলাহ বলে গণ্য করে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের ব্যবস্থা করার জন্য আমিই যথেষ্ট। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।"–সূরা আল হিজর ঃ ৯৫-৯৬

সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَاهُمْ فِىْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

"আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে সোজা কথায় বলা যায়, তারা হঠকারিতার পথ অবলম্বন করেছে। কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাও, তাদের মুকাবিলায় তোমাদের সহায়তার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৭

নিজের খোদায়ীর ব্যবস্থাপনা করার জন্য আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট। তাঁর কারো কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কাজেই এজন্য কাউকে পুত্র বানাবারও তাঁর কোনো দরকার নেই।[৪২৫]

○

(১১৫)

আল ফাতিরু : اَلْفَاطِرُ

ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

অর্থ : সৃষ্টিকর্তা, আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা।

ব্যাখ্যা : সূরা আল আনআমে এরশাদ হয়েছে :

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - الانعام : ١٤

"বলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি কি আর কাউকে নিজের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবো ? সেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা।"–সূরা আল আনআম : ১৪

মুশরিকরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ইলাহ্ বানিয়েছে তারা সবাই নিজেদের এ বান্দাদেরকে জীবিকা দেবার পরিবর্তে বরং এদের থেকে জীবিকা লাভের মুখাপেক্ষী। কোনো ফেরাউন তার বান্দাদের কাছ থেকে কর ও নযরানা না পেলে প্রভুত্বের দাপট দেখাতে পারে না। কোনো কবরে সমাহিত ব্যক্তির পূজারীরা যদি তার কবরে জমকালো গম্বুজ তৈরী না করে দেয় তাহলে তার উপাস্য ও আরাধ্য হবার চমক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কোনো দেবতার পূজারীরা তার মূর্তি বানিয়ে কোনো বিশাল মন্দিরে বা পূজা মণ্ডপে রেখে তাকে সুসজ্জিত ও সুশোভিত না করা পর্যন্ত সে দেবতার দেব মহিমা ও খোদায়ী কর্তৃত্ব ব্যক্ত হবার কোনো পথ পায় না। এসব বানোয়াট ইলাহ্দের গোষ্ঠীই তাদের বান্দাদের মুখাপেক্ষী। একমাত্র সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রকৃত একচ্ছত্র মালিক ও প্রভু আল্লাহই সেই আসল আল্লাহ্, যাঁর কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব, উপাস্যত্ব ও প্রভুত্বের গৌরব তাঁর আপন শক্তি ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।[৪২৬]

○

সূরা ইবরাহীমে এরশাদ হয়েছে :

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط - ابرهيم : ١٠

"তাদের রাসূলরা বলে, 'আল্লাহর ব্যাপারে কি সন্দেহ আছে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা' ?"–সূরা ইবরাহীম ঃ ১০

রাসূলদের একথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক যুগের মুশরিকরা আল্লাহর অস্তিত্ব মানতো এবং আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা একথাও স্বীকার করতো। এরি ভিত্তিতে রসূলগণ বলেছেন, এরপর তোমাদের সন্দেহ থাকে কিসে ? আমরা যে জিনিসের দিকে তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি তা এছাড়া আর কিছুই নয় যে, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা আল্লাহ তোমাদের বন্দেগী লাভের যথার্থ হকদার। এরপরও কি আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ আছে ?[৪২৭]

○

সূরা আশ্ শূরায় বলা হয়েছে ঃ

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا - الشورى : ١١

"আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, যিনি তোমাদের আপন প্রজাতি থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আশ শূরা ঃ ১১

সূরা আল ফাতিরে বলা হয়েছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا - فاطر : ١

"প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা এবং ফেরেশতাদেরকে বাণীবাহক নিয়োগকারী।"-সূরা ফাতির ঃ ১

১১৬

আশ শাদীদু ঃ اَلشَّدِيْدُ শাদীদুল ইকাবি ঃ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

অর্থ ঃ কঠোর, কঠোর শাস্তিদাতা।

ব্যাখ্যা ঃ এ গুণটির উল্লেখ করে মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, বন্দেগী ও দাসত্বের পথ অনুসরণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলা যতটা দয়াবান, বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার আচরণকারীদের জন্য তিনি ঠিক ততোটাই কঠোর। যেসব সীমা পর্যন্ত তিনি ভুল-ক্রটি ক্ষমা ও উপেক্ষা করেন, যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সে সীমাসমূহ লংঘন করে তখন তারা তাঁর শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। আর তাঁর শাস্তি এমন ভয়াবহ যে, কোনো নির্বোধ মানুষই কেবল তা সহ্য করার মত বলে মনে করতে পারে।[৪২৮]

○

সূরা আল মু'মিনে এরশাদ হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ○ - المؤمن : ٢٢

"তাদের এহেন পরিণতির কারণ হলো তাদের কাছে তাদের রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল আর তারা তা মানতে অস্বীকার করেছিলো। অবশেষে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন। নিসন্দেহে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কঠোর শাস্তি দাতা।"-আল মুমিন ঃ ২২

সূরা আল হাশরে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّشَاقِ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ○ - الحشر : ٤

"আর যে কেউ আল্লাহর বিরোধিতা করবে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দানে বড়ই শক্ত ও কঠোর।"–সূরা আল হাশর ঃ ৪

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ج وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ○- الحشر : ٧

"রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা থেকে তিনি তোমাদেরকে বিরত রাখেন (নিষেধ করেন) তা হতে তোমরা বিরত হও। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।"

আল কারীবু ঃ اَلْقَرِيْبُ

অর্থ ঃ অত্যন্ত নিকটবর্তী।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আল্ কাফে বলা হয়েছে ঃ

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ○ - ق : ٥٠

"আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়েও বেশী কাছে আছি।"-সূরা ক্বাফ ঃ ১৬

অর্থাৎ আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান ভিতর ও বাইর থেকে এমনভাবে মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছে যে, আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান তার যতটা নিকটে ততটা নিকটে তার ঘাড়ের শিরাও নয়। তার কথা শোনার জন্য আমাকে কোথাও থেকে আসতে হয় না। তার মনের মধ্যে উদিত কল্পনাসমূহ পর্যন্ত আমি সরাসরি জানি। অনুরূপভাবে তাকে যদি কোনো সময় পাকড়াও করতে হয় তখনও আমাকে কোথাও থেকে এসে তাকে পাকড়াও করতে হয় না। সে যেখানেই থাকুক, সর্বদা আমার আয়ত্তাধীনেই আছে যখন ইচ্ছা আমি তাকে বন্দী করবো।[৪২৯]

○

সূরা আস্ সাবার ৫০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ ج وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْٓ اِلَىَّ رَبِّىْ

اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ○ - سبا : ٥٠

"বলো যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে থাকি, তাহলে আমার পথভ্রষ্টতার শাস্তি আমারই প্রাপ্য। আর যদি আমি সঠিক পথে থেকে থাকি, তাহলে তা হবে আমার রব আমার প্রতি যে অহী নাযিল করেন তারই ভিত্তিতে। তিনি সবকিছু শোনেন এবং নিকটেই আছেন।"

-সূরা সাবা ঃ ৫০

আমার রব কাছেই আছেন। তিনি সবকিছু শুনছেন। আমি পথহারা অথবা তাঁর দিকে যাবার পথের সন্ধান পেয়েছি, তা তিনি জানেন।[৪৩০]

○

আল মুগীছু ঃ اَلْمُغِيْثُ

অর্থ ঃ ফরিয়াদ শ্রবণকারী।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ কোনো বড় রকমের বিপদের সম্মুখীন হলে অথবা মৃত্যু তার ভয়াবহ চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে এক আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল তখন আর মানুষের চোখে পড়ে না। বড় বড় মুশরিকরা এ সময় নিজেদের উপাস্য দেবতাদের কথা ভুলে এক আল্লাহকে ডাকতে থাকে। কট্টর খোদাদ্রোহী নাস্তিকও এ সময় আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে দোয়া করে।[৪৩১]

○

এ বিষয়টি কেবল আরব মুশরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সারা দুনিয়ার মুশরিকদেরও সাধারণভাবে একই অবস্থা। এমনকি রাশিয়ার নাস্তিকরা যারা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর হুকুম মেনে চলার বিরুদ্ধে যথারীতি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, তারাও যখন বিগত বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সেনাদলের অবরোধ কঠিন পর্যায় পৌঁছে গিয়েছিল তখন তারা আল্লাহকে ডাকার প্রয়োজন অনুভব করেছিল।[৪৩২]

○

আবু জাহলের পুত্র ইকরামার ঈমান গ্রহণের ঘটনাটি সুপ্রশিদ্ধ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে মক্কা বিজিত হবার পর ইকরামা জেদ্দার দিকে পালিয়ে যান। একটি নৌকায় চড়ে তিনি হাবশার (ইথিয়োপিয়ার) পথে যাত্রা করেন। পথে ভীষণ ঝড়-তুফানে তার নৌকা চরম বিপদের সম্মুখীন হয়। প্রথমে দেবদেবীদের দোহাই দেয়া শুরু হয়। কিন্তু এতে তুফানের ভয়াবহতা কমে না বরং আরো বেড়ে যেতেই থাকে। যাত্রীদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, এবার নৌকা ডুবে যাবে। তখন সবাই বলতে থাকে, এখন আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাকলে চলবে না। একমাত্র তিনি চাইলে আমাদের বাঁচাতে পারেন। এ সময় ইকরামার চোখ খুলে যায়। তার মন বলে ওঠে, যদি এখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী না থেকে থাকে, তাহলে অন্য জায়গায়ই বা আর কেউ থাকবে কেন ? একথাটাই তো আল্লাহর সেই নেক বান্দাটি আমাদের গত বিশ বছর থেকে বুঝাচ্ছেন আর আমরা খামখা তাঁর সাথে লড়াই করছি।

এটি ছিল ইকরামার জীবনের সিদ্ধান্তকরী মুহূর্ত। সে মুহূর্তেই তিনি আল্লাহর কাছে অংগীকার করেন, যদি এ যাত্রায় আমি বেঁচে যাই, তাহলে সোজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাবো এবং তাঁর হাতে আমার হাত দিয়ে দেবো। পরে তিনি নিজের এ অংগীকার পূর্ণ করেন। ফিরে এসে তিনি কেবল মুসলমান হয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং অবশিষ্ট জীবন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করেই কাটান।[৪৩৩]

○

কোনো কঠিন সংকটকাল এলে এবং যাবতীয় উপায় উপকরণ হাতছাড়া হতে দেখা গেলে তোমরা নিতান্ত অসহায়ের মতো তাঁর অশ্রয় চাও। কিন্তু এ সমস্ত দ্ব্যর্থহীন আলামত থাকা সত্ত্বেও তোমরা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই তাঁর সাথে অন্যদেরকে শরীক করেছো। তাঁরই দেয়া জীবিকায় প্রতিপালিত হয়ে অন্নদাতা বলছো অন্যদেরকে। তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা লাভ করে অন্যদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী আখ্যা দিচ্ছো। তাঁর দাস হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের বন্দেগী ও দাসত্ব করছো। সংকট থেকে তিনিই উদ্ধার করেন এবং বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের দিনে তাঁরই কাছে কান্নাকাটি করো, কিন্তু তাঁর সহায়তায় সে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করার পর অন্যদেরকে ত্রাণকর্তা মনে করতে থাকো এবং অন্যদের নামে নযরানা দিতে থাকো।[৪৩৪]

○

এমন সব ফেরেশতা যাদেরকে দুনিয়ায় দেবদেবী বানিয়ে পূজা করা হয়েছে এবং এমন সব জিন, রূহ, পূর্ববর্তী মনীষী, পূর্বপুরুষ, নবী, অলী, শহীদ ইত্যাদি যাদেরকে আল্লাহর গুণাবলীতে অংশীদার করে এমন অধিকারসমূহ দান করা হয়েছে যেগুলো ছিল আল্লাহর অধিকার। তারা সেখানে নিজেদের পূজারীদেরকে পরিষ্কার বলে দেবে, তোমরা যে আমাদের পূজা করতে তা তো আমরা জানতামই না। তোমাদের কোনো দোয়া, আকুতি, আবেদন, নিবেদন, ফরিয়াদ, নযরানা, মানত, শিরনী, প্রশংসা, স্তুবস্তুতি, জপতপ এবং কোনো সিজদা, বেদী চুম্বন ও দরগাহ প্রদক্ষিণ আমাদের কাছে পৌছেনি।[৪৩৫]

○

আল্লাহর নেক বান্দারা যখন বিপদ ও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হন তখন তাঁরা তাঁদের রবের কাছে অভিযোগ করেন না বরং ধৈর্য সহকারে

তাঁর চাপিয়ে দেয়া. পরীক্ষাকে মেনে নেন এবং তাতে উত্তীর্ণ হবার জন্য তাঁর কাছেই সাহায্য চান। কিছুকাল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পর যদি বিপদ অপসারিত না হয় তাহলে তাঁর থেকে নিরাশ হয়ে অন্যদের দরবারে হাত পাতবেন, এমন পদ্ধতি তাঁরা অবলম্বন করেন না। বরং তারা ভাল করেই জানেন, যা কিছু পাওয়ার আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। তাই বিপদের ধারা যতই দীর্ঘ হোক না কেন তারা তাঁরই করুণাপ্রার্থী হন। এ জন্য তারা এমন দান ও করুণা লাভে ধন্য হন যার দৃষ্টান্ত হযরত আইয়ুবের জীবনে পাওয়া যায়। এমনকি যদি তারা কখনো অস্থির হয়ে কোনো প্রকার নৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়েন তাহলেও আল্লাহ তাদেরকে দুষ্কৃতিমুক্ত করার জন্য একটি পথ বের করে দেন যেমন হযরত আইয়ুবের জন্য বের করে দিয়েছিলেন।[৪৩৬]

○

১১৯

আল কায়িমু : اَلْقَائِمُ

আল কায়িমু বিল কিসতি : اَلْقَائِمُ بِالْقِسْطِ

অর্থ : প্রতিষ্ঠিত, ইনসাফের সাথে প্রতিষ্ঠিত।

ব্যাখ্যা : সূরা আলে ইমরানে এরশাদ হয়েছে :

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لا وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُوْ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ط لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ - ال عمران : ١٨

"আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর ফেরেশতা ও সকল জ্ঞানবান লোকই সততা ও ন্যায়-পরায়ণতার সাথে এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সেই প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান সত্তা ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই।"-সূরা আলে ইমরান : ১৮

আল মান্নানু : اَلْمَنَّانُ

অর্থ : অত্যধিক অনুগ্রহ ও উপকারকারী।

ব্যাখ্যা : সূরা ইবরাহীমে বলা হয়েছে :

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط - ابراهيم : ١١

"তাদের রসূলরা তাদেরকে বলে, 'যথার্থই আমরা তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন'।"-সূরা ইবরাহীম : ১১

(আল্লাহর রাসূল তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদান করে বলেন) নিসন্দেহে আমি তো মানুষই। তবে আল্লাহ সত্যের তত্ত্বজ্ঞান ও পূর্ণ অন্তরদৃষ্টি দান করে তোমাদের মধ্য থেকে আমাকে বাছাই করে নিয়েছেন। এখানে আমার সামর্থের কোনো ব্যাপার নেই। এ তো আল্লাহর পূর্ণ ইখতিয়ারের ব্যাপার। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে যা ইচ্ছা দেন। আমার কাছে যা কিছু এসেছে তা আমি তোমাদের কাছে পাঠাতে বলতে পারি না এবং আমার কাছে যে সত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে তা থেকে আমি নিজের চোখ বন্ধ করে নিতেও পারি না।[৪৩৭]

○

সূরা আন নিসায় বলা হয়েছে :

كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ط - النساء : ٩٤

"ইতিপূর্বে তোমরা নিজেরাও তো একই অবস্থায় ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কাজেই তোমরা অনুসন্ধান করে পদক্ষেপ গ্রহণ করো।"-সূরা আন নিসা : ৯৪

অর্থাৎ তোমাদেরও এমন এক সময় ছিল যখন তোমরা কাফের গোত্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলে। যুলুম নির্যাতনের ভয়ে ইসলামের কথা বাধ্য হয়ে গোপন রাখতে। ঈমানের মৌখিক অংগীকার ছাড়া তোমাদের কাছে তার আর কোনো প্রমাণ ছিল না। এখন আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা সামাজিক জীবন যাপনের সুবিধে ভোগ করছো। তোমরা

এখন কাফেরদের মুকাবিলায় ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার যোগ্যতা লাভ করেছো।[৪৩৮]

○

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজ ভাইদের সামনে তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের বর্ণনা নিম্নোক্ত ভাষায় করেছেন ঃ

قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِىْ ز قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ط -

"সে বললো, হা আমি ইউসুফ এবং এ আমার ভাই। আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।"–সূরা ইউসুফ ঃ ৯০

মরু পশুপালক পরিবারের এক ব্যক্তি, যাঁকে তাঁর হিংসুটে ভাইয়েরা মেরে ফেলতে চেয়েছিল, জীবনের উত্থান-পতন দেখতে দেখতে অবশেষে পার্থিব উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তাঁর দূর্ভিক্ষ পীড়িত পরিবারবর্গ তাঁরই করুণা ভিখারী হয়ে তাঁর সামনে এসে হাযির হয়েছে এবং এ সাথে এসেছে তাঁর সেই হিংসুটে ভাইয়েরা যারা তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তারা সবাই তাঁর রাজকীয় সিংহাসনের সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে। দুনিয়ার সাধারণ রীতি অনুযায়ী এটি ছিল অহংকার, অভিযোগ ও দোষারোপ করার এবং তিরস্কার ও ভর্ৎসনার তীর বর্ষণ করার উপযুক্ত সময়। কিন্তু আল্লাহর সত্যিকার অনুগত একজন মানুষ এ সময় কিছুটা ভিন্ন ধরনের চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকাশ ঘটান। তিনি নিজের এ উন্নতির জন্য অহংকার করার পরিবর্তে যে আল্লাহ তাঁকে এ মর্যাদা দান করেছেন তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেন।[৪৩৯]

○

সূরা আল হুজুরাতে এরশাদ হয়েছে ঃ

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ط قُلْ لاَّ تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلاَمَكُمْ ج بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ

اَنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ - الحجرات : ١٧

"এসব লোক তোমাকে বুঝাতে চায় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার উপকার করেছে। তাদের বলো, ইসলাম গ্রহণ করে আমায় উপকার করেছো একথা মনে করো না। বরং যদি তোমরা নিজেদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ তাআলাই তোমাদের উপকার করে চলেছেন।"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৭

যারা আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া ছাড়াই শুধু মৌখিকভাবে ইসলামকে স্বীকার করে এবং তারপর এমন নীতি ও আচরণ অবলম্বন করে যেন

ইসলাম গ্রহণ করে তারা কোনো মহা উপকার সাধন করেছে, পৃথিবীতে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে, সমাজে তাদের সাথে মুসলমানের মত আচরণও করা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে না।[৪৪০]

○

সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ - ال عمران : ١٦٤

"আসলে ঈমানদারদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন নবী পাঠিয়ে আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সে তাঁর আয়াত তাদেরকে শোনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেয়। অথচ এর আগে এ লোকেরাই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪

যে মানুষের সমগ্র সত্তা ও সারাটা জীবন আল্লাহর অনুগ্রহের সূতোয় বাঁধা সে কেমন সব অকৃতজ্ঞতা, অবিশ্বস্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহাত্মক আচরণের মাধ্যমে নিজের উপকারীর উপকার ও অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের জবাব দিয়ে যাচ্ছে ? অন্যদিকে তার এ উপকারী ও অনুগ্রহদাতা এমন ধরনের করুণাশীল ও সহিষ্ণু যে, এমন সব কার্যকলাপের পরও তিনি বছরের পর বছর একজন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে এবং শত শত বছর একটি বিদ্রোহী ও নাফরমান জাতিকে নিজের অনুগ্রহদানে আপ্লুত করে চলেছেন। এখানে দেখা যাবে, এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে স্রষ্টার অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং তারপরও তার প্রতি প্রবল ধারায় অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে আবার এক ব্যক্তি স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকার সবকিছুতেই অ-স্রষ্টা সত্তাদেরকে শরীক করে চলছে এবং দানের জন্য দানকারীর পরিবর্তে অ-দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, এরপরও এখানে দেখা যাবে দাতা-হস্ত দান করতে বিরত হচ্ছে না। এখানে এ দৃশ্যও দেখা যাবে যে, এক বক্তি স্রষ্টাকে স্রষ্টা ও অনুগ্রহদাতা হিসেবে মেনে নেয়ার পরও তাঁর মুকাবিলায় বিদ্রোহ ও নাফরমানী করা নিজের অভ্যাসে পরিণত এবং তাঁর আনুগত্যের শৃংখল গলা থেকে নামিয়ে দেয়াকে নিজের নীতি ও বিধি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এরপরও সারা জীবন স্রষ্টার অপরিসীম অনুগ্রহের ধারায় সে আপ্লুত হয়ে চলেছে।[৪৪১]

(১২১) আল কাফীলু : اَلْكَفِيْلُ

অর্থ : সাক্ষী।

ব্যাখ্যা : সূরা আন্ নাহলে এরশাদ হয়েছে :

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ○ - النحل : ٩١

"আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করো যখনই তোমরা তাঁর সাথে কোনো অংগীকার করো এবং নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর আবার তা ভেঙে ফেলো না, যখন তোমরা আল্লাহকে নিজের ওপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছো। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত।"
—সূরা আন্ নাহল : ৯১

এখানে পর্যায়ক্রমে তিন ধরনের অংগীকারকে তাদের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করে সেগুলো মেনে চলার হুকুম দেয়া হয়েছে। এক. মানুষ আল্লাহর সাথে যে অংগীকার করেছে। এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। দুই. একজন বা একদল মানুষ অন্য একজন বা একদল মানুষের সাথে যে অংগীকার করেছে। এর ওপর আল্লাহর কসম খেয়েছে। অথবা কোনো না কোনোভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নিজের কথার দৃঢ়তাকে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছে। এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ। তিন. আল্লাহর নাম না নিয়ে যে অংগীকার করা হয়েছে। এর গুরুত্ব উপরের দু' প্রকার অংগীকারের পরবর্তী পর্যায়ের। তবে উল্লিখিত সব কয়টি অংগীকারই পালন করতে হবে এবং এর মধ্য থেকে কোনোটি ভেঙে ফেলা বৈধ নয়।

সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের অংগীকার ভংগ দুনিয়ায় বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চ পর্যায়ের বড় বড় লোকেরাও একে সৎকাজ মনে করেই করে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের জাতি ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বাহ্বা কুড়ায়। জাতি ও দলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রায়ই এমনটি হতে দেখা যায়। এক জাতির নেতা এক সময় অন্য জাতির সাথে একটি চুক্তি করে এবং অন্য সময় শুধুমাত্র নিজের জাতীয়

স্বার্থের খাতিরে তা প্রকাশ্যে ভংগ করে অথবা পর্দান্তরালে তার বিরুদ্ধাচরণ করে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করে। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে খুবই সত্যনিষ্ঠ বলে যারা পরিচিত, তারাই সচরাচর এমনি ধরনের কাজ করে থাকে। তাদের এসব কাজের বিরুদ্ধে শুধু যে সমগ্র জাতির মধ্য থেকে কোনো নিন্দাবাদের ধ্বনি ওঠে না তা নয় বরং সব দিক থেকে তাদেরকে বাহ্‌বা দেয়া হয় এবং এ ধরনের ঠগবাজী ও ধূর্তামীকে পাকাপোক্ত ডিপ্লোমেসী মনে করা হয়। আল্লাহ্ এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, প্রত্যেকটি অংগীকার আসলে অংগীকারকারী ব্যক্তি ও জাতির চরিত্র ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা স্বরূপ। যারা এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে তারা আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।[৪৪২]

○

আল মুহীতু ঃ اَلْمُحِيْطُ

অর্থ ঃ সর্বশক্তি দ্বারা বেষ্টনকারী, সবকিছুকে বেষ্টনকারী।

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

(١) وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ○ - البقرة : ١٩

"আল্লাহ এ সত্য অস্বীকারকারীদের সবদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯

(٢) اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○ - ال عمران : ١٢

"তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তা চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে আছেন।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১২০

(٣) وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ○ - النساء : ١٢٦

"আর আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।"
–সূরা আন সিনা ঃ ১২৬

(٤) وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○ - الانفال : ٤٧

"আর যারা আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে, তারা যা কিছু করছে তা আল্লাহর নাগালের বাইরে নয়।"–সূরা আনফাল ঃ ৪৭

আল্লাহর ক্ষমতা ও জ্ঞান ভিতর ও বাহির থেকে এমনভাবে মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছে যে, আল্লাহর ক্ষমতা ও জ্ঞান তার যতটা নিকটে ততটা নিকটে তার ঘাড়ের শিরাও নয়। মানুষের কথা শোনার জন্য আল্লাহকে কোথাও থেকে আসতে হয় না। তার মনের মধ্যে উদিত কল্পনাসমূহ পর্যন্ত তিনি সরাসরি জানেন! অনুরূপভাবে তাকে যদি কোনো সময় পাকড়াও করতে হয় তখনও আল্লাহকে কোথাও থেকে এসে তাকে পাকড়াও করতে হয় না। সে যেখানেই থাকুক, সর্বদা আল্লাহর আয়ত্তাধীনেই আছে, যখন ইচ্ছা তিনি তাকে বন্দী করবেন।[৪৪৩]

○

আল্লাহর ক্ষমতা রসূল ও ফেরেশতা উভয়কে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত করে আছে যে, তারা যদি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুল পরিমাণ কাজও করেন

তাহলে সংগে সংগে পাকড়াও হবেন। আর যে বাণীসমূহ আল্লাহ পাঠান তার প্রতিটি বর্ণ গোণা ও হিসেব করা। তার একটি বর্ণের হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষমতাও রাসূল বা ফেরেশতা কারো নেই।[৪৪৪]

○

মানুষ, জিন, ফেরেশতা বা অন্য কোনো সৃষ্টিই হোক না কেন সবার জ্ঞান অপূর্ণ ও সীমিত। বিশ্বজাহানের সমগ্র সত্য ও রহস্য কারো দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই।[৪৪৫]

○

মানুষ যদি আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মাথা নত না করে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক আচরণ থেকে বিরত না হয় তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে রক্ষা করে সে কোথাও পালিয়ে যেতে পারে না। আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও কুদরত চারদিক থেকে তাকে বেষ্টন করে আছে।[৪৪৬]

○

আল্লাহ বিরোধীদেরকে ঘিরে রেখেছেন এবং নবীর দাওয়াত আল্লাহর হেফাযতে রয়েছে—একথা মক্কার প্রাথমিক যুগের সূরাগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে। যেমন সূরা আল বুরুজে বলা হয়েছে ঃ

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ ۝ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝

"কিন্তু এ কাফেররা মিথ্যা বলার ও অস্বীকার করার কাজে লেগেই আছে এবং আল্লাহ সবদিক থেকে তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন।"[৪৪৭]–সূরা আল বুরুজ ঃ ১৯-২০

○

(১২৩)

আর রাফী'উ : اَلرَّفِيْعُ
রাফী'উদ দারাজাতি : رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ

অর্থ : উচ্চ মর্যাদাশালী।

ব্যাখ্যা : সূরা আল মু'মিনে বলা হয়েছে :

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ج - المؤمن : ١٥

"তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি।"–সূরা মু'মিন ১৫

সমস্ত সৃষ্টি থেকে তাঁর মর্যাদা অনেক উচ্চে। এ বিশ্বজাহানে বিদ্যমান কোনো সত্তাই সে ফেরেশতা, নবী, অলী বা অন্য কোনো সৃষ্টি যাই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলার গুণাবলী এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে তাঁর শরীক হওয়ার ধারণা করা তো দূরের কথা তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার ধারে কাছে পৌছার কথাও কল্পনা করা যায় না।[৪৪৮]

○

১২৪

আন নাসীরু[১] : اَلنَّصِيْرُ

অর্থ : সর্বোত্তম সাহায্যকারী, রক্ষক ও সহায়।

ব্যাখ্যা : এ নির্বোধরা মনে করছে, এ উপাস্যরা দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সাহায্যকারী হবে। অথচ আসলে তাদের কোনোই সাহায্যকারী নেই, এ উপাস্যরা তো নয়ই। কারণ তাদের সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা নেই। আর আল্লাহও তাদের সাহায্যকারী নন। কারণ তারা তো তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে।[৪৪৯]

○

সূরা আল আনকাবূতে বলা হয়েছে :

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ـ العنكبوت : ٢٢

"এবং আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার মতো কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী তোমাদের নেই।"–সূরা আল আনকাবূত ২২

আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদের শক্তির জোরে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং তোমাদের এমন কোনো অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক বা সাহায্যকারীও নেই যে আল্লাহর মুকাবিলায় তোমাদের আশ্রয় দিতে পারে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারে। যারা শির্ক ও কুফরী করেছে, আল্লাহর বিধানের সামনে নত হতে অস্বীকার করেছে এবং বুক ফুলিয়ে আল্লাহর নাফরমানী করেছে এবং তাঁর যমীনে ব্যাপকভাবে যুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, সমগ্র বিশ্বজাহানে তাদের সাহায্য ও সহায়তা দানকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবার এবং আল্লাহর আযাবের ফায়সালাকে তাদের ওপর কার্যকর হওয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নেই। অথবা সমগ্র বিশ্বজগতে এমন একজনও নেই যে, আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে একথা বলার সাহস রাখে যে, এরা আমার লোক, কাজেই এরা যা কিছু করেছে তা মাফ করে দেয়া হোক।[৪৫০]

○

---

১. আল কুরআনের নিম্নোক্ত সূরাসমূহে এ নামটি বর্ণিত হয়েছে :
তাওবা : ১১৬ ; হাজ্জ : ৭১, ৭৮ ; আনকাবূত : ২২ ; ফাতির : ৩৭ ; শূরা : ৮, ৩১ ; নিসা : ৪৫, ৫২, ৭৫, ৮৯, ১২৩, ১৪৫, ১৭৩ ; বনী ইসরাঈল : ৭৫, ৮০, ফুরকান : ৩১ ; আহ্যাব : ১৭, ৬৫ ; ফাতহ : ২২।

মানুষ নবী হলেও আল্লাহর সাহায্য ও সুযোগ-সুবিধা তার সহযোগী না হলে শুধুমাত্র নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে সে মিথ্যার তুফানের মুকাবিলা করতে পারে না।[৪৫১]

○

আর সাহায্য মানে হচ্ছে সব ধরনের সাহায্য। যতগুলো ময়দানে হক ও বাতিলের সংঘাত হয় তার প্রত্যেকটিতে হকের সমর্থনে সাহায্য পৌঁছানো আল্লাহর কাজ। যুক্তির লড়াই হলে তিনিই সত্যপন্থীদেরকে সঠিক ও পূর্ণশক্তিশালী যুক্তি সরবরাহ করেন। নৈতিকতার লড়াই হলে তিনিই সবদিক থেকে সত্যপন্থীদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। সংগঠন-শৃংখলার মুকাবিলা হলে তিনিই বাতিলপন্থীদের হৃদয় ছিন্নভিন্ন এবং হকপন্থীদের হৃদয় সংযুক্ত করেন। মানবিক শক্তির মুকাবিলা হলে তিনিই প্রতিটি পর্যায়ে যোগ্য ও উপযোগী ব্যক্তিবর্গ ও গ্রুপসমূহ সরবরাহ করে হকপন্থীদের দলের শক্তি বৃদ্ধি করেন। বস্তুগত উপকরণের প্রয়োজন হলে তিনিই সত্যপন্থীদের সামান্য ধন ও উপায়-উপকরণে এমন বরকত দান করেন যার ফল বাতিলপন্থীদের উপকরণের প্রাচুর্য তার মুকাবিলায় নিছক একটি প্রতারণাই প্রমাণিত হয়। মোটকথা, সাহায্য দেয়া ও পথ দেখানোর এমন কোনো দিক নেই যেখানে সত্যপন্থীদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট নন এবং তাদের অন্য কারো সাহায্য-সহায়তা নেবার প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট হওয়ার ওপর তাদের বিশ্বাস ও আস্থা থাকতে হবে এবং তারা কোনো প্রকার প্রচেষ্টা না চালিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকতে পারবে না। বরং তৎপরতা সহকারে বাতিলের মুকাবিলায় হকের মাথা উঁচু রাখার জন্য লড়ে যেতে হবে। অন্তরে ঈমান থাকলে এর চেয়ে বেশী সাহস সঞ্চারী কথা আর কি হতে পারে যে, সারা বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ নিজেই আমাদের সাহায্যদান ও পথ দেখাবার দায়িত্ব নিচ্ছেন। এরপর তো শুধুমাত্র একজন হতোদ্যম কাপুরুষই ময়দানে এগিয়ে যেতে ইতস্তত করতে পারে।[৪৫২]

○

যূত্ তাওলি : ذُو الطَّوْلِ

অর্থ : দানশীল, মহানুভব।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ দানশীল, অভাবশূন্য এবং উদার ও অকৃপণ। সমস্ত সৃষ্টিকুলের ওপর প্রতিমুহূর্তে তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি ব্যাপকভাবে বর্ষিত হচ্ছে। বান্দা যা কিছু লাভ করছে তা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেই লাভ করছে।[৪৫৩]

○

আল মুবীনু ঃ اَلْمُبِيْنُ

অর্থ ঃ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশকারী

ব্যাখ্যা ঃ সূরা আন নূরে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ○

"সেদিন তারা যে প্রতিদানের যোগ্য হবে, তা আল্লাহ তাদেরকে পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসেবে প্রকাশকারী।"–সূরা আন নূর ঃ ২৫

নিজের শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশগুলোর একেবারে দ্ব্যর্থহীন পদ্ধতিতে বর্ণনা করে দেয়। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এটি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে তুলে ধরে।[৪৫৪]

○

(১২৭)

আস সারী'উ ঃ اَلسَّرِيْعُ
সারীউল হিসাবি ঃ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

অর্থ ঃ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

ব্যাখ্যা ঃ আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

أُولٰئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○ - البقرة : ٢٠٢

"এ ধরনের লোকেরা নিজেদের উপার্জন অনুযায়ী (উভয়স্থানে) অংশ পাবে। মূলত হিসাব সম্পন্ন করতে আল্লাহর একটুও বিলম্ব হয় না।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২০২

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ○ - ال عمران : ١٩

"আর যে কেউ আল্লাহর হেদায়াতের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে, তার কাছ থেকে হিসাব নিতে আল্লাহর মোটেও দেরী হয় না।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○ - المائدة : ٤

"আর আল্লাহর আইন ভাঙার ব্যাপারে সাবধান! অবশ্যি হিসেব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরী হয় না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ط وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○ - الرعد : ٤١

"আল্লাহ রাজত্ব করছেন, তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই এবং তাঁর হিসেব নিতে একটুও দেরী হয় না।"–সূরা রাআদ ঃ ৪১

لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ○ ابرهيم : ٥١

"এটা এজন্য হবে যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেবেন। হিসেব নিতে আল্লাহর একটুও দেরী হয় না।"
–সূরা ইবরাহীম ঃ ৫১

وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰهُ حِسَابَهٗ ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

"বরং সেখানে সে আল্লাহকে উপস্থিত পেলো, যিনি তার পূর্ণ হিসেব মিটিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর হিসেব নিতে দেরী হয় না।"
–সূরা আন নূর ঃ ৩৯

যারা কুফরী ও মুনাফিকী সত্ত্বেও বাহ্যত সৎকাজও করে এবং মোটামুটিভাবে আখেরাতকেও মানে আবার এ অসার চিন্তাও পোষণ করে যে, সাচ্চা ঈমান ও মু'মিনের গুণাবলী এবং রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া এ কার্যাবলী তাদের জন্য আখেরাতে কোনো কাজে লাগবে না। উপমার আকারে তাদেরকে জানানো হচ্ছে, তোমরা নিজেদের যেসব বাহ্যিক ও প্রদর্শনীমূলক সৎকাজের মাধ্যমে আখেরাতে লাভবান হবার আশা রাখো সেগুলো নিছক মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। মরুভূমিতে দূর থেকে চিক্‌চিক্ করা বালুকারাশি দেখে যেমন পিপাসার্ত তাকে একটি তরংগায়িত পানির দরিয়া মনে করে নিজের পিপাসা নিবৃত্তির জন্য ঊর্ধশ্বাসে সেদিকে দৌড়াতে থাকে, ঠিক তেমনি তোমরা এসব কর্মের ওপর মিথ্যা ভরসা করে মৃত্যু মনযিলের পথ অতিক্রম করে চলছো। কিন্তু যেমন মরীচিকার দিকে ছুটে চলা ব্যক্তি যে স্থানে পানির দরিয়া আছে মনে করেছিল সেখানে পৌঁছে কিছুই পায় না, ঠিক তেমনি তোমরা যখন মৃত্যু মনযিলে প্রবেশ করবে তখন জানতে পারবে সেখানে এমন কোনো জিনিস নেই যা থেকে তোমরা লাভবান হতে পারবে। বরং এর বিপরীত দেখবে তোমাদের কুফরী ও মুনাফিকী এবং লোকদেখানো সৎকাজের সাথে তোমরা যেসব খারাপ কাজ করছিলে সেগুলোর হিসেব নেবার এবং পুরোপুরি প্রতিদান দেবার জন্য আল্লাহ সেখানে উপস্থিত রয়েছেন।[৪৫৫]

○

সূরা আল মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ط لَاظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

"(বলা হবে) আজ প্রত্যেক প্রাণীকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি কোনো যুলুম হবে না। আল্লাহ অতি দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।"–সূরা আল মু'মিন ঃ ১৭

হিসেব নিতে আল্লাহর কোনো বিলম্ব হবে না। যেভাবে তিনি গোটা বিশ্বজাহানের সমস্ত সৃষ্টিকে যুগপৎ রিযিক দান করছেন এবং কাউকে রিযিক পৌঁছানোর ব্যবস্থাপনায় এমন ব্যস্ত নন যে, অন্যদের রিযিক দেয়ার অবকাশই তিনি পান না। যেভাবে তিনি গোটা বিশ্বজাহানের

প্রতিটি জিনিসকে যুগপৎ দেখছেন, সমস্ত শব্দ যুগপৎ শুনছেন, প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এবং বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ব্যাপারের ব্যবস্থাপনাও তিনি যুগপৎ করছেন এবং কোনো জিনিস এমনভাবে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না যে, ঠিক সে মুহূর্তে তিনি আর সব বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন না। তেমনি তিনি যুগপৎ প্রত্যেক ব্যক্তির হিসেবও গ্রহণ করবেন এবং একটি বিচার্য বিষয়ের শুনানিতে তিনি কখনো এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না যে, সে সময়ে অন্য অসংখ্য মোকদ্দমার শুনানি করতে পারবেন না। তাছাড়া তাঁর আদালতে এ কারণেও কোনো বিলম্ব হবে না যে, মোকদ্দমার পটভূমি ও ঘটনাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ এবং তার সাক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ কঠিন হবে। আদালতের বিচারক নিজে সরাসরি বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবেন। মোকদ্দমার বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের সবকিছুই তাঁর জানা থাকবে। সমস্ত ঘটনার খুঁটিনাটি সব দিক পর্যন্ত অনস্বীকার্য সাক্ষ্য প্রমাণসহ অনতিবিলম্বে সবিস্তার পেশ করা হবে। তাই সমস্ত মোকদ্দমার ফায়সালা ঝটপট হয়ে যাবে।[৪৫৬]

○

আল মু'য়ীনু ঃ اَلْمُعِيْنُ , আল মুসতাআনু ঃ اَلْمُسْتَعَانُ

অর্থ ঃ যার কাছে সাহায্য চাওয়া যায়, সাহায্যকারী, সাহায্যের নির্ভর।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা ইউসুফে বলা হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ○ ـ يوسف : ١٨

"তোমরা যে কথা সাজাচ্ছো তার ওপর একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।"–সূরা ইউসুফ ঃ ১৮

সূরা আল আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ

وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ○ـ الانبياء : ١١٢

"তোমরা যেসব কথা তৈরী করছো তার মুকাবিলায় আমাদের দয়াময় রবই আমাদের সাহায্যকারী সহায়ক।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১১২

সূরা আল ফাতিহায় বলা হয়েছে ঃ

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ○ ـ الفاتحة : ٤

"আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।"-সূরা আল ফাতিহা ঃ ৪

অর্থাৎ তোমার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল ইবাদাতের নয় বরং আমাদের সাহায্য প্রার্থনার সম্পর্কও একমাত্র তোমারই সাথে রয়েছে। আমরা জানি তুমিই সমগ্র বিশ্বজাহানের রব, সমস্ত শক্তি তোমারই হাতে কেন্দ্রীভূত, তুমি একই যাবতীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহের অধিকারী। তাই আমাদের অভাব ও প্রয়োজন পূরণের জন্য আমরা একমাত্র তোমারই দুয়ারে ধরণা দেই। তোমারই সামনে নিজেদের সোপর্দ করে দেই এবং তোমারই সাহায্যের ওপর নির্ভর করি।[৪৫৭]

○

১২৯

আল গালিবু : اَلْغَالِبُ

অর্থ : বিজয়ী।

ব্যাখ্যা : সূরা ইউসুফে বলা হয়েছে :

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ - يوسف : ٢١

"আল্লাহ তাঁর কাজ সম্পন্ন করেই ছাড়েন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"–সূরা ইউসুফ : ২১

পৃথিবীর চারদিকে একটি বিজয়ী ও পরাক্রান্ত শক্তির কর্মতৎপরতার নিদর্শনাবলী দেখতে পাওয়া যায়। অকস্মাত কখনো দুর্ভিক্ষ, কখনো বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী, আবার কখনো প্রচণ্ড শীত বা প্রচণ্ড গরম এবং কখনো অন্য কিছু দেখা দেয়। এভাবে আকস্মিক বিপদ-আপদ মানুষের সমস্ত কীর্তি ও কর্মকাণ্ড ধ্বংস করে দিয়ে যায়। হাজার হাজার লাখো লাখো লোক মারা যায়, জনবসতি ধ্বংস হয়ে যায়, সবুজ শ্যামল শস্য ক্ষেতগুলো বিধ্বস্ত হয়, উৎপাদন কমে যায়, ব্যবসায় বাণিজ্যে মন্দাভাব দেখা দেয়। মোটকথা, মানুষের জীবন ধারণের উপায় উপকরণের কখনো এদিক থেকে আবার কখনো ওদিক থেকে ঘাটতি দেখা দেয়। নিজের সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করেও মানুষ এ ক্ষতির পথ রোধ করতে পারে না।[৪৫৮]

○

দুনিয়ায় আল্লাহ মানুষকে একেবারেই পরমানন্দে রাখেননি। নিশ্চিন্তে ও আরামে জীবনের গাড়ি চলতে থাকলে মানুষ এ ভুল ধারণায় লিপ্ত হয়ে পড়বে যে, তার চেয়ে বড় আর কোনো শক্তি নেই যে তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। বরং আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন যার ফলে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি, জাতি ও দেশের ওপর এমন সব বিপদ-আপদ পাঠাতে থাকেন, যা তাদেরকে একদিকে নিজেদের অসহায়তা এবং অন্যদিকে নিজেদের চেয়ে বড় ও উর্ধে একটি মহাপরাক্রমশালী সর্বব্যাপী শাসন ব্যবস্থার অনুভূতি দান করে। এ বিপদ প্রত্যেকটি ব্যক্তি, দল ও জাতিকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমাদের ভাগ্য ওপরে অন্য একজন নিয়ন্ত্রণ করছেন। সবকিছু তোমাদের হাতে দিয়ে দেয়া হয়নি। আসল ক্ষমতা রয়েছে তাঁর হাতে যিনি কর্তৃত্ব সহকারে এসব কিছু করে

চলছেন। তাঁর পক্ষ থেকে যখনই কোনো বিপদ তোমাদের ওপর আসে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ তোমরা গড়ে তুলতে পারো না এবং কোনো জিন, রূহ, দেব-দেবী, নবী বা অলীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেও তার পথ রোধ করতে সক্ষম হও না।[৪৫৯]

○

যখন তাদের সমস্ত জীবনোপকরণ আমার হাতে রয়েছে, আমি যে জিনিসটি চাই কমিয়ে দিতে পারি, যেটি চাই বন্ধ করে দিতে পারি, সে ক্ষেত্রে তারা কি আমার মুকাবিলায় বিজয়ী হবার এবং আমার পাকড়াও থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার ক্ষমতা রাখে ? এ নিদর্শনাবলী কি তাদেরকে এ মর্মে নিশ্চিন্ততা দান করে যে, তাদের শক্তি চিরস্থায়ী, তাদের আয়েশ-আরাম কোনোদিন নিশেষিত হবে না এবং তাদেরকে পাকড়াও করার কেউ নেই?[৪৬০]

○

যতদিন উপায় উপকরণ অনুকূল থাকে ততদিন মানুষ আল্লাহকে ভুলে পার্থিব জীবন নিয়ে অহংকারে মত্ত হয়ে থাকে। আর উপায় উপকরণ প্রতিকূল হয়ে গেলে এবং এ সাথে যেসব সহায়ের ভিত্তিতে সে পৃথিবীতে বেঁচেছিল সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেলে তারপর কট্টর মুশরিক ও নাস্তিকের মনেও এ সাক্ষ্য ধ্বনিত হতে থাকে যে, কার্যকারণের এ সমগ্র জগতের ওপর কোনো আল্লাহর কর্তৃত্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তিনি একক আল্লাহ এবং তিনি শক্তিশালী ও বিজয়ী।[৪৬১]

○

(১৩০) আল হাফিয়্যু ঃ اَلْحَفِيُّ

অর্থ ঃ অত্যন্ত দয়ার্দ্র, স্নেহশীল।

ব্যাখ্যা ঃ সূরা মারয়ামে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ج سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّىْ ط اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ـ مريم : ٤٧

'ইবরাহীম বললো, আপনাকে সালাম! আমি আমার রবের কাছে আপনাকে মাফ করে দেবার জন্য দোয়া করবো। আমার রব আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৪৭

(১৩১)

আল কাবিলু : اَلْقَابِلُ ، কাবিলুত তাওবি : قَابِلُ التَّوْبِ

অর্থ : কবুলকারী, তাওবা কবুলকারী।

ব্যাখ্যা : সূরা আল মু'মিনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ط - المؤمن : ٣

"গোনাহ মাফকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং অত্যন্ত দয়ালু।"–সূরা আল মু'মিন : ৩

এটা তাঁর আশা ও উৎসাহ দানকারী গুণ। এ গুণটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা এখনো পর্যন্ত বিদ্রোহ করে চলেছে তারা যেন নিরাশ না হয় বরং একথা ভেবে নিজেদের আচরণ পুনর্বিবেচনা করে যে, এখনো যদি তারা এ আচরণ থেকে বিরত হয় তাহলে আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। এখানে একথা বুঝে নিতে হবে যে, গোনাহ মাফ করা আর তাওবা কবুল করা একই বিষয়ের দুটি শিরোনাম মোটেই নয়। অনেক সময় তাওবা ছাড়াই আল্লাহ তাআলা গোনাহ মাফ করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি ভুল-ত্রুটিও করে আবার নেকীর কাজও করে এবং তার নেকীর কাজ গোনাহ মাফ হওয়ার কারণ হয়ে যায়, চাই ঐসব ভুল-ত্রুটির জন্য তার তাওবা করার ও ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগ হোক বা না হোক। এমনকি সে যদি তা ভুলে গিয়ে থাকে তাও। অনুরূপভাবে পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তির ওপর যত দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি এবং নানা রকম দুশ্চিন্তা ও মর্মপীড়াদায়ক বিপদাপদই আসে তা সবই তার গোনাহ ও ভুল-ত্রুটির কাফ্ফারা হয়ে যায়। এ কারণে গোনাহ মাফ করার কথা তাওবা কবুল করার কথা থেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাওবা ছাড়াই গোনাহ মাফ লাভের এ সুযোগ কেবল ঈমানদারদের জন্যই রয়েছে। আর ঈমানদারদের মধ্যেও কেবল তারাই এ সুযোগ লাভ করবে যারা বিদ্রোহ করার মানসিকতা থেকে মুক্ত এবং যাদের দ্বারা মানবিক দুর্বলতার কারণে গোনাহর কাজ সংঘটিত হয়েছে, অহংকার ও বার বার গোনাহ করার কারণে নয়।[৪৬২]

সমাপ্ত

টীকা

১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল হাশর, টীকা ৪৬
২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আল আ'লা, টীকা ১
৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৯ম খণ্ড, সূরা আন নূর, টীকা ৬২
৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা ইখলাস, টীকা ২
৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ২
৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ১৬২
৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ১৬৩
৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আলে ইমরান, টীকা ১৪
৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ৮
১০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আর রাহমান, টীকা ২৮
১১. কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা ঃ পৃষ্ঠা ১১-১২
১২. কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা ঃ পৃষ্ঠা ২০-২১
১৩. কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা ঃ পৃষ্ঠা ২৮-৩১
১৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ২৭৮
১৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল হাশর, টীকা ৩৩
১৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত তাগাবুন, টীকা ২৮
১৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আস্ সাফফাত, টীকা ৪
১৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা বনী ইসরাঈল ঃ টীকা ৪৭
১৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা বনী ইসরাঈল ঃ টীকা ৪৮
২০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল ফাতিহা ঃ টীকা ৪
২১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল হাশর, টীকা ৩৫
২২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা হূদ, টীকা ১০১
২৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আশ শুআরা, টীকা ১৩৭
২৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আল ফুরকান, টীকা ১৩
২৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আশ শুআরা, টীকা ৬
২৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আস সাবা, টীকা ৪
২৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ শূরা, টীকা ৫
২৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা হা-মীম আস সাজদা, টীকা ১
২৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আর রাহমান, টীকা ১
৩০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আর রাহমান, টীকা ২
৩১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৮শ খণ্ড, সূরা আল মুদ্দাস্সির, টীকা ৪৩
৩২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড, সূরা আল আনআম, টীকা ১০১

৩৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড সূরা আর রূম, টীকা ৩৩
৩৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল হাশর, টীকা ৩৬
৩৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ১০৯
৩৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আল ফুরকান, টীকা ৩৯
৩৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত তাগাবুন, টীকা ২
৩৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আয্ যুমার, টীকা ১৬
৩৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ শূরা, টীকা ৭৬
৪০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ শূরা, টীকা ৭৭
৪১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আয্ যুখরুফ, টীকা ৬৬
৪২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ২৮
৪৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত তাগাবুন, টীকা ২
৪৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল হাশর, টীকা ৩৭
৪৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল জুমআ, টীকা ১
৪৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল হাশর, টীকা ৩৮
৪৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল হাশর, টীকা ৩৯
৪৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল হাশর, টীকা ৪০
৪৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আন নিসা, টীকা ১৬৯
৫০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা মারয়াম, টীকা ৪৯
৫১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল হাশর, টীকা ৪১
৫২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আস সাজদা, টীকা ১১
৫৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল ফাতির, টীকা ৫
৫৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আল হাদীদ, টীকা ২
৫৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আল মু'মিন, টীকা ১
৫৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা লুকমান, টীকা ১১
৫৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা শূরা, টীকা ৩৬
৫৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আশ শু'আরা, টীকা ৬
৫৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা ফাতির, টীকা ৩৮
৬০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আস সোয়াদ, টীকা ৫৮
৬১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আল হাদীদ, টীকা ২
৬২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল হাশর, টীকা ৪২
৬৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল হাশর, টীকা ৪৩
৬৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল হাশর, টীকা ৪৫
৬৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা লুকমান, টীকা ৪৯
৬৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা ত্বা-হা, টীকা ২৩

৬৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আল ফুরকান, টীকা ৮
৬৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা মু'মিন, টীকা ৯১
৬৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আর রূম, টীকা ৩২
৭০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আর রূম, টীকা ৩১
৭১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত তাগাবুন, টীকা ৭
৭২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আর রাহমান, টীকা ২
৭৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা হা-মীম আস্ সাজদা, টীকা ১৫
৭৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আর রূম, টীকা ৩৫
৭৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড সূরা আন নাহ্‌ল, টীকা ১৫
৭৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আশ শু'আরা, টীকা ৫৭
৭৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আল হিজর, টীকা ৪৮
৭৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল ফাতির, টীকা ৪৮
৭৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আর রূম, টীকা ২৮
৮০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আর রূম, টীকা ২৭
৮১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল হাশর, টীকা ৪৫
৮২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল হাশর, টীকা ৪৫
৮৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আয্ যুমার, টীকা ১১
৮৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা ত্বাহা, টীকা ৬০
৮৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আন নাজম, টীকা ৩৩
৮৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আন্ নাজম, টীকা ৩২
৮৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আল মু'মিন, টীকা ১
৮৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা আর রা'আদ, টীকা ৩০
৮৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আয্ যুমার, টীকা ৯
৯০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা সোয়াদ, টীকা ৫৮
৯১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আল মু'মিন, টীকা ২৭
৯২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড, সূরা আল আনআম, টীকা ৪১
৯৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আস সোয়াদ, টীকা ৩৬
৯৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আস সোয়াদ, টীকা ৪০
৯৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আস সোয়াদ, টীকা ৪৭
৯৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল জুম'আ, টীকা ২১
৯৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আস সাবা, টীকা ৬০
৯৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আল আনকাবূত, টীকা ৯৯
৯৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আল মু'মিন, টীকা ৯১
১০০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৫শ খণ্ড, সূরা আয্ যারিয়াত, টীকা ৫৪

১০১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আস সাবা, টীকা ৪৫
১০২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আস সাবা, টীকা ৪৯
১০৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আদ দুখান, টীকা ৫
১০৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৫শ খণ্ড, সূরা আল হুজুরাত, টীকা ২৯
১০৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খণ্ড, সূরা আল আনফাল, টাকা ৩৫
১০৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড সূরা আত তাওবা, টীকা ১০০
১০৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আল হিজর্, টীকা ১৬
১০৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ১০৩
১০৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৯ম খণ্ড, সূরা আন্ নূর, টীকা ১৯
১১০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল আহযাব, টীকা ২
১১১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত তাগাবুন, টীকা ৯
১১২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা লুকমান, টীকা ৬৩
১১৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আল মু'মিন, টীকা ১
১১৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা হা-মীম আস সাজদা, টীকা ৪১
১১৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৫শ খণ্ড, সূরা আল হুজুরাত, টীকা ২
১১৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আল হাদীদ, টীকা ৫
১১৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত তাগাবুন, টীকা ২৬
১১৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আল হাদীদ, টীকা ৬
১১৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত তাহরীম, টীকা ৫
১২০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৮শ খণ্ড, সূরা আল মুলক, টীকা ২০
১২১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ২৮২
১২২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৮শ খণ্ড, সূরা জিন, টীকা ২৬
১২৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল হাশর, টীকা, ৩৪
১২৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আন্ নামল, টীকা ৮৩
১২৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আন্ নামল, টীকা ৮৩
১২৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আস সাজদা, টীকা ১০
১২৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৮শ খণ্ড, সূরা আল মুল্ক, টীকা ১৮
১২৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা লুকমান, টীকা ৬৩
১২৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আয্ যুমার, টীকা ৭৬
১৩০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আল ফুরকান, টীকা ৫৯
১৩১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আস সাবা, টীকা ৫৯
১৩২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ৩০
১৩৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল ফাতির, টীকা ২১
১৩৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আল মুজাদালা, টীকা ১৮

১৩৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা ইউসুফ, টীকা ৬০
১৩৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা আর রা'আদ, টীকা ২
১৩৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আয্ যুখরুফ, টীকা ৩১
১৩৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূর আন নিসা, টীকা ১৯৫
১৩৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, আলাম নাশরাহ, টীকা ৩
১৪০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আন নিসা, টীকা ১৬৯
১৪১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা মুনাফিকুন, টীকা ১৬
১৪২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল ফাতির, টীকা ২০
১৪৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ৩৪
১৪৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ৩৪
১৪৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা হূদ, টীকা ১০৫
১৪৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আল আনকাবূত, টীকা ৭
১৪৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা লুকমান, টীকা ৪৯
১৪৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আদ দুখান, টীকা ৫
১৪৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল আম্বিয়া, টীকা ৬
১৫০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৯ম খণ্ড, সূরা আন্ নূর, টীকা ১৯
১৫১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আল মু'মিন, টীকা ৩৩
১৫২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আশ শু'আরা, টীকা ১৩৯
১৫৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা হা-মীম আস্ সাজদা, টীকা ৪১
১৫৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা লুকমান, টীকা ৪৯
১৫৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আল ফুরকান, টীকা ৩২
১৫৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৮শ খণ্ড, সূরা আল মুল্ক, টীকা ৩০
১৫৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত তাগাবুন, টীকা ৬
১৫৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আলে ইমরান, টীকা ১২
১৫৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল ফাতির, টীকা ৫৪
১৬০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আল মু'মিন, টীকা ৩৩
১৬১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড, সূরা আল আনআম, টীকা ৮১
১৬২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা হূদ, টীকা ৪৮
১৬৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আন্ নাহ্ল, টীকা ৮৮
১৬৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আর রাহমান, টীকা ৭
১৬৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আর রাহমান, টীকা ৮
১৬৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ৩৪
১৬৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ১১১
১৬৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল আহযাব, টীকা ৫১

১৬৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ১১১
১৭০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আস্ সাবা, টীকা ৩
১৭১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আন নিসা, টীকা ১৬৩
১৭২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৮শ খণ্ড সূরা আল মুলক, টীকা ২১
১৭৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল ফাতির, টীকা ৫৪
১৭৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৫শ খণ্ড, সূরা আল হুজুরাত, টীকা ২
১৭৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, আল হাদীদ, টীকা ১৫
১৭৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আল মুজাদালা, টীকা ১০
১৭৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা মুনাফিকুন, টীকা ১৮
১৭৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড, সূরা আত তাওবা, টীকা ১১৩
১৭৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ১০৩
১৮০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল ফাতির, টীকা ৫২
১৮১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ৫০
১৮২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ১০৫
১৮৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ শূরা, টীকা ৫
১৮৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খণ্ড, সূরা আল আ'রাফ, টীকা ১৫০
১৮৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ শূরা, টীকা ২
১৮৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৮শ খণ্ড, সূরা আল মুল্ক, টীকা ৫
১৮৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আল কাহ্ফ, টীকা ৫৫
১৮৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আন্ নামল, টীকা ১৫
১৮৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল ফাতির, টীকা ৫২
১৯০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ৪২
১৯১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আন্ নিসা, টীকা ১৭৫
১৯২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আন্ নিসা, টীকা ১৭৬
১৯৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ শূরা, টীকা ৪২
১৯৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা লুকমান, টীকা ৫৪
১৯৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ শূরা, টীকা ২
১৯৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ শূরা, টীকা ৮২
১৯৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আল আ'লা ভূমিকা
১৯৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আন্ নাযি'আত, টীকা ১১
১৯৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮শ খণ্ড, সূরা ত্বাহা, টীকা ২১
২০০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আস সাবা, টীকা ৪১
২০১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ শূরা, টীকা ৭
২০২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৮শ খণ্ড, সূরা আল মুল্ক, টীকা ২৬

২০৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৫শ খণ্ড, সূরা আল কাফ, টীকা ৪১
২০৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আত তারিক, টীকা ১-২
২০৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আল হিজ্‌র, টীকা ৬
২০৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা হা-মীম আস্ সাজদা, টীকা ১২
২০৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল আহ্‌যাব, টীকা ৭৬
২০৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ৩৩৫
২০৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আল ইনশিকাক, টীকা ৬
২১০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আল ইনফিতার, টীকা ৪
২১১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আল ইনফিতার, টীকা ৫
২১২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আল হাদীদ, টীকা ১৬
২১৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আল আলাক, টীকা ৫
২১৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আর রাহ্‌মান, টীকা ২৫
২১৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৫শ খণ্ড, সূরা আল কাফ, টীকা ২১
২১৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ১৮৮
২১৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা হূদ, টীকা ৬৯
২১৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আলে ইমরান, টীকা ৬২
২১৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ১১৬
২২০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আন নামল, টীকা ৭
২২১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা লুকমান, টীকা ১১
২২২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল ফাতির, টীকা ৫
২২৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ শূরা, টীকা ১
২২৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ শূরা, টীকা ৮২
২২৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আল জাসিয়া, টীকা ১
২২৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল জুমুআ, টীকা ১
২২৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৫শ খণ্ড, সূরা আল ফাতহ্, টীকা ৮
২২৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আল হাদীদ, টীকা ২
২২৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল জুমুআ, টীকা ৬
২৩০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত তাহরীম, টীকা ৫
২৩১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ৯
২৩২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আন নামল, টীকা ৭৩
২৩৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আল হিজর, টীকা ১৩
২৩৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আল হিজর, টীকা ১৪
২৩৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা আর রাআদ, টীকা ৮
২৩৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা আর রাআদ, টীকা ৯

২৩৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আন নামল, টীকা ৭৪
২৩৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০শ খণ্ড, সূরা আন নামল, টীকা ৭৮
২৩৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা আর রা'আদ, টীকা ১১
২৪০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা হূদ, টীকা ১০১
২৪১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আল বুরূজ, টীকা ৭
২৪২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ২৩০
২৪৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল জুমুআ, টীকা ৩
২৪৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা ইবরাহীম, টীকা ১৮
২৪৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আন নাহ্ল, টীকা ৮০
২৪৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ১৭
২৪৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আন নাহ্ল, টীকা ৩৫
২৪৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আন নাহ্ল, টীকা ৩৬
২৪৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ৯
২৫০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আল কাসাস, টীকা ৮৩
২৫১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আন নিসা, টীকা ৯৯
২৫২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা হা-মীম আস্ সাজদা, টীকা ৭১
২৫৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড, সূরা ইউনুস, টীকা ৩৭
২৫৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল আহ্যাব, টীকা ১০৫
২৫৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আল আহকাফ, টীকা ১০
২৫৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৫শ খণ্ড, সূরা আল ফাত্হ, টীকা ৫১
২৫৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আলে ইমরান, টীকা ১৪
২৫৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড, সূরা ইউনুস, টীকা ৩৮
২৫৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ৮
২৬০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ৯
২৬১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ১০৯
২৬২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড, সূরা আল আনআম, টীকা ১০
২৬৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা লুকমান, টীকা ৫২-৫৩
২৬৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল আহ্যাব, টীকা ৪
২৬৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আয্ যুমার, টীকা ৭৩
২৬৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ৮১
২৬৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৮শ খণ্ড, সূরা আল মুয্যাম্মিল, টীকা ১০
২৬৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ৭৩
২৬৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আল হাদীদ, টীকা ৪৭
২৭০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ৪৯

২৭১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ১২
২৭২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আল আনকাবূত, টীকা ৩৫
২৭৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ১১
২৭৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ১৪
২৭৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ৬৯
২৭৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ৬
২৭৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ৬
২৭৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, ভূমিকা
২৭৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আদ্ দুখান, টীকা ৩৬
২৮০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত্ তাহরীম, টীকা ৫
২৮১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ১৩৪
২৮২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড, সূরা আল আনআম, টীকা ৪১
২৮৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল ফাতির, টীকা ৩৭
২৮৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা লুকমান, টীকা ১৯
২৮৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আল মুজাদালা, টীকা ১৭
২৮৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৮শ খণ্ড, সূরা জিন, টীকা ৩০
২৮৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা ইয়াসীন, টীকা ৯
২৮৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আন নাবা, টীকা ১৮
২৮৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খণ্ড, সূরা আল আ'রাফ, টীকা ১৪৬
২৯০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড, সূরা ইউনুস, টীকা ৪২
২৯১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আন নামল, টীকা ৮০
২৯২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড, সূরা ইউনুস, টীকা ১০
২৯৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড, সূরা ইউনুস, টীকা ১১
২৯৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড, সূরা ইউনুস, টীকা ৪১
২৯৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আন নাম্ল, টীকা ৮০
২৯৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আল আনকাবুত, টীকা ৩২ - ৩৩
২৯৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আর রুম, টীকা ১৩
২৯৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আর রূম, টীকা ৩৮
২৯৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ৯
৩০০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আন্ নাহ্ল, টীকা ৫৩- ক
৩০১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল ফাতির, টীকা ১৯
৩০২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আর রূম, টীকা ২৫
৩০৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আর রূম, টীকা ৬৩
৩০৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আলে ইমরান, টীকা ১০৪

৩০৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আবাসা, টীকা ১৪
৩০৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আল জাসিয়া, টীকা ৩৪, ৩৭
৩০৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আস্ সাজদাহ, টীকা ২১
৩০৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আল মু'মিন, টীকা ৯২
৩০৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ২৭৮
৩১০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল ফাতির, টীকা ৬৯
৩১১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আল বুরূজ, টীকা ৭
৩১২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আয্ যুমার, টীকা ৯
৩১৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আস্ সোয়াদ, টীকা ৫৮
৩১৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আল মু'মিন, টীকা ২৭
৩১৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা হা-মীম আস্ সাজদা, টীকা ৭
৩১৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আল ইখলাস, টীকা ৩
৩১৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আল ইখলাস, টীকা ৪
৩১৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড, সূরা আল আনআম, টীকা ২৬
৩১৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড, সূরা আল আনআম, টীকা ৪২
৩২০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৮শ খণ্ড, সূরা আল কিয়ামাহ, টীকা ২৫
৩২১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আত্ তারিক, টীকা ৪
৩২২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ১০৭
৩২৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আর রূম, টীকা ৭৯
৩২৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ৮৬
৩২৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ৭৭
৩২৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ৯
৩২৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ৩৩৬
৩২৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত তাগাবুন, টীকা ৪
৩২৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড, সূরা আল মায়েদা, টীকা ৪০
৩৩০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আল কাহ্ফ, টীকা ৪১
৩৩১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ১০৭
৩৩২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৮শ খণ্ড, সূরা আন্ নুহ, টীকা ১৪
৩৩৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৫শ খণ্ড, সূরা আল কাফ, টীকা ৩৪
৩৩৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৫শ খণ্ড, সূরা আল কাফ, টীকা ৩৫
৩৩৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আল হিজ্‌র, টীকা ২
৩৩৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড, সূরা ইউনুস, টীকা ৫৮
৩৩৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আল হাদীদ, টীকা ৩
৩৩৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আল হাদীদ, টীকা ৩

৩৩৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড সূরা আল হাদীদ, টীকা ৩
৩৪০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা ইবরাহীম, টীকা ৪৫
৩৪১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আর রাহমান, টীকা ৩৭
৩৪২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত্ তাগাবুন, টীকা ৩
৩৪৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ৫১
৩৪৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আন নিসা, টীকা ২৭
৩৪৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ৫২
৩৪৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ শূরা, টীকা ৪৭
৩৪৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড, সূরা আত্ তাওবা, টীকা ১১৯
৩৪৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড, সূরা আত্ তাওবা, টীকা ৯৯
৩৪৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আন্ নাম্ল, টীকা ১৫
৩৫০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত্ তাহ্রীম, টীকা ২০
৩৫১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত্ তাহ্রীম, টীকা ১৯
৩৫২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আস্ সাজদা, টীকা ৩৪
৩৫৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আয্ যুখরুফ, টীকা ৩৭
৩৫৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আদ্ দুখান, টীকা ১৩
৩৫৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা ইবরাহীম, টীকা ৫৬
৩৫৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আলে ইমরান, টীকা ১০
৩৫৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আন নিসা টীকা ১৭৭
৩৫৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ১০৫
৩৫৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আল মুজাদালা, টীকা ৬
৩৬০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আলে ইমরান, টীকা ২৭
৩৬১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল আম্বিয়া, টীকা ১৮
৩৬২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল আম্বিয়া, টীকা ২২
৩৬৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ৪৭
৩৬৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ১২৫
৩৬৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আর রাহমান, টীকা ২৫
৩৬৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আল কাহ্ফ, টীকা ৪৪
৩৬৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ৫১
৩৬৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ১০
৩৬৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আন নিসা, টীকা ১১৫
৩৭০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা জাসিয়া, টীকা ৩৬
৩৭১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৫শ খণ্ড, সূরা আল কাফ, টীকা ৪
৩৭২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা হা-মীম আস্ সাজদা, টীকা ২৫

৩৭৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা ফাতির, টীকা ৩৭
৩৭৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড, সূরা ইউনুস, টীকা ৬৮
৩৭৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আন্ নামল, টীকা ৪৯
৩৭৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৫শ খণ্ড, সূরা মুহাম্মাদ, টীকা ৪৩
৩৭৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আল মুমতাহিনা, টীকা ১০
৩৭৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত্ তাগাবুন, টীকা ১৩
৩৭৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আল ফাতির, টীকা ৩৬
৩৮০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড, সূরা আল আনআম, টীকা ১০১
৩৮১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আদ দুহা, টীকা ৮
৩৮২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা মুজাদালা, টীকা ২৫
৩৮৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ১৮
৩৮৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৮শ খণ্ড, সূরা জিন, টীকা ২২
৩৮৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ৭
৩৮৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আয্ যুমার, টীকা ৫৫-৫৬
৩৮৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আন্ নাজম, টীকা ৪০
৩৮৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ১৮
৩৮৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আল ইনফিতার, টীকা ৮
৩৯০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ২৮১
৩৯১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৭শ খণ্ড, সূরা আত্ তাগাবুন, টীকা ২৮
৩৯২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৯ম খণ্ড, সূরা আন্ নুর, টীকা ৬২
৩৯৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৯ম খণ্ড, সূরা আন্ নূর, টীকা ৬৫
৩৯৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৯ খণ্ড, সূরা আন্ নূর, টীকা ৬৬
৩৯৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৯ম খণ্ড, সূরা আন্ নূর, টীকা ৬৫
৩৯৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আল ফুরকান, টীকা ৪৩
৩৯৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আল ফুরকান, টীকা ৪৫
৩৯৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড, সূরা আল আনআম, টীকা ২৮
৩৯৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আন নিসা, টীকা ১৭৩
৪০০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আল শামস, ভূমিকা
৪০১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আশ্ শাম্স, টীকা ৫
৪০২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৯শ খণ্ড, সূরা আশ্ শামস, ভূমিকা
৪০৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আন্ নাহ্ল, টীকা ৫৬
৪০৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড, সূরা ইউনুস, টীকা ৪৩
৪০৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা ত্বাহা, টীকা ২৩
৪০৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা ত্বাহা, টীকা ২৩
৪০৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আশ শুআরা, টীকা ৫৮

৪০৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা লুকমান, টীকা ৩৬
৪০৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৮শ খণ্ড, সূরা আদ দাহর, টীকা ৫
৪১০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা আর রাআদ, টীকা ২
৪১১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আর রূম, টীকা ৩৬
৪১২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা লুকমান, টীকা ৪৬
৪১৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আস সাজদা, টীকা ৮
৪১৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা ইয়াসীন, টীকা ৩৭
৪১৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা হা-মীম আস্ সাজদা, টীকা ১৪
৪১৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আর রাহমান, টীকা ২৫
৪১৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৬শ খণ্ড, সূরা আর রাহমান, বিষয়বস্তু
৪১৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আল হিজ্‌র, টীকা ১৫
৪১৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল আম্বিয়া, টীকা ৮৬
৪২০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আলে ইমরান, টীকা ১২৭
৪২১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৪শ খণ্ড, সূরা আশ্ শূরা, টীকা ৫৫
৪২২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড, সূরা ইউনুস, টীকা ৪৩
৪২৩. কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা ঃ পৃ. ৩৩-৩৯, ৭৫-৭৬ ৮১-৮২
৪২৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আশ শুআরা, টীকা ৫৮
৪২৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আন নিসা, টীকা ২১৮
৪২৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড, সূরা আল আনআম, টীকা ১০
৪২৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা ইবরাহীম, টীকা ১৭
৪২৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আল মু'মিন, টীকা ১
৪২৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৫শ খণ্ড, সূরা আল কাফ, টীকা ২০
৪৩০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১২শ খণ্ড, সূরা আস সাবা, টীকা ৭১
৪৩১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড, সূরা আল আনআম, টীকা ২৯
৪৩২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আন নামল, টীকা ৭৬
৪৩৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড, সূরা আল আনআম, টীকা ২৯
৪৩৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খণ্ড, সূরা আল আনআম, টীকা ৪১
৪৩৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড, সূরা ইউনুস, টীকা ৩৭
৪৩৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আস্ সাদ, টীকা ৪৭
৪৩৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা ইবরাহীম, টীকা ২১
৪৩৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আন নিসা, টীকা ১২৭
৪৩৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, সূরা ইউসুফ, টীকা ৭১
৪৪০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৫শ খণ্ড, আল হুজুরাত, ভূমিকা
৪৪১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আন নাহল, টীকা ১৭
৪৪২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা আন নাহল, টীকা ৯০-৯১
৪৪৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৫শ খণ্ড, সূরা আল কাফ, টীকা ২০

৪৪৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৮শ খণ্ড, সূরা জিন, টীকা ৩০
৪৪৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল বাকারা, টীকা ২৮২
৪৪৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খণ্ড, সূরা আন নিসা, টীকা ১৫১
৪৪৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ৭০
৪৪৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আল মু'মিন, টীকা ২৩
৪৪৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল হাজ্জ, টীকা ১২১
৪৫০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আল আনকাবুত, টীকা ৩৫
৪৫১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৭ম খণ্ড, সূরা বনী ইসরাঈল, টীকা ৮৮
৪৫২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আল ফুরকান, টীকা ৪৩
৪৫৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আল মু'মিন, টীকা ১
৪৫৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১০ম খণ্ড, সূরা আন্ নামল, টীকা ১
৪৫৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৯ম খণ্ড, সূরা আন্ নূর, টীকা ৭১
৪৫৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আল মু'মিন, টীকা ২৯
৪৫৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খণ্ড, সূরা আল ফাতিহা, টীকা ৭
৪৫৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল আম্বিয়া, টীকা ৪৫
৪৫৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১১শ খণ্ড, সূরা আস্ সাজদা, টীকা ৩৩
৪৬০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৮ম খণ্ড, সূরা আল আম্বিয়া, টীকা ৪৬
৪৬১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খণ্ড, সূরা ইউনুস, টীকা ৩১
৪৬২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১৩শ খণ্ড, সূরা আল মু'মিন, টীকা ১